কথা ভারতী

মলয়ালম গল্পগুচ্ছ

সম্পাদক
ওমচেরী এন. এন. পিল্লে
অনুবাদ
দিব্যেন্দু পালিত



ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়া দিল্লী

Bengali title : KATHA BHARATI : MALAYALAM GALPAGUCHCHHA

পরিবেষক
সায়েন্টিফিক বুক এজেন্সি
22, রাজা উডমান্ট স্ট্রিট
কলিকাতা-700001

ডাইরেক্টর, ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5 গ্রীন পার্ক, নয়া দিল্লী-110016
কর্তৃক প্রকাশিত এবং নবজীবন প্রেস, কলিকাতা-700006 দ্বারা মুদ্রিত

ভূমিকা

আনুমানিক গত তিন দশকের মলয়ালম গল্প-সাহিত্য প্রভাব বিস্তারে ও বিকাশের চেতনায় বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। অনুসন্ধিৎসু সমালোচকদের মতে তা ইতিমধ্যে এতই সমৃদ্ধ ও বিকশিত যে বিশ্বের যে-কোন ভাষার গল্পের সঙ্গেই এর তুলনা করা চলে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আসরে মলয়ালম কাহিনীর অনন্যতা স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্রতিযোগিতার বাইরেও এমন অনেক কাহিনী রচিত হয়েছে যেগুলি সহজেই দেশ-কালের সীমানা অতিক্রমণে সক্ষম।

মলয়ালম কাহিনীর ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতি দীর্ঘকালীন চর্চার ফল। বর্তমান শতাব্দীর পূর্বেই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত সাহিত্যিকদের হাতে সূচিত হয়েছিল এর বিকাশপর্ব। পাঠকদের মনোরঞ্জনের প্রতি দৃষ্টি রেখেও ওয়াশিংটন আর্ভিং, ন্যাথনেল হথর্ন এবং এডগার অ্যালান পো'র দ্বারা অনুপ্রাণিত এই-সব লেখক 'ঐতিহাসিক' ও 'সামাজিক' উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ইত্যাকার রচনার কাল-চেতনা ত্বরান্বিত করেছিল এঁদের প্রতিষ্ঠা। লেখকের বা পাঠকের চিন্তার চেয়ে বেশী এঁদের রচনায় প্রতিফলিত হয়েছিল সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা। আজকের মানুষের সামাজিক প্রতিবেশ পাঠকের ভালো বা মন্দ যেমনই মনে হোক, মলয়ালম ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার গল্প-সাহিত্যের পূর্বাবস্থার দিকে তাকিয়ে এ-কথা অবশ্যই বলা যায় যে প্রাগুক্ত লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও

আদর্শের অবদান নিঃসন্দেহে উল্লেখনীয়। মুর্কোথ কুমারণ, বেঙ্গাইল কুঞ্জিরামণ নায়ার, অড়ুবিল কুঞ্জিকৃষ্ণ মেনন, এম. আর. কে. সি., অম্বাডী নারায়নণ পোতুবাল, কে. সুকুমারণ, সি. এস. গোপাল পাণিক্কর, এস. রামবারিয়ার এবং ই. বি. কৃষ্ণপিল্‌লে সেই ধরনেরই নমস্য লেখক, যাঁরা উত্তরসূরীদের জন্য ভূমি প্রস্তুত ক'রে গিয়েছেন।

1930-এ শুরু হ'ল মলয়ালম গল্প-সাহিত্যের আধুনিক কাল, যখন এই সময়ের তরুণ লেখকগণ কার্ল মার্ক্‌স, সিগমুণ্ড ফ্রয়েড ও ফরাসী প্রকৃতিবাদীদের চিন্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেন। বিশ্ব-সাহিত্যের নবীন ধারার সঙ্গে পরিচয় লাভ এবং গভীর অধ্যয়ন তাঁদের সামাজিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণের প্রেরণা এবং সাহিত্যকে মানবাত্মার মুক্তির প্রতিবন্ধকগুলির বিরোধিতা ব্যাপারে অনুপ্রেরণা দিল। নিছক সৃজনধর্মিতায় আবদ্ধ না থেকে তিক্ত সামাজিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে লাগলেন এই-সব লেখক। রচনাধারার এই পরিবর্তন সাহিত্যকে এনে দিল জীবনের অনেক কাছাকাছি। জীবনের স্বরূপ অবলোকন ও সাহিত্যে তার প্রতিফলনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এলো যুগান্তকারী বিবর্তন। পরিবেশের বিরুদ্ধে রচিত এতদিনকার সাহিত্য-ধারণা ভাষা ও শিল্প-সৌকর্যও ক্ষুণ্ণ করত— বিবর্তনের ফলে পুরাতন সব-কিছুই হয়ে গেল ছিন্নভিন্ন। নতুন লেখকগণ কলম ধরলেন আর্থিক বৈষম্য, জমিদারি প্রথা, ধর্মভয় এবং রাজনৈতিক উৎপীড়নের বিরুদ্ধে।

এই বিরোধী প্রতিক্রিয়ার পরিণামস্বরূপ মলয়ালম সাহিত্যে শুধু নতুন যুগই সৃষ্টি হ'ল না; সৃষ্টি হ'ল এক শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠী— যাঁরা আপন-আপন অনুভূতি সংযমী ও শিল্পসুষমাময় ভাষায় সহজেই ব্যক্ত করতে পারেন। তকশী শিবশঙ্কর পিল্‌লে,

পি. কেশবদেব, পোঙ্কুন্নম বর্কী তথা বৈক্কম মুহম্মদ বশীর এই নবোদ্ভূত বিদ্রোহী লেখককুলের পুরোধ'-পুরুষ।

পরিস্থিতির পর্যালোচনায় বোঝা যায় তৎকালীন সামাজিক অবস্থায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শের অধিকারী লেখকদের আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল। জাতি ও জমিদারি-প্রথায় অবরুদ্ধ অন্ধবিশ্বাসের পরম্পরা উচ্চশ্রেণীর মানুষদেরই সহায়ক ছিল; শোষণের শিকার দরিদ্রদের মুক্তির জন্যে প্রয়োজন ছিল জনচেতনার মূলে আঘাত হানার মতো একটা আলোড়ন।

তখনো পর্যন্ত সাধারণ মানুষের আর্থিক ও সামাজিক দুর্দশা মোচনের জন্য কোন রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয় নি। সমাজ-সংস্কারকরা আদর্শের মোহেই বিভোর হয়েছিলেন এবং বিভিন্ন ভুল-ভ্রান্তি অনুসন্ধানে ব্যাপৃত না হয়ে তাঁরা সমাজের সর্বস্তরেই সৃষ্টি করেছিলেন হতাশা। এরকম পরিস্থিতিতে লেখকদের উপরেই পড়েছিল সমাজ সংস্কারের গুরু দায়িত্ব।

কেরলের সাহিত্যিক পটভূমি অবশ্য লেখকদের যে-কোন ভূমিকায় সুযোগ-দানের জন্যেই প্রস্তুত ছিল। সাহিত্য ও ভাষা বিষয়ে জনগণের রুচি ছিল প্রবল, যদিও তা কলাকৈবল্যের ধারণাতেই ছিল সীমাবদ্ধ। সাহিত্য-পত্রিকার সংখ্যাও ছিল অনেক।

দরিদ্রজনের ভাবনা ও প্রচলিত ব্যবস্থার তীক্ষ্ণ সমালোচনা স্থান পেয়েছিল তকৃশীর রচনায়। কেশবদেব তাঁর শ্রমিক সংগঠনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সাধারণ মানুষের শোষণ ও দমনের বিরুদ্ধে লেখনী ধরেছিলেন— তীক্ষ্ণ শব্দ ব্যবহারের কৌশলে তাঁর শৈলীও ধারালো। সেই ক্যাথলিক সমাজের বিভিন্ন দুর্নীতির বিরোধিতা করলেন পোঙ্কুন্নম বর্কী, তিনি নিজেও যে-সমাজের সদস্য।

ললিতাম্বিকা অন্তর্জনমের জন্ম হয়েছিল নাম্বুদ্রী সম্প্রদায়ে, পরবর্তীকালে এই সম্প্রদায়ের দোষাবলীই নিরূপিত হ'ল তাঁর রচনায়। মুশলিম ভাইদের অজ্ঞানতা থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন বৈক্কম মুহম্মদ বশীর, তাঁর রচনাতেও ধরা পড়ল রাজনৈতিক দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। দীন মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠল কারুর নীলকণ্ঠ পিল্লের মমতাময় ভাষায়। সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই 'ধর্মযুদ্ধে' আরো অনেক লেখকই অংশ নিয়েছিলেন।

এই লেখকদের সৃজনশীল প্রতিভা শুধুমাত্র সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং জীবনের বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের রহস্য সন্ধানেও এঁদের লেখনী সচল ছিল। অন্তত, এ প্রসঙ্গে এস. কে. পোট্টেকাট ও পি. সি. কুট্টিকৃষ্ণণ-এর নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়।

বেট্টুর রামণ নায়ার, ই. এম. কোবুর, নাগবলী আর. এস. কুরূপ, সরস্বতী আম্মা, পুঞ্জিক্করা রাফী তথা অন্যান্য আরো অনেক লেখক নিজেদের মৌলিক চিন্তাধারার প্রয়োগে মলয়ালম কথা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ অভিব্যক্তির প্রকাশে এবং শৈলীর বিশিষ্টতায় কারুর চেয়ে কেউ কম ছিলেন না। জীবনের স্বরূপ ও যাথার্থ্য আবিষ্কারের প্রয়াস গল্প-সাহিত্যকে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী ক'রে তোলে।

কেরলের প্রগতিশীল লেখক আন্দোলনের মতোই গল্প-সাহিত্যেও অতঃপর উত্থান-পতনের পরিস্থিতি এলো। গোড়ার দিকে সামাজিক দায়িত্ব পালনে লেখকদের প্রচেষ্টা জনসমর্থন লাভ করলেও, পরবর্তীকালে এই প্রবণতাই ক্রমশ অনীহার সৃষ্টি করে। সামাজিক দায়িত্ব পালনের ভূমিকা এমনই এক অভ্যাসে পরিণত হয় যে

শিল্প-নৈপুণ্যের বিষয়টি অবহেলিত হতে থাকে। একই সময়ে বিশ্বসাহিত্যে আবির্ভূত হ'ল আধুনিকতার নতুন জোয়ার। সৃষ্টিশীল কাজে যে-কোন রকমের বিধিনিষেধ আরোপই অপাংক্তেয় গণ্য হ'ল। নতুন লেখকদের অনেকেই তখন মানব-জীবনের বাহ্যিক রূপের প্রতি আর অনুরক্ত নন, প্রাণের গভীরে ডুব দিয়ে নতুন রহস্য সন্ধানেই তাঁরা অধিকতর আগ্রহী হয়ে উঠলেন। মানব-প্রকৃতির অন্তর্জগতের যে-সব প্রতিক্রিয়া মানুষের প্রত্যক্ষ জীবনকে প্রভাবিত করে সেগুলির প্রতিই সৃষ্টি হ'ল তাঁদের আগ্রহ এবং ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করার চেয়ে পাঠকের কাছে আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতিক্রিয়াজাত অনুভূতির উন্মোচন করাই তাঁরা শ্রেয় বোধ করলেন। এই নতুন ভাবরূপের বিশ্লেষণে তাঁদের অনুসৃতব্য রূপ ও রীতির সাবেকী ধরন ও শৈলী অপর্যাপ্ত মনে হ'ল। নতুন গল্পকারদের আদর্শ আর সমারসেট মম্ বা স্টেইনবেক্ নন, এখন তাঁদের আদর্শ রূপে প্রতিভাত হলেন জেম্স্ জয়েস, কাফ্কা, কাম্যু প্রমুখ। এমন কি তাঁরা ভার্জিনিয়া উল্ফ্, মার্সাল প্রুস্ত প্রমুখকেও বরণ করলেন সোৎসাহে এবং অবচেতন মনের বিভিন্ন সংঘাত নিরূপণে চেতনা-প্রবাহ রীতির আশ্রয় নিলেন। কাহিনী আর তত্ত্ব-নির্ভর থাকল না, প্রচলিত ধারার অনুসারীও নয়। ফলে, নতুন রচনায় যে-সব চরিত্র দেখা গেল তারা সামাজিক ও পার্থিব অনুশাসনে বাঁধা নয়, তাঁদের সৃষ্টি পরিবেশের প্রতিক্রিয়ায়— যে-পরিবেশ তাদের বিচ্ছিন্নতা ভিন্ন আর কিছুই দিতে পারে না।

তথাপি, এ-সব রচনা যে একেবারেই গুরুত্বহীন তা বলা যাবে না। সমকালীন প্রতিবেশকে এঁরা চিত্রিত করেছেন নির্মম সূক্ষ্মতায়।

নবীন ধারার লেখকদের সম্পর্কে যে-অনুযোগ ও মন্তব্য প্রায়ই শোনা যায় তা হ'ল এঁদের রচনা অশ্লীল এবং অস্পষ্ট। এই সারির প্রতিভাবান লেখকদের মধ্যে আছেন— এম. টি. বাসুদেবন নায়ার, টি. পদ্মনাভ, কে. টি. মুহম্মদ, পারপ্পুরত্তু, নন্দনার, মাধবীকুট্টি, কোবিলন, এম. পি. নারায়ণ পিল্লে, কাক্কোনাটন, এম. মুকুন্দন, বি. কে. এন., ও. বি. বিজয়ন, এন. পি. মুহম্মদ, পুতুর উন্নিকৃষ্ণণ, মলয়াট্টুর রামকৃষ্ণণ এবং জি. বিবেকানন্দন।

বর্তমান সংকলনটি মলয়ালম কথা-সাহিত্যের সৃষ্টিশীলতার যে-পরিচয় বহন করছে, আর কোন সংকলনই তা দাবি করতে পারে না। নির্বাচক বা সংকলকের কাজ সবসময়েই কঠিন ও প্রায় ব্যক্তিগত হয়ে ওঠে। যে-কোন লেখকের অনেকানেক উৎকৃষ্ট রচনার মধ্যে থেকে বিশেষ একটি নির্বাচন ক'রে নেওয়া আরো কঠিন। এ-ক্ষেত্রে নির্বাচন সংকলকের ব্যক্তিগত রুচি ও চেতনা দ্বারাই সংঘটিত হয়। সংকলিত লেখকদের পূর্বসুরীদের রচনা এ-গ্রন্থে অপ্রাসঙ্গিক ভেবেই অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। আধুনিক কালের লেখক কিন্তু মননে তত আধুনিক নন এমন অনেক লেখকের রচনাও স্থানাভাবহেতু অন্তর্ভুক্ত করা যায় নি। আশা করি, বর্তমান সংকলনটি পাঠকদের আগ্রহ যথেষ্টভাবে পূরণ করবে। এবং এই সংকলন পাঠের অভিজ্ঞতা তাঁদের নতুনতর সংকলন সম্পর্কেও উৎসাহী ক'রে তুলবে এবং সেই-সব সংকলনে আরো অনেক প্রতিভাশালী লেখকের সঙ্গে তাঁদের পরিচয়ের সুযোগ ঘটবে।

— **ওমচেরী এন. এন. পিল্লে**

সূচীপত্র

ভাবী স্বামী

পি. কেশবদেব

স্বামী হবে সুন্দর, ধনী, বিদ্বান আর যশস্বী। সরোজিনীও এইরকম ভাবত। বাড়িতে তার বিয়ের কথাবার্তা শুরু হলে সর্বগুণসম্পন্ন স্বামীর এক সুন্দর মূর্তি সে মনে মনে রচনা ক'রে ফেলল।

স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনার বিষয়ও ছিল এই— স্বামী কীরকম হওয়া উচিত। পদ্মাক্ষীর পছন্দ উকিল, নলিনীর পছন্দ পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর। নিজের কথাটা গুরুত্ব সহকারে বোঝানোর জন্যে ইন্‌স্‌পেক্টর হওয়ার গৌরব আর সম্মান কতখানি তা সে সাত কাহন ক'রে বলত। লীলাবতীর পছন্দ জজসাহেব স্বামী। জজের গুণপনা বর্ণনা করার সময় তার ভাবভঙ্গিতে ফুটে উঠত বিলক্ষণ জজগিন্নীর রূপ। নিজের নিজের স্বামী পছন্দ বিষয়ে কথাবার্তা বলার সময় মাঝে মাঝে ঝগড়াও লাগত তাদের মধ্যে; কেননা, কেউই এটা ভাবতে চাইত না যে তার পছন্দসই স্বামী অন্যের পছন্দসই স্বামীর চেয়ে কোন অংশে খারাপ। এ-সব আলোচনা থেকেই ধরা পড়ত তাদের রুচি আর কল্পনার বহর। ঝগড়া করতে করতেই নলিনী হয়তো বলল, 'পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টরকে দেখলেই সবাই কাঁপতে শুরু করে।'

শুনে লীলাবতী বলল, 'কেন জানিস না বুঝি, জজসাহেব অপরাধীর ফাঁসির হুকুম পর্যন্ত দিতে পারেন!'

এদের মাঝখানে ফোড়ন কেটে পদ্মাক্ষী বলল, 'আর উকিল না থাকলে ইন্‌স্‌পেক্টর আর জজসাহেব কী করত শুনি!'

শেষে সরোজিনী বলল, 'আমার স্বামী এমনই সম্পন্ন, বিদ্বান আর সুন্দর হবেন যে তাঁর সামনে আর-সকলকেই কুকুর আর পোকা-মাকড়ের মতো লাগবে। আমার স্বামীকে সবাই তোয়াজ করবে।'

অবশ্য ভাবী স্বামী যে রূপবান হবে এ-বিষয়ে সবাই ছিল একমত।

বন্ধুদের মধ্যে সকলের আগে নলিনীর বিয়ের কথাবার্তা শুরু হল। খবরটা সে বন্ধুদের কাছে লুকিয়ে রেখেছিল। বিয়ে একেবারে ঠিকঠাক হয়ে যাবার পর যখন ও পড়াশুনা ছেড়ে দিল, তখনই সকলে জানতে পারল ওর বিয়ে। এ-খবরও ওরা পেল যে নলিনীর ভাবী স্বামী কারখানায় হিসেবপত্র রাখার চাকরি করে, মাইনে মাত্র তিরিশ টাকা। তবে সুন্দর না হলেও লোকটিকে অসুন্দরও বলা চলে না।

লীলাবতী, সরোজিনী, পদ্মাক্ষী— সকলেই এলো বিয়েতে। সকলেই ভেবেছিল পছন্দসই বর না পেয়ে নলিনী বুঝি মুষড়ে পড়বে। দেখল, নলিনীর বেশ হাসিমুখ। তখন ওরা ভাবল, নলিনীর আগের কথাগুলো বোধহয় ইয়ার্কিই ছিল।

লীলাবতী তো জিজ্ঞেসই করে ফেলল, 'আ-হা, কেরানীর বউ হ'তে কি তোর ভালো লাগছে?'

নলিনী বলল, 'সবই কি নিজের পছন্দমতো হয়, ভাই! স্বামী যে-রকমই হোক, খুশি মনে তাঁকে মেনে নেওয়াই ভালো।'

পদ্মাক্ষী বলল, 'তোর তো পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর বরই জুটে যাওয়ার কথা। তাহ'লে কেরানীকে বিয়ে করছিস্ কেন?'

নলিনী খানিকটা দুঃখিত গলায় বলল, 'এই আমার অদৃষ্ট! আমরা ভাবি একরকম, হয় আর-একরকম।'

ভাগ্যের কথা শুনে রেগে গেল সরোজিনী। বলল, 'ভাগ্যের দোহাই দিচ্ছিস কেন! আমি তো যা ভাবি তাই ক'রে ছাড়ি। শুধু প্রতীক্ষা ক'রে থাকা, ধৈর্য ধ'রে থাকা! তুই দেখিস, আমার বিয়ে ঠিক আমার ইচ্ছে মতনই হবে।'

নলিনী কঠোর গলায় বলল, 'আমার যা অবস্থা তাতে এই বিয়েতেই আমি খুশী থাকার চেষ্টা করব।'

তর্ক-বিবাদের সেখানেই ইতি হল। বন্ধুদের শুভেচ্ছার মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল নলিনীর। বিয়ের পর যে যার বাড়ি চ'লে গেল।

2

নলিনীর বিয়ের পরও সরোজিনী, পদ্মাক্ষী, লীলাবতীর একসঙ্গে স্কুলে যেতে যেতে ভাবী স্বামী নিয়ে যথারীতি ঝগড়া করত। ওরা ঠিক করল নলিনীর মতো ফাঁদে পা দেবে না; ওর মতো ব্যর্থ হবে না। এদের মধ্যে পদ্মাক্ষী ছিল সবচেয়ে বুদ্ধিমতী। সে বলল, 'পরিস্থিতি অনুযায়ী নলিনী ঠিকই করেছে। বড়ো বড়ো ইচ্ছে থাকলেই যে তা পূরণ হবে তার কী মানে আছে!'

পদ্মাক্ষীর কথায় বেশ ক্ষুব্ধ হল সরোজিনী। প্রতিবাদ ক'রে বলল, 'কী আজেবাজে কথা বলছিস্! শিক্ষায় বা রূপে আমি কি কম যাই নাকি!'

সরোজিনীর কথায় সায় দিয়ে লীলাবতী বলল, 'আমার রূপ-গুণের তুলনায় আমার আকাঙ্ক্ষা কি নিতান্তই সামান্য।'

পদ্মাক্ষী এবার ঠাট্টার সুরে বলল, 'কী জানি ভাই, এখন কি আর রূপ-গুণের কদর আছে। টাকার জোরেই সবকিছু হয়। সবাই তো দেখি টাকার পেছনে ছোটে! টাকা না থাকলেই

ফক্কা। আমাদের চেয়ে কত সুন্দরী আর শিক্ষিতা মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না।'

একটু ঠেস্ দিয়ে পদ্মাক্ষীকে বলল সরোজিনী, 'তুই বড়লোক, তাই টাকার গুমর দেখাচ্ছিস। বড়লোক ব'লে তোর গর্বে পা পড়ে না। ওসব বড়মানষেমি নিজের কাছেই রাখ, বুঝলি! আমি গরীব তো কী, আমারও আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে। নিজের পছন্দমতো বর না পেলে আমি বিয়েই করব না।'

পদ্মাক্ষী আর কিছু বলল না।

সরোজিনী প্রতিজ্ঞা করল উকিলের সঙ্গে বিয়ে না হলে বিয়েই করবে না।

ভাবী স্বামীকে নিয়ে প্রায়ই নানারকম স্বপ্ন দেখত সরোজিনী; তার মন ভ'রে যেত আনন্দে। স্বপ্ন দেখত বেড়াতে বেরিয়েছে স্বামীর সঙ্গে, আর সবাই তাদের আদর-যত্ন করছে। স্বপ্নেই সে দেখত তার উকিল স্বামীর কাছে নিজের নিজের সমস্যা নিয়ে এসেছে বহুলোক। স্বামী না থাকলে কখনো-সখনো সে নিজেই পরামর্শ দেয়। জজ, ইন্‌স্‌পেক্টররা সেলাম ঠোকে তার স্বামীকে। মেয়েরা তার স্বামীকে দেখে হিংসে করে, কিন্তু অতদূর পৌঁছবে কী ক'রে! ওঁর ভালোবাসায় শুধু আমারই অধিকার থাকবে!

কেউ কিছু বলত না সরোজিনীকে। সরোজিনী ভাবত, ঠিক আছে, আগে বিয়েটা হোক, দেখব সবাই মাথা ঝোঁকায় কিনা।

এইভাবে একটা বছর কেটে গেল। তিনজনেই ম্যাট্রিক পাস করল। সকলেরই ইচ্ছে ছিল কলেজে পড়বে। কিন্তু, কলেজে ভর্তি হবার সচ্ছলতা সরোজিনী আর লীলাবতীর ছিল না।

সরোজিনীর বাবা একজন সাধারণ কৃষক। খুবই কষ্টে ক'রে

সংসার চালাত। সরোজিনীকে ম্যাট্রিক পাস করাতেও তার কষ্ট হয়েছিল খুব। সরোজিনীর ছোট দুটি ভাইও হাইস্কুলে পড়ছে। সরোজিনীর কলেজ আর তার দুই ভাইয়ের ইংরিজীস্কুলে পড়ানোর খরচ চালানো কৃষক পিতার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মেয়েকে কলেজে পড়াতে গেলে না খেয়ে মরতে হত।

সরোজিনীর মা-বাবা ভাবত, মেয়ে ম্যাট্রিক পাস করেছে, আর পড়িয়ে লাভ কী! এখন ওর বিয়ে দিলেই হয়। শিক্ষিতা, সুন্দরী মেয়ের জন্যে উকিল পাত্র জুটবে, বাপও তাই ভাবত। আর ভাবত, খুব ধুমধাম ক'রে বিয়ে দেবে মেয়ের। সরোজিনীর মা বলত, 'ওসব বড় বড় আশা ছাড়ো। নিজেদের যেমন অবস্থা তেমনি ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিলেই তো ঝামেলা চুকে যায়।' মার কথায় বিরক্ত হত সরোজিনী, তবু একটু রেখে-ঢেকেই বলত, 'তাহলে মার কথামতোই—'

পদ্মাক্ষীর বাবা বড়লোক। মেয়েকে আরো লেখাপড়া শেখানোর মতো যথেষ্ট সামর্থ্য থাকলেও পদ্মাক্ষীর জন্যে বর খুঁজতে শুরু করলেন তিনি। চেষ্টায় সত্বর সফলও হলেন। পদ্মাক্ষীর জন্যে পছন্দ করলেন এক তরুণ ও রূপবান এঞ্জিনীয়ার পাত্র। পাত্র এলো মেয়ে দেখতে। ছেলের আদব-কায়দায় সকলেই মুগ্ধ। ওইদিনই সরোজিনী আর লীলাবতী দেখা করতে এসেছিল পদ্মাক্ষীর সঙ্গে। লীলাবতীরও বেশ পছন্দ হ'ল ছেলেটাকে। সে সরোজিনীর মত জানতে চাইল; কিন্তু, সরোজিনী বিশেষ-কিছুই বলল না।

লীলাবতী বলল, 'পদ্মাক্ষী চেয়েছিল উকিল বর। কিন্তু এঞ্জিনীয়ারের রূপ ধ'রে যে এলো সে আরো ভালো। ও সত্যিই ভাগ্যবতী।'

সরোজিনী বলল, 'এতে ভাগ্যের কী আছে ! আমার এর চেয়ে অনেক ভালো বর হবে।'

তারপর দু'জনেই চ'লে এলো।

বাড়ি পৌঁছে সরোজিনী পদ্মাক্ষীর বরের গুণপনা স্বীকার করতে করতে ভাবল, সত্যিই ছেলেটি কোমল স্বভাবের, বুদ্ধিমান আর বড়ো অফিসার; কিন্তু দেখতে আর এমন কী ! আমার স্বামী নিশ্চয়ই এর চেয়ে আরো যোগ্য আর সুন্দর হবে ! তার সামনে এ কি আর দাঁড়াতে পারবে ! এইভাবে নিজের স্বপ্নের পুরুষের সঙ্গে সে দিন কাটাতে লাগল। কখনো ভাবে দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ প্রেম নিয়ে এক তরুণ যুবা তাকিয়ে আছে তার দিকে। যুবকের মুগ্ধ দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে যখনই আত্মসমর্পণের জন্যে এগিয়ে যায় সরোজিনী, তখনই সে হারিয়ে যায় দূরে। স্বপ্নের মধ্যে চেঁচিয়ে ওঠে সরোজিনী; ঘুম ভাঙার পর বাস্তবের কঠিন সত্য মুহ্যমান ক'রে রাখে তাকে। তবু হতাশ হয় না। আবার চোখ বন্ধ করলেই ফিরে আসে তার আরাধ্য দেবতা। ধীরে ধীরে আবার সে চেষ্টা করে তার দিকে এগোতে।

খুব ধুমধাম ক'রে বিয়ে হ'ল পদ্মাক্ষীর। শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় সরোজিনীর বাড়ির সামনে দিয়েই গেল সে। সরোজিনী দাঁড়িয়ে ছিল দরজায়। স্বামীর পিছনে পিছনে সুখী হাঁসের মতো হাঁটছে পদ্মাক্ষী— দৃশ্যটা অসহ্য লাগল সরোজিনীর। সরোজিনীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পদ্মাক্ষী বলল, 'বিয়েটিয়ে হলে খবর দিস। আর চিঠি লিখবি কিন্তু !'

'হুঁ !' সংক্ষিপ্ত জবাব দিল সরোজিনী। খুশিতে ডগমগ হয়ে চ'লে গেল পদ্মাক্ষী।

তখন সরোজিনীর চোখের কোলে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

3

কাজ বলতে সরোজিনীর আজকাল একটাই; এক কোমল, নবীন যুবার সঙ্গে স্বপ্ন-বিহার। শিক্ষিতা আর সুন্দরী ব'লে রান্নাবান্নার কাজে তার আদৌ উৎসাহ ছিল না। হেঁসেলে ঢুঁ মারত রান্নাবান্না হয়ে যাবার পর। স্নান ক'রে হাতে আয়না ধ'রে পরখ করত নিজের রূপ; মন ভরে যেত গর্বে। তারপর বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা ইংরিজী বইয়ের পাতা ওল্টাত। কিন্তু, মন কি আর সেখানে থাকত!

পাড়ার এক মাসীমা সরোজিনীর মাকে বলত, 'মেয়েকে কাজকর্ম না শেখালে বিয়ের পর চলবে কি ক'রে?'

মা বলত, 'লেখাপড়া শেখা মেয়ে, ও কাজ করবে কী ক'রে! বিয়ে হলে নিজেই শিখে নেবে। বাপের আদুরে মেয়ে তো! ওকে কাজ ক'রতে দিলেই উনি অসন্তুষ্ট হন।'

আরো দু'চার মাস গেল। কয়েক জায়গা থেকেই বিয়ের সম্বন্ধ এলো সরোজিনীর। একজন বীমা কোম্পানির এজেন্ট, একজন আদালতের পেশকার আর একজন ব্যাবসাদারের ছেলের পছন্দ হল সরোজিনীকে। সরোজিনীর মা-বাবা খুব আদর যত্ন করল ওদের, মেয়েকে বলল এদের মধ্যে যে-কোন একজনকে বেছে নিতে। কিন্তু, ওদের কাউকেই পছন্দ হ'ল না সরোজিনীর।

শেষপর্যন্ত ওর বিয়ের ব্যাপারটাও ধামাচাপা পড়ল। মাকে স্পষ্টই ব'লে দিল সরোজিনী, 'এইধরনের লোকদের সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ করলে আমি আত্মহত্যা করব।'

সরোজিনীদের বাড়ির পাশেই প্রাইমারি স্কুল। সেখানে এলো

এক নতুন মাস্টার। নাম এম. আর. মুট্টটম্। পত্র-পত্রিকায় এই লোকটির কিছু-কিছু কবিতা ছাপা হয়েছিল। আজকাল মুট্টটমের নজর শুধু সরোজিনীর দিকে। সরোজিনী স্নান ক'রতে গেলে সে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টিতে। সরোজিনীর উদাসীন চোখও কখনো কখনো ছুঁয়ে যায় তাকে।

একদিন সন্ধ্যায় সরোজিনীদের বাড়ি এসে ওর মায়ের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল মুট্টটম মাস্টার। সরোজিনীও এলো সেখানে। সেই সুযোগে মাস্টার নিজের কয়েকটি কবিতা শোনাল— সবই প্রেমের রহস্যময় কবিতা। শুনে খুব প্রশংসা করল সরোজিনী।

এরপর থেকে মাস্টার প্রায়ই ওদের বাড়িতে আসে আর প্রেমের কবিতার মাধ্যমে বিস্তার করে নিজের প্রেম। মাস্টার লক্ষ্য করেছিল প্রেমের কথাবার্তা সরোজিনীর বেশ ভালোই লাগে। তখন সে নানাভাবে প্রেমের ব্যাখ্যায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল— বোঝাতে চাইল, প্রেমই সৌন্দর্যের নির্ঝর, মুক্তির দ্বার, শান্তির আহ্বান, ব্রহ্মের সত্তা ইত্যাদি। সরোজিনী অবশ্য কিছুই বুঝত না। কিন্তু আরো শোনার জন্য তার মনপ্রাণ ব্যাকুল হয়ে থাকত।

একদিন সরোজিনী মাস্টারকে জিজ্ঞেসা করল, 'আচ্ছা, অদেখা লোকের সঙ্গে কি প্রেম হয় কখনো?'

যুবক তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হাঁা, নিশ্চয়ই। দিব্য প্রেমে সবকিছুই হতে পারে।'

সরোজিনী আবার জিজ্ঞেস করল, 'একজন সম্পর্কে কিছু না জেনেও কি তাকে ভালোবাসা যায়?'

মাস্টার বলল, 'কেন যাবে না! প্রেমই আমাদের চৈতন্য আর মনের আগুন, এই-ই তো ঈশ্বরের লীলা!'

সরোজিনী জিজ্ঞেস করল, 'অদেখা অচেনা জনের সঙ্গে ভালোবাসা কি সফল হয়!'

মাস্টার বলল, 'কেন হবে না! তার দৃষ্টান্ত তো আমিই!'

সরোজিনী বলল, 'আপনি একজনকে দেখলেন না, শুনলেন না, তবু ভালোবাসলেন! এই প্রেম কি সফল?'

খুব উৎসাহে মাস্টার বলল, 'হ্যাঁ, এখনই তা সফল হ'ল। তোমাকে দেখার বা জানার আগে থেকেই আমি তোমাকে ভালোবাসি। এখন তো আর কোন কথাই নেই! সবই ভগবানের লীলা।'

রেগেমেগে সরোজিনী বলল, 'আজে-বাজে বকবেন না। আপনার সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র প্রেম-ভালোবাসা নেই।'

শুনে অবাক ও চকিত মাস্টার বলল, 'ছি, প্রেম অতি পবিত্র, তার নিন্দে কোরো না!'

সরোজিনী বলল, 'আমি প্রেমের নিন্দে করছি না। কিন্তু আমার প্রেম আমি আর-একজনকে উৎসর্গ করেছি।'

যুবক জিজ্ঞেস করল, 'কে সেই সৌভাগ্যবান?'

সরোজিনী বলল, 'সে ভাগ্যবান, সে ধন-কুবের, সে কোমল-কান্তি, সুপণ্ডিত আর সুযোগ্য। কোথায় সে, আর কোথায় আপনি!'

হাসতে হাসতে মাস্টার বলল, 'সেও কি তোমার সঙ্গে প্রেম করে?'

'সেটা জানবার জন্যেই তো জিজ্ঞেস করছিলাম আপনাকে। তাকে কখনো আমি চোখে দেখি নি, তার কথাও কিছু শুনি নি।' সরোজিনী বলল।

যুবক একটু মাথা নেড়ে বলল, 'তোমার প্রেম নিশ্চয়ই সার্থক হবে—' সে চলে গেল। এবং ক্রমশ সরোজিনীদের বাড়িতে আসা বন্ধ করল।

4

কেটে গেল আরো চার-পাঁচটা বছর। সরোজিনী এখনো অপেক্ষা করছে সেই সুন্দর, শিক্ষিত, ধনবান স্বামীর জন্যে— আজও তার কল্পজগতে বিচরণ শেষ হয় নি। কাল্পনিক স্বামীর হাত ধ'রে সে হাঁটে আস্তে আস্তে। দূর থেকে তার ডাক শুনে মাথা নীচু করে, কথা বলে পরস্পর। স্বামী চুম্বন করে তাকে, মিলেমিশে এক হয়ে যায় তারা। বেঁচে-থাকার কঠিন সত্যের মধ্যে চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই হারিয়ে যায় সরোজিনীর স্বামী, চোখ বন্ধ ক'রলেই ফিরে আসে আবার।

এ-সবই কল্পনা, শুধু কল্পনা!

মা-বাবাও এখন ঘৃণা করে সরোজিনীকে। তাদের বোঝা ছাড়া সে এখন আর কী! কাজকর্ম না ক'রে থাকার মতো সংসার তাদের নয়, পৃথিবীও এমন চালচলনে অভ্যস্ত নয়। মা একদিন বাবাকে বলল, 'যা'র সঙ্গেই হোক বিয়ে দিয়ে দাও মেয়ের। বাড়িতে তো রানী সেজে বসে আছে। আমরাই বা আর কতদিন বসিয়ে বসিয়ে ওকে খাওয়াব? তুমি আর ও ব'সে আছ জজসাহেবের প্রতীক্ষায়। আর কতদিন অপেক্ষা করবে? অপেক্ষা করতে করতে তো বুড়ী হয়ে যাবে মেয়ে! অবশ্য, আমার আর কী!'

বাবাও এখন মা'র কথায় সায় দেয়। তখন সেই ইনসিওরেন্সের

এজেন্টকে বিয়ে করলেই পারত! ছেলেটার পয়সা ছিল, দেখতে-শুনতেও ছিল ভালো, কী আর খারাপ মানাত! একাউন্টেন্ট ছেলেটাই বা কী খারাপ ছিল! কিন্তু মেয়ের নজর যে উঁচু! এখন তো আর কাউকেই পাওয়া যাচ্ছে না!

এসব যত শোনে ততই মুষড়ে পড়ে সরোজিনী। হতাশা ঘিরে ধরে তাকে। নতুন কাপড় আর ফুলের জন্যে ছটফট করে সে। মা রাগ করে, বাবা কিছুই বলে না। স্নান করার জন্যে এখন আর সাবানও জোটে না তার। ক্রীম, পাউডারের জায়গায় এসে জমে হেঁসেলের ধোঁয়া। মা এখন খুব খাটায় ওকে। কাপড়-চোপড়ের অবস্থাও ক্রমশ জীর্ণ হতে থাকে।

রান্নাবান্না কখনও সে পছন্দ করত না, এখন তাই করতে হয়। কিছুতেই সহ্য করতে পারে না ব্যাপারটা। কল্পলোকের কাল্পনিক স্বামীর সঙ্গই এখন তার একমাত্র কাম্য।

খাটতে খাটতে ক্রমশ জীবনের কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হল সরোজিনী; বুঝতে পারল জীবন শুধুই স্বপ্ন আর কল্পনা নয়। জীবন পাথরের চেয়েও কঠিন। ওর বন্ধুরা আগেই অনুমান করেছিল ব্যাপারটা, তাই পছন্দসই স্বামীর কথা ভুলে নলিনী বিয়ে করল কেরানীকে, আর পদ্মাক্ষী এক এঞ্জিনীয়ারকে। লীলাবতীর কী হল কিছুই জানা গেল না। একদিন যারা তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল তাদের কথা ভাবে সে। কিন্তু এখন আর ভেবে লাভ কী! একাউন্টেন্ট, এজেন্ট বা ব্যাবসাদারের ছেলেকে বিয়ে করলে তারা তাকে খুশিই রাখত, ভালোই বাসত। এ-সব ভেবে আজকাল তার চোখে জল আসে।

বর পাবার জন্যে মা ওকে সোমবার সোমবার ব্রত পালন

করতে বলল। এখন প্রতি সোমবার সে মন্দিরে যায়। এক সোমবার মন্দিরে গিয়ে লীলাবতীকে দেখল সেই মাস্টারের সঙ্গে। তু'জনকে একসঙ্গে দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল সরোজিনী। লীলাবতী তার হাত ধরে ক্ষমা চেয়ে বলল, 'খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে বিনা আড়ম্বরেই বিয়েটা হ'ল, তাই কাউকে জানাতে পারি নি ভাই!'

কিছু না ব'লে গল্প-গুজবের জন্যে লীলাবতীকে আড়ালে নিয়ে গেল সরোজিনী। খানিক এ-কথা সে-কথা ব'লে বিদায় নিল তু'জনেই। মাস্টার শুধু যাবার সময় সরোজিনীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

5

মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার মুখে ছাই দিয়ে এগিয়ে চলে নিষ্ঠুর সময়। এখন সরোজিনীর বয়স বত্রিশ।

একদিন খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখল সে। দেখতে দেখতে দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার, 'হে ভগবান!' তেল ফুরিয়ে নিবে-যাওয়া প্রদীপের গায়ে যেমন বিবর্ণ দাগ পড়ে তেমনি দাগ পড়েছে তার চোখে-মুখে।

একদিন রাত্রে সবাই শুতে গেলে প্রদীপের আলোর সামনে ব'সে নিজেকে নিয়ে সাত-পাঁচ ভাবছিল সরোজিনী। এমন সময় চায়ের দোকানের কোন্তি এলো। এ-বাড়িতে ওর অবাধ যাওয়া-আসায় অসুবিধে ছিল না কোন। এ-বাড়ির লোকজন খুব বিশ্বাস করত ওকে।

কোন্তি বিয়ে করে নি, সুতরাং একা। জ্ঞান হবার পর থেকেই সরোজিনী ওকে চায়ের দোকানে ব'সে থাকতে দেখেছে। পান

খেয়ে খেয়ে ওর চেহারা এখন একেবারে থলথলে হয়ে গেছে। কেউ বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করলে কোন্তি বলে, 'তোমরা বিয়ে-থা করে সুখী হও, তাতেই আমার সুখ।'

সরোজিনীর পাশে বসে সে জিজ্ঞেস করল, 'প্রদীপের সামনে বসে বসে স্বপ্ন দেখছ নাকি সরোজিনী?'

সরোজিনী বলল, 'ঘুম আসছিল না। তাই বসে ছিলাম। মাকে ডাকব?'

'না, না' মেঝেয় পানের পিক্ ফেলে ও বলল, 'আর কতদিন এমন একা-একা কাটাবে!'

এ প্রশ্নের মানে বুঝে সরোজিনী বলল, 'এখন আর বসব না। শুতে যাব।'

সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'একা-একা থাকা কি ভালো?'

সরোজিনী বলল, 'কেন, তুমিও তো একাই থাকো!'

কোন্তি চুপ ক'রে গেল। একটু পরে বলল, 'আমার কথা আলাদা। সবই তো অদৃষ্টের ব্যাপার!' কিছুক্ষণ চুপচাপ ব'সে ব'সে থাকল দু'জনে। আজ সরোজিনীর সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা অশ্রু হয়ে নামল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলল, 'ভগবান আমাকে এইভাবেই দেখতে চায়, কোন্তি দাদা!'

কোন্তিও বলল, 'হ্যাঁ, সবই ভগবানের খেলা।' একটু থেমে সে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরুল না কোন।

পুব দিগন্তে পূর্ণ মহিমায় উঠে এলো চাঁদ। দু'জনেই তাকিয়ে থাকল সেইদিকে। কোন্তি আবার কিছু বলতে চেয়ে থেমে গেল হঠাৎ। সরোজিনী জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলছিলে?'

'না —'

তবু কিছুক্ষণ পরে সে জিজ্ঞেস করল, 'রাত কত হল ?'

'বারোটা বেজে গেছে—'

'বারোটা !'

'হ্যাঁ !'

কোন্তি উঠে পড়ল ; জোরে শ্বাস টেনে কিছু বলতে চাইল, পারল না। তার মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়ে এলো অব্যক্ত এক ধ্বনি।

সরোজিনী জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলবে—?'

'না। গিয়ে শুয়ে পড়ো।'

'আমি যাচ্ছি। তুমি এবার যাও।'

'তুমি গেলে আমি যাব। রাত্রে একা-একা বসে থাকা ঠিক নয়।'

প্রদীপ হাতে উঠে দাঁড়াল সরোজিনী। দীর্ঘশ্বাস ফেলল কোন্তি। ঘরে ঢুকে দরজাটা আস্তে বন্ধ ক'রে দিল সরোজিনী।

প্রদীপ হাতে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকল সে···সর্বত্র জুড়ে নীরবতা। দুঃসহ একাকীত্ব··দীর্ঘশ্বাস। প্রদীপ নিবে যায়··· ও দরজা খুলল।

স্তব্ধ মূর্তির মতো বাইরে দাঁড়িয়েছিল কোন্তি। মৃদু গলায় সরোজিনী জিজ্ঞেস করল, 'এখনো যাও নি ?'

কোন্তি জিজ্ঞেস করল, 'এখনো শোও নি ?'

আবার ফিরে এলো নৈঃশব্দ্য।

সরোজিনী জিজ্ঞেস করল, 'যাবে না ?'

কোন্তি জিজ্ঞেস করল, 'ঘুমোবে না ?'

আবার নৈঃশব্দ্য। দু'পা এগিয়ে এসে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল কোন্তি। ডান পা দাওয়ার ওপর উঠিয়ে নামিয়ে নিল আবার।

সরোজিনী জিজ্ঞেস করল, 'যাবে না?'

কোন্তি বলল, 'শোবে না?'

সরোজিনী বলল, 'হুঁ—'

কোন্তি বলল, 'হুঁ—'

মাত্তনের গল্প

তকৃশী শিবশঙ্কর পিল্‌লে

'মা, বাবা কি আজও আসবে না?' প্রার্থনার মধ্যেই টেরেসা মাকে জিজ্ঞেস করল।

প্রার্থনা করার সময়েও মারিয়ার মন পড়ে ছিল ঘাটে নৌকার শব্দের দিকে। বলল, 'আসবে, মা, আজই আসবে।'

মারিয়া সেই দিনের মতো তার প্রার্থনা জানাল। সংগৃহীত খাদ্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল। টেরেসাও মার সঙ্গে স্বর মেলালো। দু'হাত ছড়িয়ে, মাথা ঝুঁকিয়ে, ছেঁড়া কাপড়, খালি পেট, ঈষৎ উন্মুক্ত ঠোঁট ও অর্ধনিমীলিত চোখে যিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে আছেন তাঁর দিকে তাকাল। ম্লান প্রদীপের আলোয় সেই আকৃতির ঠোঁট দু'টি যেন আরো উন্মুক্ত হতে চাইছে, যেন ঈশ্বর কিছু বলতে চাইছেন। 'প্রভু, আমাদের রক্ষা করো—', আবার উচ্চারিত হ'ল সেই প্রার্থনা। টেরেসা কিছুই বলল না।

কাছেই শুয়ে আছে রোসা, ঘুমের মধ্যেই কিছু বিড়বিড় করল। টেরেসা আবার জিজ্ঞেস করল, 'বাবা না এলে আমরা খাব কী, মা?'

মা বলল, 'আসবে, বাছা।'

আর একটু পরেই প্রদীপটা নিবে যাবে। সেটা হাতে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করল মারিয়া। রাত বাড়তে লাগল। তারপর শুরু হ'ল বৃষ্টি। আর তেমনি ঝড়।

ওরা নিঃশব্দে প্রার্থনা করতে লাগল। কিন্তু, মনে হচ্ছে, প্রার্থনা ভগবানের কানে পৌঁছচ্ছে না। গভীর জলাশয় আর নদী পেরিয়ে আসতে হবে তাকে— সেই পাহাড়ের কাছ থেকে। এখান থেকে ঝিলের সীমানা চোখে পড়ে না। সাহায্য করার মতো একটিও লোক সঙ্গে নেই; নদীও আজ উত্তাল। হাতের বাঁশের লগিটা যদি ভেঙে যায়?— এমব ভাবনায় যীশুর পায়ে লুটিয়ে পড়ল সে। দুটি মেয়ে আছে তার!

টেরেসা আবার জিজ্ঞেস করল, 'এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় গেল বাবা? ভিজলে যে জ্বর হবে!'

মারিয়া চোখ খুলল। সে-চোখেও একই আর্তি। প্রদীপটা নিবু-নিবু। ঘাটে নৌকা ভেড়ানোর শব্দ শোনার জন্য উন্মুখ মা ও মেয়ে বাইরে তাকাল— ঘন অন্ধকারে চোখ আটকে গেল। কিছুই চোখে পড়ল না!

'মা, বাবা!'

'টেরেসা মা!'

বাইরে কেউ ডাকছিল।

'একটু আলোটা দেখাও, মা।'

'প্রদীপটা নিবে গেছে, বাপী।'

টেরেসা আর-একটা প্রদীপ নিয়ে বারান্দায় যেতে-না-যেতেই সেটাও নিবে গেল। মাত্তন বারান্দায় এলো। হাতে ছড়ি আর একটা বড়োসড়ো পুঁটলি।

'আলোটা দেখা, মা।'

'আগুন নেই যে!'

বাবার কাছে পৌঁছনোর জন্যে অন্ধকারেই হাতড়াচ্ছিল টেরেসা।

কিন্তু, কোথায় বাবা। রোসাও উঠে পড়েছিল। সেও বাবাকে ডাকতে লাগল। বাবার কাছে ছুটে যাবার চেষ্টা করতেই টেরেসার ঠোঁটে ওর মাথার ঠোকর লাগল।

'উনুনেও আগুন নেই বুঝি?' জিজ্ঞেস করল মাত্তন।

আজ তবে বাড়িতে উনুন জ্বলে নি। মাত্তনের মাথা ছেয়ে গেল রাগে। উনুন পর্যন্ত জ্বলে নি!

'বাচ্চাগুলো কিছু খায় নি? তুমি কিছুই দাও নি বোধহয়!'

ভিজে একশা হয়ে গেছে মাত্তন। রোসাই আগে ওর কাছে পৌঁছুলো।

মেয়েকে কোলে তুলে নিল মাত্তন।

'সকালে আর বিকেলে খাইয়েছি। রাতের জন্যে তো কিছুই নেই।' মারিয়া বলল, 'যা পেয়েছি খাইয়েছি ওদের। আজ কোন কাজকম্মও হয় নি। সকাল থেকেই যা বৃষ্টি!'

'তাহলে তো তুমিও কিছু খাও নি?' স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল মাত্তন।

'না।'

মেয়েকে মেঝেয় বসিয়ে মাত্তন গেল আগুন নিতে। তখন প্রায় মাঝরাত। চোখে ঘুম এলো না। শুয়ে ব'সে স্বামী-স্ত্রী আলাপ করতে লাগল।

স্বামী বলল, 'তিন টাকা দিল। তারপর মোটরে চড়ে তারা চলে গেল এর্ণাকুলামে।'

'আর এই চার আনা?'

'দিয়েছিল কফি খেতে। দালিয়া ছিল না। আর খেলুম না।'

'চাল পেলে কোথায়...'

'রাস্তা-খরচ থেকে বাঁচিয়েছি।'

'কত আছে?'

'ছ'পোয়া মতন।'

মাত্তন চলে যাবার পর থেকে যা যা ঘটেছে সব শোনাল মারিয়া। পাতা বানাতে ছ'দিন গিয়েছিল মটকাট্ট। ন'আনা পাওয়া গেছে। একদিন তারাপুরমে গিয়েছিল চাল ঝাড়তে। আর একদিন চারটে নারকোল বেচেছে। কিন্তু আজ জলঝড়ের জন্যে বেরুতেই পারে নি।

'তবে বাচ্চাগুলোকে না খাইয়ে রাখি নি।'

'কিন্তু তুমি তো খাও নি!'

ছ'জনেই চুপচাপ হয়ে গেল। ঘুমের আচ্ছন্নতায় নয়, চিন্তায়। যে-কোন সময়েই এই নীরবতা ভাঙতে পারে।

'এবার কত হবে?'

'চোদ্দ।'

'পয়সা পুরোটাই দিয়ে দেবে?'

'না হলে আর কী! এক বছরে এইটুকুই হ'ল। ওর বয়স তো আট হ'ল? আর পাঁচ-সাত বছরই মোটে বাকি।'

একটু চুপ ক'রে থেকে মাত্তন বলল, 'ছ'দশ পয়সা বেশি দিতে পারলেই তো ভালো, তাহলে ভালো বর পাওয়া যাবে। আমাদের অবশ্য কষ্ট সহ্য করতে হবে।'

মারিয়াও সায় দিল কথাটায়। ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল ছ'জনেই। স্বামী-স্ত্রী স্বপ্ন দেখছিল···মেয়ের বিয়ে ···শ্বশুরবাড়ি···

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে আরচ্চরায় গিয়ে হাজির হল মাত্তন। গিয়ে দেখল ওই ভোরেই চাক্কোর সঙ্গে দেখা করতে চার-পাঁচজন অপেক্ষা করছে।

চাক্কো ওই জায়গার বড়লোক মানুষ। অনেক জমিজমার মালিক। ওর ধনসম্পত্তি নিয়ে অনেক গল্পও প্রচলিত আছে। লোকটি অহংকারী নয়, বরং সহানুভূতিসম্পন্ন। কথাবার্তাও বেশ মিষ্টি। ওর মুখে কেউ কোনদিন রূঢ় কথা শোনে নি। তাছাড়াও আছে ঈশ্বরভক্তি, প্রত্যেক রবিবার নিয়ম ক'রে গীর্জায় যায়। এমন কিছুই করে না যাতে অধর্ম হয়। গীর্জার কল্যাণের জন্যে সম্প্রতি এক হাজার টাকা দান করেছে!

ঘুম থেকে উঠে বাইরে এসে মাত্তনকে দেখতে পেল চাক্কো।

'মাত্তন যে, কবে এলে?'

'কাল, রাত্তিরে।'

চাক্কোর সঙ্গে একান্তে কিছু কথাবার্তা বলার ছিল মাওনের; কিন্তু লোকের ভীড়ে বলবে কী করে! দেখা করতে এখানে লোকের ভীড় লেগেই থাকে। মাত্তন অস্বস্তিতে পড়ল।

ইতিমধ্যে চাক্কোর মেয়ে এসে কফি তৈরি বলে ডেকে নিয়ে গেল বাবাকে। সবাইকে ছেড়ে চাক্কো ভিতরে গেল কফি পান করতে। অবশ্য মাত্তনকেও সঙ্গে নিল।

খানিক বাদে বেরিয়ে এলো মাত্তন। চোখে-মুখে একটা খুশি-খুশি ভাব। আরো তিনটি টাকা সে চাক্কোর কাছে জমা দিতে পেরেছে। টেরেসার বিয়ের জন্য তাহ'লে চোদ্দ টাকা জমা হ'ল, এই ভেবেই খুশিতে আনচান ক'রে উঠল তার মন।

চাক্কোর বউ মাত্তনকে কিছু কাঠ কেটে দিয়ে যেতে বলল।

কাঠ কাটা হয়ে গেলে চাক্কো তাকে ডেকে নিল নিজের কাজে। ক্ষেতে চাষবাসের কাজ চলছে, সেইখানে ছুটতে হবে চাক্কোকে। মাত্তনকে নৌকা নিয়ে যেতে হবে।

নৌকায় যেতে যেতে চাক্কোর নামডাকের বহর টের পেল মাত্তন। এ তল্লাটের সবাই চেনে মাত্তনকে।

চাক্কোর মেয়ের জন্যে এক পাত্রের সন্ধান দিল মাত্তন। বড়লোকের ছেলে, বুদ্ধিমানও।

চাক্কো বলল, 'দেখি, ভেবে দেখি।'

ক্ষেতে পৌঁছুনোর পর মাত্তনকে গোবরের সার ছড়ানোর কাজ দেওয়া হ'ল। সে-কাজ শেষ হতে নারকেল পাতা সাজানো-গোছানোর কাজে হাত দিল। এরপর দশ মণ চাল বইতে হবে। কাজ কী কম! দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে এলো।

মাত্তন এতই ক্লান্ত হয়ে পড়ল যে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছে না। রসুইঘরের কাছে গিয়ে একটু গরম জল চাইল সে। জল তখনও তৈরি হয় নি। উনোনে ভাত ফুটছে। সেই সময় চাক্কো এসে পড়ল। •

'আরে এটা কি জল খাবার সময়?'

কুণ্ঠিতভাবে মাত্তন বলল, 'না। একটু ক্লান্ত লাগছিল কিনা…'

'দুপুরে নিশ্চয়ই বেশি খেয়ে ফেলেছ?'

'না, কিছুই খাই নি।'

'কেন!'

'ছিলই না কিছু ঘরে।'

'আচ্ছা, লোকজনের মজুরিগুলো একটু দিয়ে দাও।'

মজুরি ভাগ ক'রে দিতে দিতে সন্ধে উত্‌রে গেল।

এখন চাক্কোর প্রার্থনার সময়। ক্লান্তিতে শরীর সোজা করতে পারছিল না মাত্তন। মনও এলোমেলো। মাথা চুলকোতে চুলকোতে মাত্তন চাক্কোর পিছু-পিছু হাঁটতে লাগল।

· 'কী, তোমাকে ফিরতে হবে না?'

'কিছু চাল যদি দেন...'

'চাল! কী হবে?'

'বাচ্চাগুলোর জন্যে কিছুই নেই বাড়িতে।'

'আমি একটু প্রার্থনাটা সেরে আসি।'

মাত্তন ভাবল সে ছ'সের চাল চাইবে। মজুরি হিসেবে চার সের আর দু'সের আজ খাবার জন্য।

2

একজনকে পালাইয়ে পোঁছে দেবার জন্যে ডাক পড়ে মাত্তনের, কিন্তু সে শরীরে কোনও বল পায় না। সবাই বলে মাত্তন কোন কাজের নয়।

লোকজনকে ডেকে ডেকে মাত্তন বলে, 'আমাকেও একটু কাজ জুটিয়ে দাও না!'

লোকে যখন আর কাউকে খুঁজে পায় না তখনই তাকায় মাত্তনের দিকে। ওর ব্যাপারে কারুর হাত দিয়েই পয়সা গলে না। তবুও সে পাই-পয়সার হিসেব ক'রে যায়। ছোটখাটো কাজ পায় চাক্কোর বাড়িতে। যখন অন্য কোথাও কাজ জোটে না, তখন ওখানেই চলে যায়। সব কাজ শেষ করে সের চারেক ধান নেয়। এইভাবে দিন চলে যায়। কিন্তু কী মানে হয় এই ভাবে দিন চলার? কাপড় চাই, মাথার তেল চাই, গীর্জার চাঁদা দিতে হয়, মেয়েদের পড়াশুনো আছে — সবই চলছে চাক্কোর দয়ায়।

কারুর অসুখ-বিসুখ হলে সেখানেও সেবাশুশ্রূষার জন্যে ধরতে হয় চাক্কোকে। সে না থাকলে হত কি!

'আমিও তাই ভাবি।'

'বল না, কী করতে?'

চাক্কো ওর ভরণপালনের দেবতায় রূপান্তরিত হল। কী দয়া তার! কী তার ঈশ্বর-ভক্তি!

মেয়েদের জন্যে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলাই ছিল মাত্তনের স্বপ্ন। ওর কাজকর্মের ধরন থেকেই বেঁচে-থাকার জন্যে ওর লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যায়। বাচ্চাদের জন্ম হল, তারা হাত-পা নাড়তে শিখল, পড়ল, উঠল, হামাগুড়ি দিল, আর এই ভাবেই একদিন বড় হয়ে গেল। ছোট মেয়েটিও ধীরে ধীরে বড় হচ্ছিল। এখন সে বই আর শ্লেট নিয়ে স্কুলে যায়।

শুধু তাই নয়। এদের বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে আর-একটা হিসেবের অঙ্কও বড় হচ্ছিল ক্রমশ। অবশ্য সবটাই মনে মনে। মাত্তন রোজই চাক্কোর কাছে কিছু-না-কিছু জমা দিত। সেটা বাড়তে বাড়তে নব্বুই টাকায় দাঁড়াল।

মেয়েরা আছে, তাদের প্রতি কর্তব্যই ওকে কাজকর্ম পরিশ্রমে প্রেরণা দিত। যেন শুধু ওদের জন্যেই বেঁচে আছে সে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় স্বামী-স্ত্রী মিলে হিসেব মেলাতে বসত।

স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞেস করে, 'কত টাকা খরচ করলে মোটামুটি ভালো বর পাওয়া যায়?'

'দশ হাজার টাকা খরচ করলে এমন বর মিলবে যার নিজের বাড়িও আছে।'

স্ত্রী জিজ্ঞেস করে, 'অত টাকা কতদিনে জোগাড় হবে?'

এইভাবে মেয়েদের জন্যে ওর টাকা জমানো চলল। ওই চিন্তাতেই সারাক্ষণ খুশিতে ভরে থাকে মন। পেটে দানা না পড়লেও মুখ দিয়ে আক্ষেপের টুঁ আওয়াজটিও বেরোয় না। সারাক্ষণ উৎসাহে থাকে সে— মেয়ের বিয়ের টাকা তো জমা হচ্ছে!

মাত্তনের এই উৎসাহের কথা সারা গাঁয়ের লোকই জানে।

মা-বাবার এসব আলাপ প্রতিদিনই টেরেসার কানে যেত। বুঝত, টাকা বাড়ছে প্রতিদিন। কখনো কখনো ওদের হিসেবে ভুলও হয়। চার আর তিন জুড়লে আট হয়ে যায়। বুঝতে পারত ওদের হিসেবে ভুল হচ্ছে। সে ভাবত ব্যাপারটা বলে, কিন্তু মুখ দিয়ে টুঁ শব্দটি বেরুত না। ছোট হলেও মেয়ে তো?

তবুও টেরেসার অভিমান আর ধৈর্য কম ছিল না। বুঝত, তার অবস্থা খুব খারাপ নয়। মেছো টোমার মেয়ে একদিন বলল, 'আমরা বড়ই গরীব!'

টেরেসা বলল, 'আমরা গরীব হয়েও গরীব নই।'

ওর কথার অর্থ ঠিক বুঝতে না পেরে চাক্কোর মেয়ে হাসি জুড়ে দিল। মাথায় রোখ চেপে গেল টেরেসার, সে আবার বলল কথাটা।

হ্যাঁ, একমাত্র টেরেসাই জানে কথাটার মানে কী! আর-কেউই সে-কথার অর্থ বুঝতে পারবে না।

একদিন দুপুরে টেরেসা তার সহপাঠিনীদের সঙ্গে স্কুলের সামনে খেলছিল। এমন সময় শুনতে পেল ব্যাণ্ড বাজার শব্দ। শব্দটা শুনেই সে ছুটল বাড়ির দিকে···দেখল, বিয়ের মিছিল যাচ্ছে!

ওরা বিয়ের পর বাড়ি ফিরছিল। মারিয়া ওদের চেনে। বলল,

'আরে, ও তো অ্যানা, আমাদের বাড়ির কাছে থাকে। ছেলে আবিচ্চারির।' নতুন বউ তাকাল ওর দিকে। ও হাসল।

টেরেসা জিজ্ঞেস করল, 'বরপণ কত টাকা দিতে হল?'

'আমি ঠিক জানি না।' মারিয়া বলল।

বিয়ের মিছিল দেখে স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে রইল টেরেসা। ওর মাথায় অনেকরকমের চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকল। অবস্থাটা এমনই, যেন সে এ-সংসারের মানুষ নয়, আশপাশের সমস্ত কিছু থেকে বিচ্যুত, আর অপরিচিত। তার মন ধাবিত হল অজানা এক জগতের দিকে।

সখীরা সকলেই চলে গিয়েছিল। কিছুদূর গিয়ে মারিয়া দাঁড়িয়ে পড়ল, ডাকল টেরেসাকে। তখন হুঁস ফিরে পেল সে। ছুটে চলে এলো সখীদের মাঝখানে। ওদের মধ্যে একজন বলল, 'ও ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিয়ের স্বপ্ন দেখছিল।'

আর-একজন বলল, 'ছেলে কোথাকার রে?'

তৃতীয়জন জিজ্ঞেস করল, 'যৌতুক দিতে হবে কত?'

টেরেসার রাগ হল খুব। সকলকেই ধমক দিলে একচোট। এতে সখীরা সকলেই হাসতে শুরু করল।

টেরেসা বলল, 'হাসির কী আছে? যৌতুক আমিও দিতে পারি। আমার মা-বাবা তারই জোগাড় করছেন।' এই বলে সে চলে গেল সেখান থেকে।

ক'বছর কেটে গেল। মাস্তনের জমার অঙ্ক অনেক বড় হয়েছে। সেইসঙ্গে টেরেসার শরীর আর মনও। এখন সে পূর্ণ যুবতী। জমানো টাকা ফেরত নেবার সময় হয়েছে। টেরেসার বয়সী মেয়ের

বাপ-মাদের পরিশ্রান্ত হতে দেখে মাত্তনের বেশ আনন্দই হত। তার মেয়ের কিন্তু ভালো বরই জুটবে।

ওরা স্বামী-স্ত্রী যখন জমানো টাকাকড়ি নিয়ে আঁক কষে, টেরেসার মন তখন অন্বেষণ বিচরণ করে বেড়ায় বিশাল ব্যাপ্ত পৃথিবীতে। কোথাও একজন পুরুষ অপেক্ষা করছে তার জন্যে। সে কেমন হবে? কী করছে সে এখন! গায়ে পাঞ্জাবি আর মাথায় টুপি পরা একটি পুরুষ তার গলায় পরিয়ে দিচ্ছে মঙ্গলসূত্রের হার— এ-ছবি স্পষ্ট ফুটে ওঠে তার মনে।··· শ্বশুরবাড়ি!··· সে কেমন? বাড়ি আর জমি সবই তার ;··· সে খুব ভালোবাসবে তাকে, শুশ্রূষা করবে···তার বদলে ভালোবাসা পাবে কি? সেও একদিন মা হবে।

সারাক্ষণই এইসব ভাবত টেরেসা। ঘুম থেকে জাগরণের মুহূর্তেও সেই অজ্ঞাত পুরুষের চিন্তায় কর্ণমূল লাল হয়ে ওঠে তার।

কত বয়সে বিয়ে হবে? ষোলো বছর বয়সেই বিয়ে হয়েছে এমন ক'জন বন্ধুর কথা মনে পড়ল ওর।

তার বয়স সতেরো। বাবার বোধহয় আমার বয়সটাও ঠিক খেয়াল নেই। কিন্তু মা নিশ্চয়ই জানে।

মারিয়া একদিন মাত্তনকে বলল, 'এইভাবে বসে থাকলেই চলবে! টেরেসা সতেরোয় পড়ল যে!'

মাত্তন বলল, 'আমার মনে আছে। আমি ঠিকই দেখছি। ছেলে খুঁজতে হবে তো? এর মধ্যে যদি আরো কিছু জমানো যায় ভালোই হবে।···'

আরো কিছুদিন কেটে গেল। মাত্তন গিয়েছিল বাইরে। ফিরে এসে বলল, 'ছেলে পেয়েছি। বেশ ভালো ছেলে। বছর কুড়ি

বয়স হবে। বিড়িটা পর্যন্ত খায় না। বাপের এক ছেলে, ওর এক একর জমি আছে। সামনের রবিবার মেয়ে দেখতে আসবে।'

মা জিজ্ঞেস করল, 'দিতে হবে কত?'

'পাঁচ হাজার আনা।'

মনশ্চক্ষে শ্বশুরবাড়ির ছবি দেখতে পেল টেরেসা। ওরও মা-বাবা আছে। ওর সঙ্গে নিশ্চিত সুখে জীবন কাটিয়ে দেব।

পরের রবিবার ছেলেরা এল মেয়ে দেখতে। টেরেসা তার ভাবী স্বামীকে দেখল। ছেলেও দেখল তাকে। সে কৃতার্থ হয়ে গেল।

ঠিক হয়ে গেল বিয়ে। পাঁচ হাজার আনা বরপণ দিতে হবে। বিয়ের তারিখও ঠিক হয়ে গেল। গীর্জার পুরোহিতও ওই তারিখ শুভ বলে জানালেন। টেরেসার বাবা কথা দিল পরের রবিবার বরপণ পৌঁছে দেবে।

টেরেসার মনে খুশি আর ধরে না। বন্ধুরা এসে মস্করা করল। বিবাহিতা সমবয়সীরা উপদেশ দিল নানারকম। সে শুধু দিন গুণতে লাগল।

স্বামী-স্ত্রী আবার নতুন করে হিসেব শুরু করল। বরপণ আর বিয়ের অন্যান্য খরচ বাদ দিলে সামান্যই বাঁচবে। রোসার কথা পরে ভাবা যাবে।

পালাই যাবার দু'দিন আগে প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে ফিরে মারিয়া বলল, 'চাকো এসেছে।'

'চাকো এসেছে। কাল সকালে যাবে বাজারে। তারপর কোট্টায়াম। আজই টাকা এনে রেখেছে।'

'তা কী করে হয়। মেলা তো রবিবার।'

'সে-জন্যে জোগাড় রাখতে হবে না!' মাত্তন চাক্কোর খোঁজে রওনা হ'ল। তাকে দেখে হাসল চাক্কো।

'দেখে মনে হচ্ছে সব ব্যবস্থা সেরে ফেলেছ।'

'হ্যাঁ, ওখান থেকে ফিরেই সব ব্যবস্থা করে ফেলব ভাবছি।'

'বরপণ কত?'

'পাঁচ হাজার আনা।'

'তাহ'লে তো সব মিলিয়ে সাত হাজার খরচ হবে!'

মাত্তন হাসতে লাগল।...

চাক্কো ছেলে সম্পর্কে খোঁজ-খবর করল। সবকিছু সবিস্তারে বর্ণনা করল মাত্তন।

'এত পয়সা পাবে কোথায়? পুঁতে রেখেছ নাকি?'

মাত্তন হতচকিত। এমন আঘাত সে জীবনে পায় নি। কী বলবে তা পর্যন্ত ভেবে পেল না। মুখ দিয়ে শব্দ বেরুল না কোন। শুধু বলল, 'আপনার কাছে যে জমা রেখেছি...'

'জমা রেখেছি?' পাল্টা প্রশ্ন করল চাক্কো। বিদ্যুতের শব্দের মতো সেই গলার স্বর মাত্তনের কানে এসে বাজল!

চাক্কো আবার বলল, 'সব হিসেবই আছে আমার কাছে। তুমি যা নিয়েছ তার সঙ্গে আরো দু'টাকা— এই তো সতেরো টাকা দিতে হবে আমাকে।...'

'আমি নিয়ে নিয়েছি?'

'হ্যাঁ।'

'আমি...এত খেটেখুটে...।'

'তুমি কাজ করেছ! ঈশ্বর জানেন তোমাকে দিয়ে কেউ কাজ করাবে না! একটা অকর্মণ্যের ঢেঁকি কোথাকার!'

'আমি পাতা কেটেছি ··· । গরু দেখাশোনা করেছি।'

চাক্কো হেসে ফেলল।

'তার জন্যে মজুরী!'

হতাশ হয়ে বসে পড়ল মাত্তন।

চাক্কো বলল, 'মেয়ের ভাগ্যে থাকলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি পনেরো টাকা দেব। ভগবান সবই জানেন।'

ঘাটে দু'তিনজন বড়লোক আর পুরোহিত এসেছেন। চাক্কো তাদের আপ্যায়ন করতে চলে গেল।

রাত অনেক হয়ে গেল। মাত্তনের ঘরে বাতি নিবে গেল। সে তখনো ফেরে নি।

প্রদীপ নিবে যাবার পরও মা আর মেয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

পরের দিন মারিয়া তরপ্পুরায় গেল। দক্ষিণের বারান্দায় বসা কিছু লোক ওকে দেখল।

পরের দিনও মাত্তন ফিরল না। অরপ্পুরমে তখন জন্মদিনের আবহাওয়া।

তার পরের দিন রবিবার— চাকোর মেলা সেদিন। মাত্তনের ঘাটে একটা লাশ ভেসে এলো। হাত-পা দড়িতে বাঁধা। নিশ্চিত মাত্তনের। মেলার চারিদিক জুড়ে খুশির আওয়াজ। সবাই মেতেছে চাক্কোর মহানুভবতা আর ঈশ্বরভক্তির স্তুতিগানে। শুধু মাত্তনের লাশ জড়িয়ে ধরে মা আর মেয়ে অফুরন্ত কান্নায় ভেঙে পড়ছিল।

সেকেণ্ড হ্যাণ্ড

বৈকম মুহম্মদ বশীর

রাগে মাথার চুল এলোমেলো ক'রে তাণ্ডব নৃত্য জুড়ে দিল শারদা। সম্পাদক গোপীনাথ তবু শান্ত গলায় বলল, 'শারদা, কাল খবর কাগজ বেরুনোর দিন, তুমি কি তা জানো না? আজ রাত্রে অনেক কাজ করতে হবে আমাকে; খাবার তৈরি থাকলে তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও।'

'খাবার!' চড়া গলায় বলল, 'আমি কিছুই রাঁধিনি। ইচ্ছে করে নি। তোমার ইচ্ছে হলে তুমি নিজেই কিছু বানিয়ে খেয়ে নাও। আমার বড্ড ক্লান্ত লাগছে।'

শারদা কোনদিনই গোপীনাথকে ভালোবাসতে পারে নি। বিয়ের আগেই ও বলে দিয়েছিল, 'প্রেম-টেম আমি বুঝি না। আমার পক্ষে কাউকে ভালোবাসা সম্ভব নয়।' এসব নিয়ে আজ পর্যন্ত শারদাকে কিছু বলে নি গোপীনাথ। এমন-কি প্রেমের কথা বলে কোনদিন ওকে চুম্বনও করে নি।

গোপীনাথ বলল, 'এসব আজেবাজে কথা আমি অনেকদিন থেকেই শুনছি। ব্যাপার কী, তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি কি কিছু করেছি?'

'কেন তুমি বিয়ে করেছিলে আমাকে?' নিজের উন্নত বক্ষযুগল স্পষ্ট করে অহংকারের গলায় জিজ্ঞেস করল শারদা।

গোপীনাথের খারাপ লাগল। বলল; 'কেন তুমি বিয়ে করেছিলে?' এসব কথা জিজ্ঞেস করে লাভ আছে কিছু?'

শারদার চোখ জানলার বাইরে, গলিতে। জোর হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির ফোঁটা ঘরের মধ্যে ঢুকতে লাগল।

'ঘরে জল ঢুকছে দেখতে পাচ্ছ না বুঝি!' শারদা বলল, 'জলে ভিজলে তোমার কিছু হবে না, কিন্তু ঘরদোর নোংরা হচ্ছে না!'

জানলা বন্ধ করে শারদার কাছে চলে এলো গোপীনাথ। শারদার চোখের জলে ঝল্‌কানো বিদ্যুতের আভাস। বুক চাপড়ে বলল সে, 'মরে গেলেই ভালো হ'ত!'

গোপীনাথ শারদার হাত ধরল।

'ছোঁবে না আমাকে!' চেঁচিয়ে বলল শারদা, 'আমি অশুদ্ধ, অপবিত্র—'

গোপীনাথ ওর মুখ বন্ধ করবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল।

'আমি মরে যাব!' বলতে বলতে হাত ছাড়িয়ে দূরে সরে গেল শারদা, মাথা ঠুকতে শুরু করল দেয়ালে। তারপর ফাল ফাল করে ছিড়ে ফেলল শাড়িটা।

'এমন জঘন্য জীবন কেন হ'ল আমার!' পাগলের মতো হাতের বালাটা ছুঁড়ে ফেলল শারদা, পাশের ঘরে ছুটে গিয়ে পালঙ্কে আছড়ে পড়ে চীৎকার করতে লাগল।

চিন্তিত গোপীনাথ বসে পড়ল চেয়ারে। সে শুধু একটি কথাই বার বার ভাবতে লাগল, সে তো শারদাকে কোনদিনই কিছু বলে নি, তা হ'লে ও এত বিরক্ত কেন? মেয়েদের চরিত্র সত্যিই ভারি অদ্ভুত! এই চিন্তায় তলিয়ে গিয়ে সে চুপচাপ বসে রইল।

নানা ঘটনায় জীবনের প্রতি যখন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল গোপীনাথ, সেইসময় ওর দেখা হয়েছিল শারদার সঙ্গে। ওর অবস্থা তখন মরুভূমিতে দিশেহারা পথিকের মতো। শরীরে হাড়-

পাঁজড়া ছাড়া আর কিছুই নেই। নারী-হৃদয়ের স্বচ্ছ জলই তখন তার একমাত্র কাম্য। যেন নারীর সান্নিধ্যই তাকে শান্ত করতে পারে। মনে হ'ত, কারুর উন্নত বক্ষে লগ্ন হয়ে হাল্‌কা গলায় আলাপ করে। কিন্তু কার সঙ্গে?

ঠিক এমনসময় অদ্ভুতভাবে তার জীবনে আবির্ভূত হ'ল শারদা। সেও এক ঝড়-বাদলের রাত। কাগজের অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় গোপীনাথ দেখল কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজায়। আরো কাছে পৌঁছে দেখল সে এক যুবতী। তখন ও জানত না— এই-ই শারদা। গোড়ায় সে গোপীনাথের প্রশ্নের উত্তরে একটি কথাও বলে নি। বর্ষায় ঠাণ্ডা আর ভিজে হাওয়ায় দাঁড়িয়ে কাঁপছিল, গোপীনাথ ওকে ঘরের ভিতরে আসতে বলল।

কিন্তু সে গোপীনাথের কথায় সাড়া দিল না। যেমন ছিল, দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ।

'এইভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়।' গোপীনাথ বলল, 'ভিতরে এসে বসো।'

আস্তে দরজার দিকে এগোল সে। হাতে একটি স্যুটকেস। চোখে রক্তিমা, গালে তখনো চোখের জলের দাগ লেগে আছে। চওড়া পাড়ের শাদা শাড়ি আর কালো ব্লাউজে সে গোপীনাথের দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিল যেন গরু তাকিয়ে আছে বাঘের দিকে।

আশ্বাস দিয়ে গোপীনাথ বল্‌ল, 'ভয় পাবার কিছু নেই, ভেতরে এসে বসো।'

সে ভিতরে আসার পর দরজাটা বন্ধ করে দিল গোপীনাথ।

'তুমি যাবে কোথায়?'

'পাশের ঘরে গিয়ে ভিজে কাপড় বদলে নাও। এখানে আমি একাই থাকি। আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি তোমার বাবা, ভাই···', বলতে বলতে থেমে গেল গোপীনাথ।

সে বলল, বদলাবার মতো কাপড়ও তার কাছে নেই।

বীণার ঝংকারের চেয়েও মধুর সেই স্বর শুনে চমকে উঠল গোপীনাথ। নিজের বাক্স থেকে ধোয়া কাপড় বের করে পরতে দিল ওকে।

অন্য ঘরে গিয়ে কাপড় বদলে এলো ও।

গোপীনাথ জিজ্ঞেস করল, 'কিছু খেয়েছ?'

'আমার কিছুই দরকার নেই।' আস্তে গলায় বলল সে।

গোপীনাথ বলল, 'তুমি আমার অতিথি— এক কাপ চা অন্তত খেতেই হবে।' বলে হাসতে লাগল।

সে বসে থাকল শব্দহীন, চুপচাপ।

তখন গোপীনাথ নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমার নাম গোপীনাথ। একটা সাধারণ খবর-কাগজের সম্পাদক। তোমার নাম কী?'

'শারদা।' মাথা নিচু করেই মিষ্টি গলায় বলল সে।

চা তৈরি করতে ভিতরে গেল গোপীনাথ। জানলায় শুকোচ্ছে শাড়ি, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার আর সায়া··এই প্রথম ওর ঘরে নারী-শরীরের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। আনন্দে মন ভরে গেল গোপীনাথের। নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। লুকিয়ে সে চুম্বন করল শাড়িটি, তারপর ব্রেসিয়ারটি। স্টোভ জ্বালিয়ে চা তৈরি করল। দুটো কাপে চা নিয়ে এসে দেখল টেবিলে মাথা ঠেকিয়ে বসে আছে সে।

'শারদা, নাও চা খেয়ে নাও।'

শারদার চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। আস্তে আস্তে চায়ে চুমুক দিতে লাগল সে।

গোপীনাথ বলল, 'কী, ঘুম পাচ্ছে?'

শারদা বলল, 'আমি চেয়ারেই শুচ্ছি।'

'না, না, পাশের ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ো। আমিই চেয়ারে শোব।'

শারদা আপত্তি করল না। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল।

গোপীনাথের ঘুম এলো না। অনেক কথা ভাবতে লাগল সে। এ কে? এই অসহায় অবস্থায় কোথা থেকে এলো? চোখের জলেরই বা কারণ কী? একটার পর একটা সিগারেট খেল সে। ঘুম এলো অনেক পরে।

ভোরে বাইরের ঘরে পায়ের আওয়াজ শুনে দরজা খুলল শারদা।

গোপীনাথ 'সুপ্রভাত' জানাল।

উত্তরে সেও 'সুপ্রভাত' বলল।

'ঘুম হয়েছিল তো?'

'হ্যাঁ।'

'স্নান করবে?'

সাবান, তেল, মাজন, তোয়ালে ইত্যাদি দিয়ে বাথরুমটা দেখিয়ে দিল গোপীনাথ। তারপর ফ্লাস্কে কফি আর জলখাবার কিনে আনল।

স্নান করে বেরুল শারদা। গোপীনাথও স্নান সেরে নিল। দু'জনে একসঙ্গে কফি খেল। এতক্ষণে পরিষ্কার চোখে শারদার

মুখ দেখল গোপীনাথ। সে-মুখে বিষাদের ছায়া। অফিস যাবার জন্য তৈরি হ'ল সে। সাদা প্যাণ্ট, সাদা কোট, সার্ট আর বাদামী রঙের জুতো পরে নিল। তারপর শারদাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথায় যাবে?'

শারদা কিছু বলল না। ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

'কাঁদছ কেন?'

'এমনি।' চোখ নিচু করল শারদা।

'কাল রাতে কোথা থেকে এলে?'

'হাসপাতাল থেকে।'

'তুমি কি নার্স?'

'না।'

'ডাক্তার?'

'না।'

'ডাক্তারি পড়ছ?'

'না।'

'কাজ-টাজ করো?'

'না।'

'বাড়ি কোথায়?'

শারদা গ্রামের নাম বলল '...'

সত্তর মাইল দূরে সে গ্রাম।

'সেখানে কী করতে?'

'পড়তাম।'

'কোন ক্লাসে?'

'বি. এ.।'

'মা-বাবা আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'বাবা কী করেন?'

'হাইস্কুলের হেডমাস্টার।'

'বাড়িতে ঝগড়া করে চলে এসেছ?'

শারদা চুপ করে থাকল।

'বাড়ি যেতে চাও?'

'না।'

'তবে কোথায় যাবে?'

'আমি কিছুই জানি না। যাবার জায়গা কোথাও নেই।'

গোপীনাথ স্তম্ভিত। একবার ভাবল পাগল নয় তো। কিন্তু দেখে তো মনে হয় না। বেশ কিছুক্ষণ ভাবল সে। তারপর সে ভবিষ্যৎ স্থির করে নিল। বিশাল জমায়েতের সামনে সবার আগে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তার অবস্থা যে-রকম চঞ্চল আর ভীরু হয়ে ওঠে, গোপীনাথের অবস্থাও সে-রকম হ'ল।

'আমি কিছু বলতে চাই।' গোপীনাথ বলল, 'আমি তোমার কাছে আর তুমি আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। মাত্র গতকাল রাতে দেখা হয়েছে আমাদের। তোমার মা-বাবা আছেন, বাড়ি আছে। কিন্তু তুমি বলছ তোমার যাবার জায়গা নেই। কেন, তা আমি জানি না। তোমার বিষয়ে এর বেশি কিছু জানবার প্রয়োজনও দেখি না। আমার ইচ্ছে, এখন থেকে আমরা একসঙ্গে থাকি।'

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ থাকল। পরে শারদা বলল, 'আমি কীভাবে থাকব?'

গোপীনাথ খুশি হ'ল।

'আমার স্ত্রী-হিসেবে। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আজই তোমাকে বিয়ে করতে পারি।'

'বিয়ে?' সে স্তম্ভিত হ'ল। 'বিয়ে!'

'হ্যাঁ। তোমাকে আমি ভালোবাসি।'

অপলকে গোপীনাথের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল শারদা।

'আপনি মহৎ!' দুঃখিত গলায় সে বলল, 'আপনার জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়াব, আমি যে অত্যন্ত নোংরা!'

'থাক্, আমিও কিছু মহাত্মা নই!'

'আমি আপনাকে ঠকাতে চাই না।'

'এতে ঠকানোর কী আছে!'

'আপনি আমাকে জানেন না!'

'নারী আর পুরুষ কখনোই পরস্পরকে ভালো করে জানতে পারে না। ভিতরে উঁকি দিয়ে বুঝবার ব্যাপার এটা নয়। আত্মার বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারব না। আমার ধারণা চোখই মানুষের আত্মা। তোমার চোখে আমি আত্মার সৌন্দর্য দেখতে পাচ্ছি। ওই আত্মাকে আমি নিজের চেয়েও ভালোবাসি।' ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছিল গোপীনাথ।

শারদা তবু নিরস্ত হ'ল না। বলল, 'আমি খুব খারাপ মেয়ে।'

হা হা করে হেসে উঠল গোপীনাথ। 'শারদা! নিজেকে খারাপ বলছ কেন! তোমার শরীর কি আর পবিত্র নেই?'

'এই পৃথিবীতে আমার আর কোন আশ্রয় নেই, অবলম্বন নেই। আপনি কি কথা দিচ্ছেন আমি সবকিছু পাব। অল্পক্ষণের পরিচয়েই আপনি বলছেন 'তোমাকে ভালোবাসি', আর আমাকে বিয়ে করতেও প্রস্তুত!'

'ছিঃ, এভাবে বলছ কেন ! আমি সত্যিই সবকিছু দিতে প্রস্তুত।'

'তবু…'

'তবু…এই তবুটা কী ?'

'আমার অতীত জীবন…'

'ও। ও-নিয়ে ভাববার কিছু নেই। আমারও একটা অতীত আছে। সে-অতীতও খুব সুন্দর নয়। পুরনো কথা ভুলে বর্তমানের বিশ্বাস আর ভালোবাসা দিয়েই আমরা সুখী হতে পারি।'

'আপনি কিছুই জানেন না'— দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল শারদা। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'হাসপাতালে আমি একটি সন্তানের জন্ম দিয়েছি।'

খানিক দু'জনেই কোন কথা বলতে পারল না।

বেশ পরে গোপীনাথ বলল, 'বাচ্চা কোথায় ?'

'মারা গেছে।'

'স্বামী ?'

'আমি অবিবাহিতা।'

'বাচ্চার বাবা কে ?'

'আমার এক সহপাঠী।'

'কে সে ?'

'অনার্স নিয়ে পড়ছে।'

'তারপর ?'

'সে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। স্পষ্ট বলে দিয়েছে আমাকে।'

'কীরকম ভবিষ্যৎ ?'

সে এক কবি। অনেক বই লিখেছে। গত সপ্তাহে পরীক্ষা শুরু হয়েছে ওর। পাস করার পর কলেজেই চাকরি পাবে।'

'ওই কবির নাম কী?'

শারদা তার নাম বলল।

'আদর্শবাদী?'

'হ্যাঁ', শারদা বলল, 'আমি ওর কবিতা পড়তাম। সেই সময়েই আমাদের হোস্টেলের সামনে ঘর ভাড়া নিয়ে সে থাকতে লাগল। গোড়ায় ওর একটা বইয়ের জন্যে আমি একটা চিরকুট পাঠিয়েছিলাম। এইভাবে পরিচয় হ'ল আমাদের। আমরা চিঠি লেখালেখি করতাম। আমার বন্ধুরা আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল, বলেছিল লোকটা ভালো নয়। তবু আমি বিশ্বাস করেছিলাম ওকে। আমরা পরস্পরকে কথাও দিয়েছিলাম। রাত্রে হোস্টেলের দেয়াল টপ্‌কে সে আসত আমার ঘরে। পাশের আমগাছের ছায়ার তলায়···

'ব্যাপারটা আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু বন্ধুরা এই নিয়ে রটনা শুরু করে দিল। বাড়ি এলাম। দেখলাম সেখানেও সবাই সবকিছু জানে। আমি বাড়ি ছাড়লাম। হাসপাতালই তখন আমার একমাত্র আশ্রয় হ'ল। আমি ওকে পর পর তিনটি চিঠি লিখলাম। শেষে ওর এক লাইনের চিঠি পেলাম। ও লিখল, 'আমাকে নিজের ভবিষ্যৎ দেখতে হবে।' আমার কাছে পয়সা-কড়ি কিছুই ছিল না। পরশু রাত্রে হাসপাতালে মরবার চেষ্টা করেছিলাম। জানলা দিয়ে নিচে লাফিয়ে মরব, এমন সময় পুলিশের বাঁশির শব্দ কানে এলো। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবলাম বিষ খেয়ে মরব। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলাম। বর্ষা তুচ্ছ করে সেই দুপুর থেকে হাঁটছি তো হাঁটছি। শেষে যখন আর পারলাম না তখন আপনার দরজায়···'

'ব্যস, এইটুকু!' গোপীনাথ বলল, 'সে-জন্যে ভাবতে হবে না। জীবন শুধু কাঁদবার জন্য নয়। তুমি একটা ভুলই করেছ, অবিবাহিতা কোন কোন মেয়ে এই ভুল করে বসে। এ-ব্যাপারে মেয়ে আর পুরুষ সবাই একইরকম। পুরনো কথা ভেবে লাভ হবে না কোন। আমি তোমার জন্যে কাপড় নিয়ে আসছি।'

'কেন?'

'আমার স্ত্রী হয়ে থাকলে বুঝি কাপড়-চোপড়ের দরকার হবে না? আমার কাপড়ে তো আর তোমার কাজ চলবে না।'

'না, এই বিয়ে ঠিক হবে না। আপনার বাবা-মা বলবেন কী? আপনার বন্ধুরাও এই সম্বন্ধ ভালো চোখে দেখবে না।'

'কিন্তু, বিয়েটা তো আমিই করব। মা-বাবার মধ্যে শুধু মা আছেন। তিনিও আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছেন। ভাই নেই। এক বোন আছে, তার বিয়ে হয়ে গেছে। এখন আমি একা। ধনসম্পত্তি কিছুই নেই। ইণ্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়েছি। আমার সবকিছু বলতে ওই কাগজ। অফিসের চাপরাসি, ম্যানেজার, সম্পাদক— আমিই সব। আমাকে বাধা দেবারও কেউ নেই।'

'কিন্তু আমার হৃদয়ে প্রেম নেই।' শারদা বলল, 'আমি কাউকে ভালোবাসতে পারব না।'

'শারদা! তুমি আমাকে বিশ্বাস তো করতে পারো।'

কাঁদতে কাঁদতেই শারদা তার মৌন সম্মতি জানাল।

রেজিস্ট্রারের কাছে গিয়ে তারা স্বামী-স্ত্রী হ'ল। একসঙ্গে বসে ছবি তুলল দু'জনে এবং সে ছবি খবর-কাগজে ছাপিয়ে দিল। সে-কাগজের একটা করে কপি শারদার বাবা আর সেই কবির কাছে পাঠিয়ে দিল।

শারদার মা-বাবা এলেন গোপীনাথ আর শারদাকে আশীর্বাদ করতে। সেইদিনই এক সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির পদ অলংকৃত করতে গিয়ে গোপীনাথ সেই কবিকেও দেখল। গোপীনাথও ভাষণ দিল সেই সভায়। ভাষণের পর এক ফাঁকে কবি তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল—

'সম্পাদকমশাই সম্প্রতি বিয়ে করেছেন না?'

'হ্যাঁ।'

'মহিলাটিকে কি আগে থেকেই চিনতেন?'

'না।'

'ওর কিছু প্রেমপত্র একজনের কাছে আছে।'

'সে-কথা শারদা আমাকে বলেছে।'

'বিয়ের আগেই যে বাচ্চা হয়েছিল সে-কথাও বলেছে!'

'সবকিছুই।'

'ও যে 'সেকেণ্ড হ্যাণ্ড' জিনিস সে-কথাও কি বলেছে?' বলে হাসল কবি।

গোপীনাথও হেসে বলল, 'শারদা সে-কথাও বলেছে। আর ওকে যে অনাথ করেছে সেই কবির নামও বলেছে।'

এ-কথায় কবির মুখ কালো হয়ে গেল। হাসতে হাসতেই বিদায় নিয়ে চলে গেল গোপীনাথ।

কবির সঙ্গে যে দেখা হয়েছিল সে-কথা শারদাকে বলে নি গোপীনাথ। শারদাকে সন্তুষ্ট রাখাই ছিল তার উদ্দেশ্য। আর শারদারও কোন কষ্ট নেই। এখন সে বেশ হাসিখুশি। ঘরের কাজকর্ম, রান্নাবান্না, মোড়কে ভরে খবর-কাগজ পাঠানোর জন্যে তৈরি করা— সমস্ত ব্যাপারেই সে খুব সচেতন। তবু, সবকিছু

সত্ত্বেও, তার মন থেকে 'আমার হৃদয়ে প্রেম নেই। আমি কাউকে ভালোবাসতে পারব না' ভাবটা গেল না।

বৃষ্টি আর ঝড়ের প্রচণ্ড গর্জনের মধ্যে শারদার কথাগুলোই শুধু কানে ভেসে আসে গোপীনাথের। আর এখন ও বলছে 'আমাকে বিয়ে করলে কেন?'

ছাতা হাতে বেরুবার জন্যে তৈরি হ'ল গোপীনাথ। শারদাকে বলার জন্যে ঘরে গিয়ে দেখল— ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে। গোপীনাথের ইচ্ছে হ'ল ওকে কাছে টেনে চুম্বন করে, কিন্তু শারদা ওকে ভালোবাসে না এ-কথা মনে পড়তেই আর এগলো না। বলল, 'আমি প্রেস থেকে ঘুরে আসছি?'

কাঁদতে কাঁদতেই শারদা বলল, 'ফিরে এসে আমাকে আর দেখতে পাবে না।'

'কোথায় যাবে?'

'যেখানে চোখ যায়—'

'এখানে কি তোমার অসুবিধে হচ্ছে?'

'অসুবিধে!'—বুক দুলে উঠল শারদার। 'কিচ্ছু না।'

বলে বুক চাপড়াতে লাগল শারদা। গোপীনাথ এগিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরে ফেলল।

'আমাকে ছুঁয়ো না— আমি অপবিত্র!'

'অপবিত্র! কী বলছ তুমি?'

'কিছু না। আমাকে মরে যেতে দাও।'

'মরতে চাইছ! শারদা, তোমার কী দুঃখ আমাকে বলো?'

'কিছুই নয়।' অবরুদ্ধ গলায় সে বলল, 'এই ঘৃণ্য জীবন আমার আর সহ্য হচ্ছে না।'

'কে তোমার জীবন ঘৃণ্য করেছে?'

'তুমি।'

'আমি!'— গোপীনাথ আর কিছুই বলতে পারল না।

'হ্যাঁ, তুমি।' কাঁদতে কাঁদতে সে বলল, 'তুমি কি পছন্দ করো আমাকে?'

'আমি?. তুমিই তো আমাকে ঘৃণা করো।'

'আমি—', অসহ্য বেদনায় গোপীনাথের বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল শারদা। 'আমি···তোমাকে · নিজের··· জীবনের চেয়েও···বেশি ··।'

দোকানের চাবি

পোন্কুন্নম বর্কী

বর্গীস আর কোশী দু'জনে মিলে দোকান দিল একটা। বেশ কিছুদিন আগে থেকেই তারা এ-বিষয়ে পরিকল্পনা করেছিল। বাড়ি আর জমি থেকে যেটুকু পেত তাতে ক্রমশ বাড়তি খরচের বহর সামলানো যেত না। 'টাকা ফেললেই টাকা আসে', পরামর্শটা দিল বর্গীস। বাড়ি আর জমি বন্ধক রেখে সুদের কড়ারে সাতশো পঞ্চাশ টাকা জোগাড় করল কোশী। বর্গীসও সম-পরিমাণ টাকা ঢালল। চাল, ধান, ধনে, লঙ্কার দোকান। ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল, কিছু রেশন কার্ডও তারা পেয়ে গেল। রেশনের ব্যাপারটা মোটামুটি ভালোই চালু হয়ে গেল।

দোকানে বসার যোগ্যতা কোশীর ছিল না, কারণ, কেউ দোকানে এসে একটু কাঁদুনি গাইলেই সহজে তাকে বিশ্বাস করে ফেলত সে। মানুষজনকে সহজেই বিশ্বাস করত সে। বর্গীস সে-রকম নয়। কোশীর মতো চট করে সে কাউকে বিশ্বাস করে না। কখনো কারুর খপ্পরে পড়ে না। দোকানের জিনিসপত্র একে তাকে বিলিয়ে দিয়ে শূন্য হাতে বাড়ি ফিরতে চায় না সে। কাউকেও এক পয়সার ধার দেয় না। 'ধারে জিনিস নেওয়া খারাপ', 'দয়া করে ধার চাইবেন না', এইসব নিয়ম-কানুন লিখে টাঙিয়ে রেখেছিল দোকানে। 'ধার না দিলে কিছুদিন হয়তো মন কষাকষি হবে, পরে ঠিক হয়ে যাবে সব। কিন্তু একবার

দিলে সারা জীবনের মতো মন কষাকষি হবে।' বর্গীসের ব্যাবসার নীতিটা ছিল এইরকম।

দোকানে বর্গীসই বসত। রেশনের মালপত্তর আনার সমস্ত ব্যবস্থা করত কোশী। যাতায়াতের খরচ-খরচার হিসেব বুঝিয়ে সে বর্গীসকে দিয়ে দিত সব। 'আরে! এসব আবার কেন? এত সবিস্তারে লেখার দরকার কী? কত খরচ হয়েছে বললেই হয়!' বর্গীস এত কথা বললেও কোশীর এসব করার একটিই উদ্দেশ্য ছিল, বন্ধুর মনে যেন কোন সন্দেহ না হয়।

দোকানে দু'জনেরই অংশ ছিল সমান সমান, তবু লোকে 'বর্গীসের দোকান', 'বর্গীসের দোকান' করত। কোশী এসব নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামায় নি। কিন্তু কোশীর স্ত্রীর পছন্দ হ'ত না ব্যাপারটা। কখনো কখনো বলতও কোশীকে।

'তুমি এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না, লোকে নিশ্চয়ই নিজেদের সুবিধের জন্যেই এরকম বলে।' কোশী বোঝাত স্ত্রীকে।

'কিন্তু কোশী নামটাই তো সহজে মুখে আসে।'—স্ত্রী বলল কোশীকে।

বন্ধু সম্পর্কে স্ত্রীর বক্তব্যে ভুল না থাকলেও শান্ত স্বভাবের কোশী সে-কথায় কান দিত না। স্ত্রীর এই ধরনের সন্দেহের চেয়ে বন্ধুত্ব অনেক বড়। বর্গীসের বিষয়ে কোশীর বিশ্বাস এমনই গভীর ছিল। ভাবত, দোকানের জন্যে সে তো আমার চেয়ে বেশি কষ্ট করে। হিসেবপত্র ঠিক রাখার জন্যে বর্গীসকে উপদেশ দেবারও দরকার হয় না। আমি তো তবু বিড়ি-টিড়ি খাই, কোশী ভাবত, বর্গীসের সে প্রয়োজনটুকুও নেই।

তা ছাড়া কারুর সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতাও নেই তেমন। ব্যাবসা,

গাম্ভীর্য, হিসেবপত্তরের সঙ্গে মানানসই স্বভাব বর্গীসের। লেনদেন করা, লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলার ব্যাপারে কোশীর চেয়ে সে অনেক বেশি সাবধান।

একদিন বর্গীসের সঙ্গে কোশীও দোকানে বসে ছিল। সেবার রেশনের জিনিসপত্রে কুঁড়ো খুব বেশি। কোশী বলল, 'লোককে কী করে এই জিনিস দেওয়া যায়। এগুলো বরং গরুকে খাইয়ে দিলেই ঠিক হয়।'

'মানুষ খাবার পরই জানোয়ারের খাবারের প্রশ্ন ওঠে।' বর্গীস বলল, 'লোকে খেতে না পারলে সরকার এ জিনিস দেবেনই বা কেন? আর, রেশনিং অফিসার যখন হিসেব চাইবে তখন কী বলব আমরা?' যারা শুনছিল তারা সবাই বর্গীসের কথায় সায় দিল। কোশী চুপ করে যেতে বাধ্য হ'ল।

একজন 125 গ্রাম পেঁয়াজ চাইল। বর্গীসের হাত খালি ছিল না। সে তখন ভালো চালের সঙ্গে খারাপ চাল মেশাতে ব্যস্ত। এটা না করলে শুধু খারাপ জিনিসটাই বা কাকে দেওয়া যাবে! সকলেরই নজর ভালো জিনিসটির দিকে। পেঁয়াজ মাপতে কোশী দাঁড়িপাল্লার কাছে গেল। বর্গীস দাঁড়িপাল্লাটা দেখল। পাল্লার দড়িতে একটা পেঁয়াজ আটকে দিলে ভারসাম্য ঠিক হয়। সেটা না করেই ওজন করতে লাগল কোশী। এর ফলে চার-পাঁচটা পেঁয়াজ বেশি চলে যায়। বর্গীস সেটাই দেখছিল। 'না, না, ওখানে একটা পেঁয়াজ ঠুসে দাও।' বর্গীস বলল কোশীকে। ঘামতে ঘামতে উঠে দাঁড়াল সে। জামা খোলবার সময় পকেট থেকে চাবিটা ঝন্ করে মাটিতে পড়ে গেল।

2

সেবার রেশনের জিনিসপত্র কিনতে বর্গীসই গেল। রেশন ছাড়াও তার অন্য ব্যাপারও ছিল। সরল স্বভাবের কোশী সেখানে কিছুই করতে পারত না। বর্গীস যখন রেশন আনতে গেছে তখন কোশী এলো। দেখল দোকান বন্ধ। চাবিটা যে বর্গীসের কাছেই আছে।

কোশী ভাবল, তার যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য বর্গীস নিজেই রেশন আনতে গেছে, দোকান বন্ধ থাকার কারণও সম্ভবত এই। ব্যাপারটা এইটুকুই। সেবার রেশনে ন'বস্তা চাল ছিল। তার মধ্যে থেকে ছয় বস্তা বর্গীস ওখানেই বদল করে নিল। হাতে হাতে 240 টাকা পেয়ে গেল। খাটতে হ'ল না, ঘাম ছুটোতে হ'ল না, হাতে ময়লা পর্যন্ত লাগল না। লোকজনকে রেশন দেবার সময় বর্গীস বুঝিয়ে বলল, 'কংগ্রেসের শাসনে দেশটা গোল্লায় গেছে।'

রেশনের দোকান ভালোই চলছিল। কোশীর ইচ্ছে ছিল দোকানের উপার্জন থেকে, সামান্য কিছু বাঁচিয়ে রাখে। হাজার খানেক টাকার একটা জীবন বীমা করানোর ইচ্ছেটা বর্গীসকে জানাল সে। বর্গীস ওকে উপদেশ দিয়ে বলল, 'অন্তত দু'এক বছর দোকানটা চলতে দাও। যা আসছে তাই ভাগ-বাটোয়ারা করে নিলে দোকানই উঠে যাবে। টাকা ফেললে তবেই টাকা আসে।'

কোশী বর্গীসের কথার মর্ম বুঝতে পারল। বর্গীস ঠিকই বলেছে, দোকান চালাতে হলে এইভাবেই চালাতে হয়। তেমন তেমন দরকার পড়লে না-হয় দু'দশ টাকা নেওয়া যাবে। বর্গীসের সঙ্গে একটা রফা করে নিল ও, দু'বছরের আগে দোকানের লাভের টাকায় হাত দেবে না।

কোশীর স্ত্রী বাড়ির চাকরকে দোকানে পাঠিয়েছিল চাল আর তেল আনতে। সে ফিরে এলো অনেক দেরি করে। মরীয়কুট্টি রেগে-মেগে এত দেরি হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করল।

'এইমাত্র দিল!' চাকর জবাব দিল।

'ও যদি এত বড়লোক হয়ে গিয়ে থাকে তো তুমি চলে এলে না কেন?' রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল মরীয়কুট্টি।

পরের দিনও চাকরটি দোকান থেকে দেরি করে ফিরল। যারা নগদ পয়সা দিয়ে কেনে তাদেরই জিনিস দেয় বর্গীস। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাকর বিরক্ত হয়ে পড়ল। এত দেরি হ'ল, কাকী বলবে কী! কাকীর রাগ সে ভালো করেই জানে। সুতরাং ফিরে এল। মরীয়কুট্টি সেদিন প্রলয়কাণ্ড বাধাল।

কোশী স্ত্রীকে বুঝিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই অন্য কোন কারণ আছে। তুমি চাকরের কথায় বিশ্বাস করছ কেন! দোকান আমার, দোকানের জিনিসপত্তরও আমার। তবে দোকানে ভিড় থাকলে অপেক্ষা করাই ঠিক কাজ।'

'এভাবে কাজ চলবে না। এক-দু' দিনের ব্যাপার তো নয়! ও কী ভাবছে কী, মাঙনায় জিনিস নেওয়া হচ্ছে?' বলল মরীয়কুট্টি।

কথাটা বর্গীসকে বলল কোশী। শুনে বর্গীস বলল, 'ওকে তো আগে আমি দেখতেই পাই নি। রেশনের জন্যে চারদিকে খদ্দেরের ভিড়। যখন দেখলাম তখন ও বাড়ি চলে গেল। তাড়া থাকলে দরকারী জিনিসগুলো নিয়ে নিলেই পারত! আমি কি কেড়ে নিতাম!' চাল আর অন্যান্য জিনিস অন্য লোকের মারফত কোশীর বাড়িতে পাঠিয়ে দিল বর্গীস। একদিকে বর্গীসকে এত খাটতে হচ্ছে, অন্যদিকে কোশীকে শুনতে হচ্ছে স্ত্রী আর বর্গীসের নানারকম কথা।

'হয় তোমার না হয় তোমার নিজের কোন লোকের দোকানে বসা উচিত।'— কোশীর স্ত্রী প্রায়ই তাড়া দিত। সময় পেলেই দোকানে গিয়ে বসত কোশী। রেশনের মাল এখন বর্গীসই নিয়ে আসে। রেশন আনতে যাবার সময় দোকান বন্ধ করে চাবিটা সঙ্গে নিয়ে যায় সে। কোশী এ-ব্যাপারে অসহায়। কিন্তু ব্যাপারটা কোশীর স্ত্রীর সহ্য হ'ত না। তবে কোশীকে বলা-কওয়া ছাড়া সে আর কী করতে পারে?

বউয়ের গোঁয়ের দরুন এক নাগাড়ে কিছুদিন দোকানে এসে বসে থাকল কোশী। বর্গীস একাই কাজ করে, এটা তার ভালো লাগত না। বর্গীস চলত নিজের নিয়ম অনুযায়ী। কোশী কিছু করতে গেলেই চলে যেত সেই নিয়মের বাইরে। কারণ এইসব নিয়মের সঙ্গে তার তেমন পরিচয় নেই। এক খদ্দের চিনি নিতে এলো কোশীর কাছে। হিসেবমতো তার দু'পাউণ্ড চিনি পাবার কথা। কার্ড দেখে চিনি তোলার জন্য ঠোঙা ওঠালো কোশী। লোকটা যে তার বন্ধুকে ঠকাচ্ছে এটা বুঝতে পেরে লোকটার ওপর রেগে গেল বর্গীস।

'আরে! চিনি ছাড়া বুঝি তোমার গলা দিয়ে ভাত নামে না!' বলল বর্গীস, 'যাও, যাও। আমি জানি এখন তোমার চিনির দরকার নেই কোন। তেঁতো ওষুধ গিলতে হলে আমার কাছে এসো।' লোকটাকে সোজা ভাগিয়ে দিল বর্গীস। কোশী কিন্তু দু'পাউণ্ড চিনি তাকে দিয়েই দিত।

খুব ভালো লোক চিনতে পারত বর্গীস আর লোক বুঝে কথা বলার ক্ষমতাও তার ছিল আলাদা রকমের। অন্য অনেক গুণ থাকলেও, বর্গীসের এসব গুণের ছিঁটেফোঁটাও ওর মধ্যে নেই।

একদিন গ্রাম-প্রধানের চাকর চিনি নিতে এলো। চিনি দিয়ে পয়সা চাইল কোশী। বর্গীস বলল, 'না, না, আরে ও বড়বাবুর লোক। ওখানে পয়সা নিলে ঝামেলায় পড়তে হবে।'

সত্যি বলতে কি, দোকান চালানোর ব্যাপারে কোশী একেবারেই সাবধান নয়। হিসেব লেখাটাও ও ঠিক পারে না। এইজন্যেই ভাবত সে, দোকানে তার শুধু শুধু বসে কী হবে। বন্ধুর গতিবিধি লক্ষ্য করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, সেটা খুব খারাপ। দোকান বা ব্যাবসা তো আমার কথায় চলবে না! এসব কোশী ভালো করেই বুঝত।

জিনিসপত্র কাটার জন্যে দোকানে একটা দুমুখো ছুরি ছিল। সেটায় দু'তিন জায়গায় ধার ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। ছুরিটার পিছন দিকে দড়ি বেঁধে মেজের খুঁটির সঙ্গে আটকে রাখা হয়েছিল। 'এখানে যারা আসে তাদের সবাইকে কি আমরা বিশ্বাস করি না।' ছুরিটা নিজের হাতে নিয়ে কোশী একদিন বলল।

'ভালোই তো। এটা তো আর গীর্জা নয় যে সকলকেই বিশ্বাস করতে হবে। বড় বড় রেস্টরেণ্টে দেশলাইয়ের কাঠিটা পর্যন্ত ভেতরে রাখা থাকে, কারুর দরকার পড়লেই বের করা হয়, কেন? ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্কেও তো কলম, পেনসিল বেঁধে রাখা হয়, কেন? এই দোকানেই বা তালা চাবি দেওয়া হয় কেন?' জিজ্ঞেস করল বর্গীস।

গোড়ায় সকলকেই বিশ্বাস করা ভালো। কিন্তু অবিশ্বাসী বর্গীস চাবিটা ভুলত না কখনো। সব সময় সঙ্গে সঙ্গে রাখত।

3

গীর্জাঘরে মেলা বসেছে সেদিন। বর্গীস আর কোশীর বাড়ির সবাই উপস্থিত। বাইরেলের বিশেষ বিশেষ অংশের ওপর সুন্দর

ভাষণ দিলেন পাদরী। কোশীর স্ত্রীর নজর ছিল বর্গীসের স্ত্রীর গলার মালা আর আংটির ওপর। তার স্বামীর দোকানে না যাওয়ার ফল সে টের পাচ্ছিল বগাসের স্ত্রীর গয়নাগুলির দিকে তাকিয়ে। বর্গীসের ছেলেমেয়েরাও দামী কাপড় পরেছিল। মরীয়কুট্টির সহ্য হ'ল না ব্যাপারটা। ঘৃণা আর রাগে জ্বলে উঠল সে। গীর্জার কাজ শেষ হবার আগেই সে চলে গেল।

কিছুদিন পরে এক বিয়েবাড়িতে আবার দুই বন্ধুর স্ত্রীর দেখা হ'ল। মেয়েরা নিজের নিজের স্বামীর জন্যে সবকিছু সহ্য করতে পারে, কিন্তু আর কারুর স্ত্রীর রূপের বড়াই সহ্য করতে পারে না। ঘরে কোন কিছুর অভাব না থাকলেও বর্গীসের স্ত্রী মরীয়কুট্টির মতো সুন্দরী আর সুযৌবনা ছিল না। নকল-সৌন্দর্যের ওপরেই তাই সে নির্ভর করত বেশি। সারাক্ষণই খুব সেজেগুজে থাকত। সেদিন ওর পায়ে ছিল সাপের চামড়ার চটি।

মোটা বেঁটে কুরূপার সাজ ও চপ্পলের চাল আর জামার লুকনো ময়লা দু'টোই সমান ক্রোধের উদ্রেক করে। মেয়েদের সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় কিন্তু সৌন্দর্য সম্পর্কে তাদের ভুল ধারণা সত্যিই অসহ্য। বর্গীসের স্ত্রীর লোক-দেখানো সাজ দেখে মরীয়কুট্টির মতো মেয়ের যদি হাসি পায় তাতে দোষ দেবার কিছু নেই। বর্গীসের স্ত্রীর শাড়ি গয়না আর ঘড়ি দেখে মরীয়কুট্টির চোখ কালো ভ্রমরের মতো বড়ো হয়ে উঠল। ওর শাড়ি এবং গয়নার দাম কেউ জিজ্ঞেস না করলেও সে নিজেই বলে। নিজের শাড়ি-গয়না নিয়ে কারুর সঙ্গে আলাপ না করতে পারলে বর্গীসের স্ত্রীর মন ভরে না। আর কোনদিন যদি সেটা না হয় তার ঘুমই হবে না।

তা গল্পগুজব করার জন্যে বর্গীসের স্ত্রীর দলও জুটে গেল। তিন-চারজন মিলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গয়না, কাপড়েব আলোচনা করছিল। ওদেরই কাছাকাছি দাঁড়িয়ে মরীয়কুট্টিও আর-একজনের সঙ্গে আলাপ করছিল। উপহাসছলে ও বর্গীসের স্ত্রীর উদ্দেশে কাটা-কাটা কথা বলছিল। এত চেনাশুনো থাকা সত্ত্বেও ছ'জনে যে ছ'জনকে চেনে ওদের ব্যবহার থেকে তা মনে হচ্ছিল না। বর্গীসের স্ত্রী যখন নিজের দলের কাছে গয়না আর চপ্পলের দাম বলছিল তখন মরীয়কুট্টি তার সঙ্গের মেয়েটিকে বলল, 'বাবুর জমিদারি হলে বিবিরও পয়সা হবে, এ আর এমন কী। একটা মুখপুড়ী বাঁদরী পেলে তাকেও আমি এমনি কাপড়ে সাজিয়ে দিতে পারতাম।'

এই ধরনের ঠাট্টা কিছুক্ষণ ধরে শুনল বর্গীসের স্ত্রী। তারপর অসহ্য হয়ে উঠলে বলল, 'আরে, বাঁদরী খুঁজতে বাইরে যেতে হবে কেন? তোর ঘরেই তো আছে? চোখ-টাটানি যে যায় না দেখি? আমার ভাতার-এর দেওয়া জিনিস। পুরুষমানুষ হলেই স্ত্রীকে ভালো ভালো জিনিস বানিয়ে দেয়। তুই যা না···।'

তুমুল ঝগড়া বেধে গেল ছ'জনের মধ্যে। স্থিরবুদ্ধির কজন মহিলা মধ্যস্থতা করে শান্ত করলেন ছ'জনকে।

4

জুলাই মাসের তিরিশ তারিখে বর্গীস কোশীকে এক হাজার টাকা দিল।

'আমাদের ভাগ থেকে ছ'জনেই এক-এক হাজার টাকা নিয়ে নিই। সাত-আট মাসে রেশন থেকে তো কোন লাভই হ'ল না। তবু এক-ছ'হাজার টাকা নিলে বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না।

এবার তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। আমাদের স্ত্রীরা নিজেদের মধ্যে নোংরা নোংরা কথা বলে। এটাকে আমরাই বন্ধ করতে পারি। স্বপ্নেও আমি তোমাকে ঠকাই নি কখনো। কিন্তু তোমার স্ত্রী যা নয় তাই বলে।' বলল বর্গীস।

বন্ধুর সামনে মাথা হেঁট হয়ে গেল কোশীর। নিজের স্ত্রীর প্রসঙ্গে লজ্জিত হ'ল সে। বলল, 'তোমার বিরুদ্ধে আমার মনে কিছু নেই। স্ত্রীরা নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু বলেছে। আমরা ওসব কথায় কান-না দিলেই ভালো হয়।'

বাড়ি ফিরে কোশী ভাবল— সাতশো টাকা দিয়েই ব্যাবসা শুরু করেছিলাম না? দোকানের থেকে আনা জিনিসপত্র মিলিয়েও হাজার টাকা হবে বোধহয়। আর এই হাতে পাওয়া গেল হাজার টাকা। ভেবে স্ত্রীকে খুব তিরস্কার করল কোশী।

স্ত্রী বলল, 'আমি বললেই তোমার অসুবিধে হয়? অন্যরা কী বলে তাও যদি জানতে? এখনও যদি কিছু বুঝতে না পেরে থাকো তা হলে আমিও কিছু বলতে চাই না। হাজারটা ঘড়ার মুখ বন্ধ করলেও কিন্তু মানুষের একটা মুখ বন্ধ করতে পারবে না।'

'ঘড়ার কথা হচ্ছে না। তুমি তোমার মুখ খুলো না, সেটাই আমি বলতে চাচ্ছি।'

কোশীর মন বিষিয়ে গেল। ঠিক আছে, কেউ কেউ তো বর্গীস সম্পর্কেও বলে—কোশী বোকাসোকা মানুষ, বর্গীস ওকে ঠকাবে, পার্টনারশিপের কাজ কখনো সুবিধের হয় না, নিজেরটা নিজের বুঝে নেওয়াই ভালো, ইত্যাদি অনেক কথা।

লোকের মন বুঝতে বর্গীসের জুড়ি নেই। যাকেই আমি পাত্তা

না দেব সেই-ই লাগবে আমার পিছনে, এটা সে ভালো করেই বুঝত। বইয়েও সে পড়েছিল জল যেমন কাঠের টুকরো ভাসিয়ে নিয়ে যায়, জনতার রায়ও তেমনি ভাসাতে পারে সবকিছু।

বর্গীসের বাবার শ্রাদ্ধ হল। রেশনের দোকান থাকা সত্ত্বেও কি চার-পাঁচজনকে খাওয়াতে পারবে না, ভাবল ও। গাঁয়ের কিছু লোকজনকে ডেকে ভালো করে খাইয়ে দিল। মানত করল অসুখ হলে গীর্জায় লোক খাওয়াবে। গীর্জার মাঠে একটা ক্রুশও তৈরি করে দিল। তার উদ্‌ঘাটন উপলক্ষে তিনজন বড় আর চল্লিশজন সাধারণ পাদরী উপস্থিত থাকলেন।

রেশনের দোকানের উন্নতি হচ্ছিল ক্রমশ। ইতিমধ্যে বর্গীসের শরীর খারাপ হতে চিকিৎসা করানো অনিবার্য হয়ে পড়ল। ছ' সাত মাস আগে থেকেই দাঁতের যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল। মাড়িতে ঘাও দেখা দিল। ডাক্তার বললেন ক্যান্সার হয়েছে। শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল বর্গীস। পাছে কাটা-ছেঁড়া করতে হয় এই ভয়ে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শুরু করল। শরীর দুর্বল হ'ল আর রোগটাও বেড়ে গেল ক্রমশ।

ডাক্তার বললেন, 'ত্রিবান্দ্রমে চলে যাওয়াই ভালো। ইঞ্জেকশনটা বদলে দিলে উপকার পাবে। আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি।'

বর্গীস ভাবতেই পারে নি যে রোগটা এত তাড়াতাড়ি বেড়ে যাবে। আর কোন উপায়ও ছিল না। সে গেল ত্রিবান্দ্রমে। কোশীও সঙ্গে গেল।

'ব্যাবসায় পার্টনার বুঝি। ওর রোগেও কি পার্টনার হবে না কি?' কোশীর স্ত্রী জিজ্ঞেস করল।

'কিছুদিন ওখানেই থাকুন। আমি খুব আশার কিছু দেখছি

না।' বললেন ডাক্তার। সে-কথা শুনে বর্গীসের প্রাণ বেরিয়ে যাবার জোগাড় হ'ল।

দোকানে এসে রেশন না পেলে লোকে হৈ-চৈ বাধাবে। এই ভেবে কোশী বাড়ি ফিরতে মনস্থ করল। বর্গীসও সায় দিল তাতে। তার দেখাশোনার সমস্ত ব্যবস্থা কোশীই করে দিল।

যাবার আগে বর্গীসের কাছে অনুমতি চাইতে গেলে কোশীর হাত ধরে কেঁদে ফেলল সে। চোখে জল না এলেও কোশীর হৃদয় উদ্‌বেলিত হ্‌ল। বন্ধুর জীবন রক্ষা করতে কোশী এখন সবকিছু করার জন্যেই প্রস্তুত আছে।

'বোকামি কোরো না। এত ভয় পাবার কী আছে! সবরকম দুঃখ-কষ্টের সঙ্গেই তো লড়তে হবে আমাদের।' এসব বলে ওকে সান্ত্বনা দিল কোশী।

'আমি তোমার প্রতি···' রুদ্ধ কণ্ঠে বলল বর্গীস, 'অনেক অবিচার করেছি। ভগবানের নামে ক্ষমা করে দিয়ো আমাকে। আমার বাচ্চাদের বঞ্চিত কোরো না।'

'কী অবিচার করেছ?' এত ভালো লোক বর্গীস, কোন্ ভুল করতে পারে ভেবে পেল না কোশী।

ঘরের পথে রওনা হ'ল কোশী। দোকানের দিকে তাকাতেই ওর চাবির কথা মনে হ'ল। চাবির গোছাটা তো বর্গীসের কাছেই ছিল। বিদায়ের সেই বিহ্বল মুহূর্তে কোশী সেই তুচ্ছ চাবির কথাটাই ভুলে গেছে। বর্গীসও দিতে ভুলে গেছে হয়তো— ভাবল সে। চাবিঅলা ডেকে দোকানের তালা খোলানো ছাড়া এখন আর কোন উপায় নেই। তবু ভাবল কোশী, চাবিঅলা ডেকে খোলা কি উচিত হবে! তখন, কিছু টাকা জোগাড় করে

রেশন নিয়ে এলো সে। দোকানের বারান্দায় সেসব জিনিস রেখে খদ্দেরদের দিল। কিছু লোক জিজ্ঞেস করল, 'দোকান খুলতে অসুবিধে কী!'

কোশী চুপ করে থাকল। অসুবিধে কিছুই নেই, তবু তালা ভেঙে দোকান খোলা সম্ভব হয় নি। আর সেইটাই ছিল কোশীর সমস্যা। সে তালা ভেঙে ঢুকতে চায় নি।

কিছুদিন পরে ত্রিবান্দ্রম থেকে টেলিগ্রাম এলো ডাক্তারের। সঙ্গে সঙ্গে রওনা দিল কোশী। বর্গীসের স্ত্রীও গেল ওর সঙ্গে।

কোন চিকিৎসাতেই কাজ হ'ল না। ওরা যখন পৌঁছল বর্গীস তখন মৃত্যুশয্যায়।

বর্গীসের স্ত্রী চীৎকার করে কেঁদে উঠল। বন্ধুর অবস্থা দেখে কোশীও চোখের জল সামলাতে পারল না। বর্গীস তখন মৃত্যুর সময় গুণছে।

'তাড়াতাড়ি নিয়ে যান!' ডাক্তার বললেন।

একটা ট্যাক্সিতে বন্ধুকে বাড়ি নিয়ে এলো কোশী। বাড়ি ফেরার পর দ্বিতীয় দিনে বর্গীস তার সংসার, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, কোশী আর দোকান থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

যথোপযুক্ত রীতিতেই তার অন্তিম কাজ করা হ'ল। প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে পাদরী পরলোকতত্ত্ব আলোচনা করলেন। বর্গীস 'ক্রুশ' তৈরি করে দিয়েছিল, তার জন্যে পাদরীর মনে কম ভালোবাসা ছিল না।

বর্গীসের বিধবা স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল হ'ল কোশী। বাপ-মরা ছেলেমেয়েদের স্নেহে ভরে তুলল। বন্ধুর চেয়ে বড় পৃথিবীতে আর কিছুই নেই, কোশী তাই ভাবত।

বর্গীসের মৃতদেহের কাছে রেশনের দোকানের চাবিটা খুঁজে পেয়েছিল কোশী।

নিজের সারাটা সময় দোকানেই কাটাতে লাগল কোশী। হিসেব লেখার বই-খাতা সেখানে ছিল না। রাত্রে বাড়িতে বসে হিসেব লিখত বর্গীস। বই-খাতা সেজন্যে বর্গীসের ঘরেই ছিল।

বর্গীসের স্ত্রী কোশীকে প্রায় ভ্রাতার সম্মান দিতে লাগল। ওর শত্রুতা তো কোশীর সঙ্গে নয়, তার স্ত্রীর সঙ্গে।

সেদিন রবিবার। গীর্জা থেকে ফেরার পথে কবরখানায় গেল কোশী। বর্গীসের কবরের পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। চোখ ভরে উঠল জলে। সুখী মাটি আগ্রহে টেনে নিল তাকে। 'কোশী, আমি অনেক ভুল করেছি, ভগবানের নামে আমাকে ক্ষমা করো। আমার বাচ্চাদের বঞ্চিত কোরো না।' বর্গীসের শেষের কথাগুলো কানে বাজছিল কোশীর। কী ভুল করেছিল বর্গীস? কিছু তো নয়। হয়তো অকারণেই বলেছিল।

হিসেবের বইখাতাগুলো দরকার হয়ে পড়ল কোশীর। কতদিন আর আল্‌গা কাগজে হিসেব লেখা যায়। যারা টাকা দেয় তাদের কাছে টাকা নিতে হলে ঠিক-ঠিক হিসেব দেখানো চাই তো! এইভাবেই গেল কিছুদিন। একদিন বইখাতা আনার জন্য একটি লোককে বর্গীসের বাড়ি পাঠালো কোশী। বেশ পরিশ্রম করে লোকটি একগাদা বইখাতা তুলে নিয়ে এলো। এতগুলো করে কপি! দেখে অবাক হ'ল কোশী। সেগুলো উল্টেপাল্টে দেখার জন্যে বাড়ি নিয়ে গেল কোশী।

রাত্রে সে ওগুলো নিয়ে বসল। একটা করে পাতা ওল্টায় আর বেদনায় কুঁকড়ে ওঠে তার বুক। আলোর সামনে বসে স্বামীকে

হিসেবের খাতা ওল্টাতে দেখে স্ত্রী হাসতে লাগল। এটা সে করলে কোশী নিশ্চয়ই রেগে যেত। সে বেশ বুঝতে পারছিল এতগুলো করে কপি রাখার রহস্য স্বামী ধরতে পারছে। মনে মনে খুশিই হ'ল সে।

'কোশী আমি অনেক অপরাধ করেছি। ভগবানের নামে আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো। আমার ছেলেমেয়েদের বঞ্চিত কোরো না...' সেই কথাগুলি...

কোন কোন ব্যাবসাদার দু'রকম হিসেব রাখে। একটা সত্যিকারের আর একটা সরকারের চোখে ধুলো দেবার জন্যে। কিন্তু বন্ধুকে ঠকানোর জন্যে আর-একধরনের হিসেব...

কোশীর মাথা ঘুরতে লাগল। আমি কি বেঁচে আছি এখনো। সন্দেহ হ'ল ওর। পৃথিবী ছেয়ে গেল অন্ধকারে। কোশীর মনে হচ্ছিল এই অন্ধকারে সে একা এবং নিশ্চল। দোকানের টাকা নিয়ে বর্গীস চার হাজার টাকার 'চীট ফাণ্ড' চালাতো। নিজের স্ত্রীর নামে ছ'হাজার টাকা তুলে টাকাটা নিজের কাছেই রেখেছিল। বর্গীস প্রথমে ঢেলেছিল মাত্র পাঁচ-শো টাকা। কোশীর বাড়ির জন্যে নেওয়া প্রায় তিন হাজার টাকার জিনিসপত্র দেখানো হয়েছে। অন্ধকার আকাশে ক্রমশ চন্দ্রোদয় হলেও ঘুম আসছিল না কোশীর। কোনরকমে শুয়ে থাকল সে।

'তুমি ঘুমোচ্ছ না কেন?' মরীয়কুট্টি জিজ্ঞেস করল।

'...'

'শুচ্ছ না কেন?' আবার প্রশ্ন।

'ঘুম আসছে না।'

'হঠাৎ কী হ'ল যে ঘুম আসছে না।'

'এই, ভাবছি।'

'এত ভাবনার কী আছে? ছেলেকে পাঠানোর টাকা নেই? না, পাওনাদার তাগাদা দিচ্ছে?' স্ত্রীর এসব কথায় লজ্জিত হ'ল কোশী। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—

'তোমার কথাই ঠিক ছিল দেখছি।'

'কী?'

'এই বর্গীসের ব্যাপারে।'

'আমি গোড়া থেকেই জানতাম। সাত বছর মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়েছি। এবার বিশ্বাস হ'ল তো!' মরীয়কুট্টি বলল।

'হ্যাঁ, হ'ল।'

'আরো আগে বুঝলে কাজ হ'ত…'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কোশী বলল, 'সেটা হত না। অন্তত আমাকে দিয়ে হ'ত না। বিশ্বাস দিয়েই শুরু করতে হয়।'

'কিন্তু তোমার বন্ধু তো বিশ্বাস করত না তোমাকে। ও কাউকেই বিশ্বাস করত না।'

'হ্যাঁ, এইরকমই ছিল ওর স্বভাব। মৃত্যুর পরে বিশ্বাস করতে শিখেছে কিনা কে জানে?'

কোশীর স্ত্রী হাসতে লাগল।

ব্যাপারটা আদৌ সহ্য করতে পারছিল না কোশী।

পরের দিন দেরিতে ঘুম ভাঙল তার। পিওন ইনসিওরেন্স কোম্পানির খাম দিয়ে গেছে। বর্গীস তার ছোট ছেলের নামে দু'হাজার টাকার একটা পলিসি করেছিল।

বর্গীসের স্ত্রীকে ডেকে আনবার জন্য লোক পাঠাল কোশী। ওদের বাড়িতে আসা খুব পছন্দ করত না বর্গীসের স্ত্রী।

কিন্তু বিধবার পক্ষে কোশীর নির্দেশ অমান্য করাও সম্ভব ছিল না।

'কোশী, আমি অনেক ভুল করেছি। ভগবানের নামে ক্ষমা করে দিয়ো আমাকে। আমার ছেলেমেয়েদের বঞ্চিত কোরো না।' থেকে থেকেই কথাগুলি গুঞ্জন তুলছিল কোশীর কানে। কোশী আর তার স্ত্রীর সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল বর্গীসের বিধবা। তার দিকে হাত বাড়িয়ে কোশী বলল, 'এই নাও, দোকানের চাবি। আজ থেকে দোকান তোমার। দোকানে আর আমার কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। কারণ জিজ্ঞেস কোরো না। তুমি চালাতে হয় চালাও, না হলে বন্ধ করে দাও। আজ থেকে দোকানের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ রইল না।'

চাবিটা নিতে বর্গীসের স্ত্রী একটু ইতস্তত করলে সেটা ওর সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দ্রুত বাইরে চলে গেল কোশী।

এতক্ষণ আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে ছিল। সেটা আর নেই। কোশীর বুক থেকে একটা পাষাণভার নেমে গেল।

বধূ

এস. কে. পোট্টেকাট

বৃষ্টির পর পরিষ্কার হ'ল আকাশ। প্রকৃতির সৌন্দর্য এখন স্পষ্ট। সন্ধ্যা ও মেঘের মধ্যে চলছিল লুকোচুরি খেলা।

পট্টাংবী আর কুট্টিপুরম রেলরাস্তার দু'পাশের ক্ষেত, সবুজে ঢাকা টিলা, ফলের ভারে ঝুঁকে-পড়া গাছ-গাছালি ছাড়িয়ে ভারতপ্পুষার বালুবেলা দেখতে দেখতে চলেছি আমি আর গোপী।

তিনমাসের ছুটি নিয়ে মালয় থেকে আমার কাছে এসেছে গোপী। চ'লে আসার প্রধান কারণ বিয়ে। এখান থেকে ও চ'লে যাবার পর আটটি বছর কেটে গেছে। তারপর থেকে এই প্রথম গ্রামে ফিরল। এই গ্রামেরই এক সম্ভ্রান্ত আর পুরনো পরিবারের একজন ও। এখন অবশ্য সে-পরিবারের আর কেউই থাকে না; বাড়িটা সেজন্যে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। গোপীর এক দাদা মাদ্রাজের কোথাও সেল্‌স্‌-অফিসার। ঘরবাড়ির এই পরিস্থিতিতে বিয়ের ব্যাপারটা ও আমার ওপরেই ছেড়ে দিয়েছে, কারণ আমি ওর সহপাঠী, বন্ধু এবং এখনো গাঁয়েই থাকি।

কনে পছন্দের জন্যে যা-যা চাই সে-সম্পর্কে চিঠিতে খুঁটিনাটি আমাকে অনেক কিছুই জানিয়েছিল গোপী। তা অনেকটা এইরকম— কনের রঙ হবে পাকা কলার মতো, চোখ বড় বড় আর কালো, সুন্দর টিকালো নাক এবং চুল হওয়া চাই ঘন, কোঁকড়ানো। চুল সম্পর্কে বাক্যটির গুরুত্ব বোঝানোর জন্যে

নীচে লাইন টেনে দিয়েছিল। একটু লম্বা হলেই ভালো হয়, আর স্বাস্থ্যবতী। বয়স সতেরো থেকে কুড়ির মধ্যে। ধনী আর বড় পরিবারের মেয়ের দরকার নেই।

একেবারে পাকা কলার মতো রঙ না পেলে ঈষৎ শ্যামল হলেও চলবে। কিন্তু চুল সত্যিকারের ঘন আর কোঁকড়া হওয়া চাই। বাকী সব যেমনটি চাওয়া হয়েছে তেমনি।

গোপীর ভাবী বধূর বর্ণনা পড়তে পড়তে আমার মনে পড়ল তিরুর স্টেশনে কলা-বেচতে-আসা এক বুড়ীর হাঁক : সুন্দরী স্ত্রীর রঙ কলার মতো হওয়া চাই।

গোপীর চিঠিটা আমি দু'তিনবার পড়লাম। আমার মনে হ'ল ও ঠাট্টা করেছে। মাদ্রাজে যখন আমি বি, এ. পড়ি তখন থেকেই গোপীর সঙ্গে আমার জানাশোনা। সে লাজুক আর রসিক, সম্ভবত সেইজন্যেই অনেক প্রতীক্ষার পর ভাবী স্ত্রীর রূপগুণের বর্ণনা করেছে আমার কাছে। তবুও এমন ধরনের স্বপ্ন দেখার কারণ কী? এ যেন কোন সিনেমার নায়িকার বর্ণনা। উদ্দেশ্য অবশ্য বুঝতেই পারলাম। মালয়ে নিজের মালয়ী আর চীনা বন্ধুদের সামনে প্রকৃত মালয়ালী মেয়ের সৌন্দর্য প্রদর্শন করতে চায়। এইজন্যে চুল, নাক আর রঙের ওপর জোর দিয়েছে এত। তোমার কামনাটা সত্যিই জব্বর, গোপী।

চিঠির উত্তরে আমি দুটো প্রশ্ন শুধালাম, 'চোখে চশমা থাকলে আপত্তি আছে? আর, একটু-আধটু গান জানা থাকলে কি বাতিল হয়ে যাবে?'

কিন্তু, আমার চিঠি পাবার আগেই সে সর্বগুণসম্পন্না লক্ষ্মীস্বরূপা ভাবী বধূর সন্ধানে রওনা হয়েছিল। এমন স্ত্রী খুঁজে বের করার

পরিশ্রম কোন সাধারণ মানুষের কাজ নয়। পাকা কলার মতো রঙ, কলার ফুলকে হার-মানানো নাক, হরিণীর মতো চোখ, কঞ্চির মতো লম্বা আর সুডৌল স্বাস্থ্যের অধিকারিণী, মাথার চুল এতই ঘন যে ছড়িয়ে দিলে মনে হবে চীনা রেশমের পর্দা ঝুলছে; কিন্তু শরীরের রঙ সেই কালো চীনা রেশমকে হার মানাবার পক্ষে পর্যাপ্ত।

গোপীর কথায় দীর্ঘশ্বাস ফেলতে এতটুকু কষ্ট হল না, কারণ এটাই সত্য আর স্বাভাবিক। একমাত্র ভগবানের ইচ্ছাতেই হতে পারে এ-রকম। গোপীর পছন্দসই এক রূপ-কুমারীর সঙ্গে পরিচয় ছিল আমার। এখান থেকে দু'তিন মাইল দূরে থাকে। সোনার মতো রঙ, লম্বা আর সুডৌল শরীর, গাল, মাথা, কোমর সবই চমৎকার। তেমনি কেশভার তার। কালো আর মসৃণ সেই চুল খুলে রাখলে ভূমি স্পর্শ করে। তার চালচলনেও মাদকতা; চলনেও চোখে পড়ে রঙের চমক। সেই সুন্দরীকেই আমি গোপীর জন্যে নির্বাচন করে রেখেছিলাম। কৃষকের মেয়ে। পরিবার ভালো। তবু খুঁত ছিল একটু। মেয়েটি কুমারী নয়। সাত-আট বছর আগে ওর বিয়ে হয়েছিল একবার।

স্বামীই মেয়েটিকে ত্যাগ করেছিল না মেয়েটিই স্বামীকে— জানি না। তখন থেকেই সে আর বিয়ে করে নি। আজকাল ওর কাজ সুতো কাটা আর হিন্দি পড়া। গুরুবায়ুরপ্পনের ছবি সামনে ধ'রে পুজোও করে। এসব কাজের মধ্যে শেষেরটাই ওর মামার পছন্দ। মা-বাবা মারা গেছেন। মেয়েটির নাম অম্মুকুট্টী। ওর ব্যাপারে মনে-মনে অপ্রসন্ন হলেও কিছুই বলেন না মামা। এইভাবেই কেটে গেছে কয়েকটি বছর।

এতদিন চ'লে গেলেও মেয়েটির সৌন্দর্যে ভাঁটা পড়ে নি

এতটুকু। এখন ওর বয়স হবে প্রায় সতেরো আঠারো। এতটা জেনে নেবার পর গোপীর কথাগুলো নতুন ক'রে বলার দরকার নেই কোন। এর কদর্থ করারও কারণ নেই। কিছু মেয়ে থাকে গোল পাথরের মতো, যাদের বয়স বোঝা শক্ত। যদিও বোধবুদ্ধি তাদের কিছু কম থাকে না। অম্মুকুট্টীকেও এই দলে ফেলা যায়। আমি জানি ওকে দেখার পর গোপী আমাকে আর কিছুই বলবে না। সন্দেহ থাকলে সেটা অম্মুকুট্টীরই দিক থেকে। যদি সে বিয়ে করার জন্যে তৈরি না থাকে। এ ছাড়া ওদের দুজনের মিলনে বাধা সৃষ্টি হবার মতো আর কোন কারণ নেই।

কোমল চেহারার ছেলে গোপী। রঙ একটু ময়লা। লম্বা। মালয়ে থেকে-থেকে একটু মোটা হয়েছে। চুল খুব কালো। ডান কানের পাশে জুলপিতে কিছু চুল যদিও পেকে গেছে। মালয়ে কাজ করে বড় অফিসারের। জমিদারি থেকেও মাসে মাসে দু'আড়াইশো টাকা পায়। নিজের গাড়ি আছে। একটু কৃপণ হওয়ার ফলে ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সও কম নেই। আর কী চাই? বিয়ের পর সংসার চালানোয় কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়। সুতো কাটা আর হিন্দি পড়া যদি একান্তই আবশ্যিক হয়, অম্মুকুট্টী মালয়ে গিয়েও করতে পারে। গুরুবায়ুরপ্পনের ছবিও সঙ্গে নিতে পারে। আমি যতদূর জানি গোপীরও কিঞ্চিৎ ঈশ্বরভক্তি আছে। আমরা যখন মাদ্রাজে ছাত্র ছিলাম, প্রতিদিন রাত্রে শোবার আগে সে 'শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতা' পাঠ করত।

আমাদের মেয়ে দেখতে যাওয়ার মতলব মেয়ের বাড়ির লোকজনের জানা ছিল না। এ-রকম উদ্দেশ্য আগেই জানিয়ে

দেওয়া উচিত। মেয়ে পছন্দ না হলে মেয়ে আর তার বাড়ির লোকজনের দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। মেয়েদের পরিবার সম্পর্কে গোপীরও কিছুই জানা ছিল না। মেয়ে পছন্দ হলে এ-বিষয়ে খোলাখুলি সব কথাই ব'লে দেওয়া যাবে তাকে।

আমরা হাঁটছিলাম।

কালো কাপড় আর সাদা জামা পরে মুসলমান মেয়েরা মাথা ঝুঁকিয়ে সবুজ ধানের ক্ষেতে কাজ করছে। সার দিয়ে দাঁড়ানো এইসব মেয়েদের দেখলে মনে হয় কেউ যেন মাঠের ওপর লম্বা কালো কাপড়ের পাঁচিল তুলে দিয়েছে। চোখে ঘন সুর্মা লাগানো এক অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রৌঢ়া একাকিনী কাজ করছে আর-একটি মাঠে। বুকের ওপর ঝোলানো মতির মালা সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে তার। ক্ষেতের মাটিই তার হাতের ব্যস্ত আঙুলগুলির লক্ষ্য।

ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে চলেছে গোপী। আমি বললাম, 'এত বছর পরেও এই জায়গা আর এখানকার দৃশ্যগুলোয় পরিবর্তন ঘটে নি কোন।'

'কোন পরিবর্তন হয় নি—এটা ঠিক নয়। তার যে-কোন আবর্তনই আবর্তন।' দাঁড়িয়ে পড়ে আমার দিকে তাকাল গোপী। তার চোখ কালো এবং বড়ো বড়ো। 'ঠিক কথা, সেটা রোধ করার শক্তি মানুষ বা শাস্ত্র কারুরই নেই। ঘূর্ণ্যমান একটা বড়ো চাকার মতো সবই আসে আবার চলে যায়। আবার ফিরে আসে। অলৌকিক, পরমাণু, প্রকৃতি, মানুষ সবই তার অংশ···।' বুঝতে পারলাম কথা দেবার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছে গোপী। যে স্বভাবতই লাজুক সে যদি হঠাৎ তত্ত্বজ্ঞানী হ'য়ে ওঠে তাহলে তর্ক করা যায় না। ,আমি সিগারেট ধরালাম। গোপী ধূমপান করে না।

গোপী আবার বলতে শুরু করল, 'মানুষের জীবনেও পরিবর্তনের আভাষ অস্পষ্ট হয়ে থাকে। আমাদের মতো ছোটখাটো জীবনেও ছায়া ফেলে সে, যদিও আমরা ঠিক-ঠিক বুঝতে পারি না। সেইজন্যেই ব্যাপারটিকে গুরুত্বও দিই না।'

নীচের ক্ষেতের দিক থেকে মুসলমান মহিলাদের একটি দল এগিয়ে আসছে। সম্ভবত বিয়ের যাত্রী এরা, নবোঢ়া স্ত্রীকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছে। তাদের পরণের সবুজ, হল্‌দে, নীল এবং লাল রঙের রেশমী কাপড়গুলি আসন্ন সন্ধ্যার আভায় ইন্দ্রধনু-রঙের সৃষ্টি করছে।

হাঁটতে হাঁটতেই হাত নেড়ে নেড়ে গোপী তার বক্তৃতা চালিয়ে যাচ্ছিল।

আমরা যখন রেলপুলের কাছে পৌঁছলাম, সেইসব মহিলারা ছাতা খুলে রেল লাইনের পাশের রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ল।

তারা চলে যাবার পর গোপীকে বললাম, 'লক্ষণ ভালো। ওরা বিয়ের পর নববধূকে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছে।'

গোপী সাড়া দিল না।

'ন'জন স্ত্রীলোক আছে ওই দলে—নয় সংখ্যা শুভ।' শুনে বললাম গোপীকে।

গোপী এবারও চুপ করে থাকল। তখন লাজুক ছেলেটির দিকে তাকিয়ে কেঁপে উঠলাম আমি। গোপীর মুখ হল্‌দে আর চোখে বন্দী মাছের বেরিয়ে আসার ছটফটানি।

'গোপী! গোপী...” সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গোপীকে ধরলাম আমি। খোসা-ছাড়ানো কলার মতো ঠাণ্ডা গোপীর হাত। আমরা যখন মাদ্রাজে একসঙ্গে পড়তাম তখন দু'তিনবার

'হিস্টিরিয়া'-য় ভুগতে দেখেছিলাম ওকে। ভাবলাম, হয়তো এবারেও তাই হয়েছে। গোপীকে ধ'রে মাটিতে বসিয়ে দিলাম আমি।

মিনিট পাঁচেক পরে গোপীর জ্ঞান ফিরতে লাগল। চোখ স্বাভাবিক হ'ল। আমিও নিশ্চিন্ত হলাম। তাহলে 'হিস্টিরিয়া' নয়।

'সেই জায়গা— সেই পুল', বিড় বিড় ক'রে বলল গোপী। তারপর কপালের ঘাম মুছে তাকিয়ে থাকল একদিকে। আর আমার দিকেও এমনভাবে তাকাল যাতে মনে হবে হঠাৎ আকস্মিক ভাবে দেখা হয়েছে আমাদের।

দ্বিতীয় সিগারেটটা ধরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন ভালো লাগছে একটু?'

বিষণ্ণভাবে হাসল গোপী। তারপর দূরে তাকিয়ে থাকল।

মেঘ কেটে গিয়ে আস্তে আস্তে আলো ফুটে উঠল।

'গোপী, এটা কি মাদ্রাজের সেই অসুখ?'

গোপী মাথা নেড়ে বলল, 'না। মালয়ে যাবার পর থেকে আর হয় নি।'

'কিন্তু, এখন যেটা হ'ল?' জিজ্ঞেস করলাম আমি, 'মালয়ের হিস্টিরিয়া নাকি?'

মুখের ওপর উড়ে-আসা সিগারেটের ধোঁয়া সরাতে সরাতে চুপ করে থাকল গোপী।

'"সেই জায়গা—সেই পুল", এসব কথার মানে কী? জায়গাটা তোমার আগে থেকেই চেনা নাকি?'

উত্তর পেলাম না।

কিছুক্ষণ পরে দূর-টিলায় দৃষ্টি আবদ্ধ রেখে ক্ষীণ গলায় গোপী বলল, 'সে এক পুরনো কাহিনী। যেখানে আমি এইমাত্র বসে-

ছিলাম, আট বছর আগে সেখানে মৃত্যুর মতো একটা ঘটনা ঘটেছিল।' আবার চিন্তিত হয়ে চুপ করে গেল সে।

'কী হয়েছিল, বলো? কবে ঘটেছিল?' আমি ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে চারটে। অন্ধকার হবার আগেই সেখানে পৌঁছবার জন্যে এখনো ঘণ্টা দুয়েক সময় পাওয়া যাবে।

সেই ঘটনার বিবরণ আমার কাছে পেশ করতে গোপী বোধহয় কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ বোধ করছিল। জোর করতে বলল, 'বি. এ. পাস করার পর এল. টি. করার ইচ্ছেয় আমি একটা স্কুলে মাস্টারি করেছিলাম। সেই স্কুলটা এখান থেকে মাইল দু'য়েক দূরে।'

'মাস্টারি করছ এটা তখনই জানতাম; কিন্তু এটা জানতাম না যে ঐ স্কুলেই পড়াচ্ছ। এখন জানলাম।' বললাম আমি।

'হ্যাঁ, এইখানেই। সেই সময় তুমি গ্রামে ছিলে না।'

'হ্যাঁ, আমি ছিলাম না। কী হ'ল তারপর?'

'একটা দোকানের ওপর ঘর নিয়ে থাকতাম আমি। চেনা-শোনা কেউ ছিল না। সন্ধ্যায় স্কুল থেকে ফিরে বেড়াতে যেতাম মাঠের দিকে। কখনো কখনো গিয়ে বসতাম নদীর ধারে, অন্ধকার হতে হতে ফিরে আসতাম। হোটেলে খেয়ে রাত বারোটা পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দের লেখা পড়তাম।'

'শোবার আগে 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'ও তো পড়তে?'

' "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" ' তখনকার মতো এখনও আমার ভালো লাগে।'

মনে মনে ভাবলাম—সবই তো ঠিক ঠিক আছে, হাই স্কুল, একা ঘর, বেড়ানো, হোটেল— সেইসঙ্গে কর্মযোগ— পাখা মেলে এখন প্রেমের আবির্ভাব হলেই হয়!

'একদিন সন্ধ্যায় একটি মেয়ের দিকে তাকিয়ে আমি আর চোখ ফেরাতে পারলাম না। অসামান্য সৌন্দর্য ছিল তার।'

'আকাশ থেকে পড়ল না মাটি থেকেই উঠে দাঁড়াল? উত্তরের গীত-গাইয়েদের মতো নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করেছিলে নিজেকে?'

'হ্যাঁ, ওর সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গেলে…'

'থাক, বর্ণনা করে তার মাহাত্ম্য নষ্ট কোর না,' সস্নেহে গোপীকে বললাম আমি। 'সবচেয়ে সুন্দরী সেই মেয়েকে আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পাই।'

'রোজ সন্ধেবেলায় দেখা করতাম আমরা। তার বড় বড় কালো চোখের দৃষ্টি আমার হৃদয়ে এক বিচিত্র অনুভবের সৃষ্টি করেছিল। সে ছিল এক শিক্ষিকা।'

'ও, ব্যাপারটা তাহলে এই…,' বললাম আমি, 'না হলে প্রতিদিন একটি বিশেষ জায়গায় দেখা হওয়া মুশকিল ছিল। তার নাম কী?'

গোপী চোখ বন্ধ ক'রে বলল, 'তার নাম আমি আজও জানি না।'

'ঠিক আছে, বলে যাও— সেই অজ্ঞাত মায়াবিনীর কাহিনী—'

'এইভাবে রোজই দেখা করতাম আমরা— সে যখন স্কুল থেকে ফেরে আর আমি বেড়াতে যাই সেই সময়। সে রেললাইনের ধারের রাস্তা দিয়ে যেত। রোজই দেখা হ'ত আমাদের, কিন্তু কথা বলতাম না কেউই।'

'কথা বলতাম না! তা হলে যত কথা সব চোখে চোখেই হ'ত।' আমি কবিতা ক'রে বললাম।

'একদিন ওর বাড়ি চেনার জন্যে ওকে পিছনে পিছনে অনুসরণ করলাম—' বলে চলল গোপী, 'প্রায় দু'তিন মাইল হাঁটতে হ'ল আমাকে।'

'সে তোমাকে দেখে নি?'

'দেখেছিল, ঘরে ঢোকবার মুখে একবার পিছনে তাকিয়ে দেখেছিল।'

'পরের দিন দেখা হতে কিছু বলল না তোমাকে?'

'না, শুধু একবার তাকিয়েছিল আমার দিকে।...এইভাবে কেটে গেল দু'টি মাস।'

'এতদিন তোমাদের মধ্যে শুধু দেখাদেখিই চলল?'

'হ্যাঁ, শুধুই দেখাদেখি।'

'দু'মাসে তোমাকে দেখে সে একবার হাসে নি পর্যন্ত?'

গোপী হাসল একটু। আমি একটা সিগারেট ধরালাম।

'তারপর কিছুদিন দেখতে পেলাম না ওকে,' দুঃখের গলায় বলল গোপী।

'অসুখ-বিসুখ হয়েছিল বোধহয়?' আমি সহানুভূতি দেখালাম।

'একদিন রাত্রে ঘরে ব'সে পড়াশুনো করছি, হঠাৎ খোলা জানলা দিয়ে চোখ গেল বাইরে। মাঠ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে জ্যোৎস্না। ঝরনার ধারে কেতকীকুঞ্জ নাচ জুড়েছে হাওয়ায়। ইচ্ছে হ'ল হেঁটে যাই ওই জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে। জামা পরে, শীত এড়ানোর জন্যে একটা পাগড়ীও মাথায় জড়িয়ে নিলাম। দরজা বন্ধ ক'রে বেরিয়ে এলাম বাইরে। মাঠ পেরিয়ে পৌঁছলাম রেল লাইনের রাস্তায়। তখন মনে পড়ল ওকে। মনে হ'ল ওর বাড়ি যাই।'

ভাবলাম, প্রেমে পড়লে রেললাইনে মাথা পেতে দিতেও প্রেমিক ইতস্তত করে না।

'আমার পা এগিয়ে যাচ্ছিল। তখন আমার মনে সে ছাড়া আর কেউই নেই। জ্যোৎস্নায় অবগাহন করছে তার বাড়ি, সেই

সুন্দর ছবি ভেসে উঠল আমার মনে। এখন নিশ্চিত সে ঘুমুচ্ছে। শোবার সময় সে কি চুলের গুচ্ছ আঁট ক'রে বেঁধে দিয়েছে নাকি ছড়িয়ে দিয়েছে বিছানায়? তার শ্বাস পড়ছে থেমে থেমে। তার শব্দ কী রকম?'

আমি হঠাৎ বলে উঠলাম, 'কাঁসার বাসনে দুধ দোওয়ার শব্দের মতো।'

এইসময় একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। সিগারেটে শেষ সুখটান দিয়ে বললাম, 'পাঁচ-ছ বছর আগে আমি একবার মাদ্রাজ যাচ্ছিলাম। সেকেণ্ড ক্লাসে সীট পেয়ে আরাম ক'রে শুয়ে পড়লাম। তারপরেই স্বপ্ন দেখলাম— এক গাঁয়ে একটি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। ভোর হয়ে আসছে। পাশেই গোশালা, সেখানে দুধ দুইছে একটি মেয়ে। কাঁসার বাসনে দুধ দোওয়ার মধুর শব্দ কানে আসছিল আমার। ঠিক সেইসময়ে এক ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলে তাকালাম। গাড়ি আরকোনমে পৌঁছে গেছে। কাঁসার বাসনে দুধ পড়ার শব্দ তখনো কানে আসছে। চারদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম, সামনের সীটে শুয়ে থাকা মহিলার চুড়ির শব্দই এতক্ষণ কানে আসছিল আমার।'

আমার গল্প শুনে হাসতে লাগল গোপী। দূর থেকে ট্রেনের শব্দ পাচ্ছিলাম।

'সম্ভবত মাদ্রাজ মেল।' গোপীকে সাবধান ক'রে বললাম, 'এই পুল থেকে কিছুটা দূরে সরে যাই চলো।'

সেই জায়গা! পুল কাঁপিয়ে ট্রেন চ'লে গেল।

সবাই চ'লে গেল উত্তর দিকে।

'যাচ্ছি অনেক দূরে
বেদনা-বিকল,
সৌন্দর্য দেখব বলে
দাঁড়িয়েছি সামনে তোমার,
প্রেমের পতাকা হয়ে
এলাম তোমার কাছে প্রিয়।'

ফসল কাটার সময়ের এই লোকগীতিটি হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার। গেয়ে শোনালাম গোপীকে।

'এইভাবে লাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে ওর ঘরের কাছে পৌঁছে গেলে তো?'

'পৌঁছতে পারি নি', পুলের শেষ-পর্যন্ত তাকিয়ে গোপী বলল, 'পুলের কাছাকাছি এসে পড়েছি, এমন সময়…এমন সময়…', কথা হারিয়ে ফেলল গোপী।

'এমন সময় কী হ'ল?' কৌতূহল বেড়ে গেল আমার।

'মাঠের ভিতর থেকে একদল কালো ভূত আমার সামনে উঠে এলো।'

'কালো ভূত।'

'হ্যাঁ, মাথা থেকে পা-পর্যন্ত কালো কাপড়ে ঢাকা। সব মিলিয়ে ন'জন। নিঃশব্দে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমি তখন খুবই ক্লান্ত। খুব ভালো ক'রে দেখলাম ওদের— ডাকাত। মাথায় কালো টুপি, হাতে বল্লম, কোন জমিদার বা বড়লোকের বাড়ি লুঠ করতে যাচ্ছে। কালো কাপড়ের মুখোশের মধ্যে থেকে একসঙ্গে অনেকগুলি চোখ আমার দিকে তাকাল।

'কে তুমি?' দলের একজন জিজ্ঞেস করল।

'কোথায় যাচ্ছ?' আর একজন বলল।

'সেই মুহূর্তে সমগ্র পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে গেলাম আমি। কী বলব? সেখানের কোন জায়গার নাম জানা নেই আমার। মিথ্যে বললেও মারবে। ওদের যে দেখে ফেলেছি এটাও তো আমার একটা অপরাধ। ওদের হাতের একটি ডাণ্ডার ঘায়েই খতম ক'রে দিতে পারে আমাকে। লাশটা শুইয়ে দিয়ে যেতে পারে রেললাইনের ধারে। সকালে গাড়ি আসবে— তখন দু'টুকরো। মাথা থেঁতলে গেলে কেউ চিনতেও পারবে না। সকালে সবাই দেখত। স্কুলে যাবার সময় সেও দেখত। একবার তাকিয়ে চ'লে যেত আহত হয়ে। কিন্তু ওরা আমাকে মারবেই বা কেন? আমার হাতে ঘড়ি কলম কিছুই ছিল না। পকেটে একটি পয়সাও নেই। সম্ভবত সেই কারণেই মেরে ফেলবে আমাকে। 'শয়তানটার পকেটে একটি পয়সা পর্যন্ত নেই' বলে একবার ক্ষেপলেই তো কাজ সারা! এইভাবে একমুহূর্তে অসংখ্য চিন্তা ঘুরপাক খেয়ে গেল মাথায়। একটা ভূত হাত বাড়িয়ে আমার মাথা থেকে চাদরটা খুলে দিয়ে বলল, 'কাফের!'

'যাচ্ছ কোথায়?' প্রথম ভূত জিজ্ঞেস করল।

'এখান থেকে দু'মাইল দূরের একটা জায়গার নাম হঠাৎ মনে পড়ল আমার। বলে দিলাম। কেন যাচ্ছি, কার সঙ্গে দেখা করতে, এসব প্রশ্ন করলেই ঝামেলায় পড়ব। ধৈর্য ধ'রে গীতার শ্লোক আউড়ে নিলাম মনে মনে। তখন ওদের একজন এগিয়ে এসে খুব ভালো ক'রে মুখ দেখল আমার।

"ছেড়ে দাও। আমার ছেলের মাস্টার।"

'সেই মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্রের উচ্চারণের দিকে তাকালাম আমি।

আমার ক্লাসের মুসলমান ছেলেদের প্রত্যেকের মুখ স্মরণ করার চেষ্টা করলাম।

"এই, সোজা চলে যাও।" প্রথম ভূত বলল। তারপর পা দিয়ে চাদরটা সরিয়ে দিয়ে বলল, "এটাও নিয়ে যাও।"

'মাটি থেকে কাপড়টা তুলে রেললাইন ধ'রে এগিয়ে গেলাম আমি।

' "রসের নাগর, লুকিয়ে প্রেম করতে যাচ্ছে।" পিছন থেকে মন্তব্য করল একজন, সবাই হেসে উঠল এক সঙ্গে।

'কোনদিকে না তাকিয়ে হাঁটতে লাগলাম আমি।'

'এবার আমাদের যাওয়া দরকার।' ঘড়ি দেখে গোপীকে বললাম আমি।

কিন্তু সেখানেই দাঁড়িয়ে পুলের দিকে তাকিয়ে থাকল গোপী। 'কিছুক্ষণ আগে একদল মেয়েকে চ'লে যেতে দেখে আমার আট বছর আগের ঘটনাটা মনে পড়ে গিয়েছিল। এখন বুঝতে পারছ কোন্ ভূত ভর করেছিল আমার ওপর?'

'ভুলে যাও ওসব। দেরি হয়ে যাচ্ছে। চলো যাই।'

আমার সঙ্গে সঙ্গে চার-পাঁচ পা হেঁটে আবার পিছনে তাকাল গোপী। আমার ফেলে-দেওয়া সিগারেটের টুকরো থেকে ধোঁয়া উড়ছিল।

কিছুদূর গিয়ে গোপীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'সেদিন রাতে তারপর কী করলে তুমি? কতদূর গিয়েছিলে?'

'বলব।' মাথার পাকা চুলে হাত বুলিয়ে মাথা নীচু ক'রে হাঁটতে হাঁটতে গোপী বলল, 'সে এক লম্বা কাহিনী।'

সেটা শোনবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে সিগারেট ধরালাম আমি।

গোপী বলল, 'আমি এগিয়ে যেতে থাকলাম। পিছনে ফেরায় বিপদ আছে, যদি আবার দেখা হয়ে যায় ওদের সঙ্গে। নতুন

জীবন পেয়ে খুশিই হলাম আমি। তার কথা ভাবলাম। ওকে দেখার জন্যে মনপ্রাণ ক্রমেই আকুল হয়ে উঠল। আমার নতুন জীবন তার কাছেই সমর্পণ করব, ঠিক করলাম মনে মনে। সেদিন পর্যন্ত এতখানি আত্মবিশ্বাস ছিল না আমার। কিন্তু তখন সেই-ই আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি ঠিক পৌঁছে যাব ওর দরজায়। কড়া নাড়ব, না হলে ডাকব চীৎকার করে। বাড়ির লোকজন দরজা খুলে দেখবে। আমি সত্যি কথাটাই বলব— ডাকাতদের হাত থেকে বেঁচে এসেছি। রাত্রে শোবার জায়গা চাইব। সে নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে থাকবে দরজার কাছে— মাথার চুল খোলা। তার কথা ভাবতে ভাবতে আমি পথ হাঁটার পরিশ্রমও ভুলে গেলাম।

'রেললাইন ছেড়ে কাঁচা রাস্তা দিয়ে ওর বাড়ির কাছের মাঠে পৌঁছে গেলাম আমি।

'যেন স্বপ্ন দেখছিলাম। নীল জ্যোৎস্নায় অবগাহন করছে বাড়িটা। বড় বড় আলো জ্বলছে। কথাবার্তা বলতে বলতে লোকে এদিক-ওদিক যাওয়া-আসা করছে। বিয়ের জন্যে বন্দোবস্ত হচ্ছে। ব্যাপার কী? কিছুক্ষণ এসব দেখে আমি বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়লাম। কেউ লক্ষ্য করল না আমাকে। বিবাহমণ্ডপের চারিধারে জমা হওয়া ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখলাম। আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে এক প্রৌঢ়ের গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছে সে⋯সেই ধুমধামে আমিও অংশ নিলাম।

'কেউই লক্ষ্য করল না আমাকে। সেখানে কেউই আমার পরিচিত ছিল না। খাওয়া-দাওয়া শুরু হ'ল। একটি তরুণ এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'আসুন— খেতে বসুন। প্রথম সারিতেই বসলাম আমি। সেটা মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে যাবারও মুখ।

'পরের দিন সকালের আগেই নিজের ঘরে ফিরে এলাম আমি। পরের মাসেই মালয় চলে গেলাম।'

গোপীর কাহিনী শুনে আমি শুধু 'হুঁ' শব্দ করলাম। আমার অনেক কথাই মনে হচ্ছিল। কিঞ্চিৎ সন্দেহও হ'ল। হয়তো গোপীর পুরনো প্রেমিকার কাছেই এখন আমি তাকে নিয়ে যাচ্ছি। বিয়ের আগে সে মাস্টারী করত কিনা সেটা ঠিক জানি না; কিন্তু গোপী তার চিঠিতে ভাবী বধূর যে-বর্ণনা দিয়েছিল তা ওই মেয়েটির সঙ্গেই মিলিয়ে। তবু গোপীকে আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না।

রেললাইনের থেকে রাস্তায় নামতে নামতে সন্ধ্যা হয়ে এলো। তার পরের রাস্তায় বাঁক নিতেই শঙ্কিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গোপী।

'কোথায় তুমি নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?'

আমি হেসে বললাম, 'গোপী, এসো আমার সঙ্গে। সব কথা পরে বলব।'

রাস্তা থেকে মাঠে নেমে সেই বাড়িটার দিকে তাকালাম আমরা।

বাড়িটার সামনে অদ্ভুত এক দৃশ্য চোখে পড়ল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে লোকজন বসে আছে চুপচাপ। ঘরের দক্ষিণ দিকে একটি মৃতদেহ সাজানো। বাঁ কাঁধে দড়ি, ডান হাতে শাবল নিয়ে ময়লা গামছা পরা কালো মোটা একটি লোক আমাদের সামনে দিয়ে মাঠ পার হচ্ছিল।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে মারা গেল?'

'ওই তো, কৈমলের বোনের মেয়ে। অসুখ বিসুখ কিছু হয় নি। কাল রাত্রে হঠাৎ…'

আমি গোপীর মুখের দিকে তাকালাম। ও যেন শ্মশানের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

অশ্রুর হাসি

ললিতাম্বিকা অন্তর্জনম

অশ্রুর ভাষা বোঝো— বেদনার লিপি ?— তাহলে লেখো। আমি কি বলব সেই গল্প ? কিছুদিন থেকেই চেপে রেখেছি মনে। কিন্তু আজ সে ছটফট করছে মুক্তির জন্যে। অনেকেই তৈরি হ'ল, কিন্তু এর উপযুক্ত মানসিকতা তো কারুরই নেই। তেমনি কাগজও নেই। অবশেষে এসেছি তোমার কাছে। ছায়ার আলো, সৌন্দর্যের হাসি, তুমিই বলো— উভয়কে যথার্থ বুঝে তাদের রূপদানে তুমি কি সমর্থ ?

কথা হ'ল···কোথায় অশ্রু ? তার দিন চলে গেছে। এখন মূল্য আছে শুধু ঘাম আর রক্তের। তোমরা অন্তত তাই বলবে। ঠিক আছে, আমার শরীরে যত রক্ত সব দিলাম তোমাকে। তবুও এক ফোঁটা অশ্রু। সেদিন মিনিও বলেছিল এই কথা—

'এক ফোঁটা চোখের জল আমাকে দিন ভাই। তার বদলে আমি দেব এক ঝলক হাসি। শুধু এক ফোঁটা চোখের জল ··'

ছিল না, অত লোক হওয়া সত্ত্বেও সেদিন শুধু সেই-ই ছিল না। সে প্রতীক্ষা করতে থাকল। সে হাসির মূর্ছনা ছাড়াই প্রতীক্ষা করতে থাকল। কষ্ট ! সে চলে যাবার পর ফুলের মতো হাসির মূর্ছনা ছাড়াই আমি পেলাম সেই বস্তুকে। সে চলে যাবার পর আকাশ উপুড় করে দিল। সেই বহমান ধারায় ভাসতে ভাসতে আমি চলেছি তার কাছে। যখন দেখা হবে তার সঙ্গে

চোখের জলের হাসি দিয়েই অভ্যর্থনা করব তার। আকস্মিক এসে পড়বে মিনি।

এবার মিনির বিষয় কিছু বলি। তার সম্পর্কে প্রশ্ন তুললে মুশকিলে পড়ব। সে কি আমার স্ত্রী? প্রেমিকা? কন্যা? না কি বোন? একটি পুরুষের জন্যে একটি মেয়ে নিশ্চয়ই এরই মধ্যে কোন-না-কোন সম্পর্কের হবে। কিন্তু মিনি আমার এ-রকম কেউই ছিল না। কিংবা সে ছিল আমার সবকিছু। তার কাছেই শিখেছিলাম ভালোবাসা কাকে বলে। ভালোবাসা— কোন বিকার নয়, যা ছড়িয়ে পড়ে অনুভূতি জুড়ে।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে একটা প্রশ্ন করে রাখি। নারীজাতি সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? মা, বোন, প্রেমিকাদের নিয়ে যে পরিমণ্ডল, তার সম্পর্কে? ছোটবেলায় আমার কবিবন্ধু ভাবত।

'নীলকমলের মতো দু'চোখ, কপোল যেন গোলাপ, কপালে চাঁদের আভা আর চুলে যেন বর্ষার মেঘ— সবকিছুর পরেও উত্তপ্ত এক স্পন্দন!' কথাটা কি ঠিক বলা হ'ল? আমার অনুভবে মার হৃদয়-স্পন্দন ছিল জীবন্ত। একবার। শুধু একবার। বোন যখন শ্বশুরবাড়ি গেল তার নিঃশ্বাসের উত্তাপও টের পেয়েছিলাম। বাকী সবই বরফের মতো ঠাণ্ডা— রঙিন খেলনার মতো মেকী।

এক মুহূর্তের খুশির জন্যেই ভালো। তারপর ছেড়ে দেব। মিনিকে দেখার পরও বহুদিন পর্যন্ত এ-কথা ভাবতাম।

এ-সব সত্ত্বেও রঙিন প্রজাপতির মতো রক্তে আলোড়ন তোলা মেয়েদের দেখে চাঞ্চল্য বোধ করবে না এমন কে আছে? কিশোরী, হ্যাঁ, কিশোরীদের সম্পর্কেই বলছি। এগারো থেকে পনেরো বছর পর্যন্ত বয়সটা কৈশোর আর যৌবনের সুন্দর সামঞ্জস্য ফুটিয়ে

তোলে। মুক্তোর চেয়েও পবিত্র এই জীবনের দিকে হেলিয়ে দেয় তার তর্জনী··· একটা মন্দ প্রকাশ। স্ফটিক পাথর ভেঙে ফেলার জন্যে তার একটি আঙুলের আচমকা চাপই যথেষ্ট। ভেঙে পড়া —হা! তার ভয়ানক বিস্তার কী চারিদিকে দেখছি না আমরা? কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। আমরা নিজেকেও বিশ্বাস করতে পারি না। মিনি একদিন বলেছিল, 'একবার বলুন তো কাউকে বিশ্বাস করেন আপনি! বিশ্বাস ক'রে ভালোবাসেন···।'

সেদিন আমি বলতে পারি নি কিছু। সেদিন পর্যন্ত ওকে আমি বিশ্বাস করি নি। হয়তো— এই অন্তিম মুহূর্তে সমস্ত শিরাস্নায়ু জুড়ে চীৎকার উঠছে— 'মিনি আমি একজনকে বিশ্বাস করি। তাকে ভালোবাসি। এই পৃথিবীতে ভালোবাসার জন সেই একজনই ছিল। সেই ছিল অশ্রুর হাসি, ছায়ার আলো। তাকে— শুধু তাকেই— আমি ভালোবেসেছিলাম। তার অজান্তেই আমি তাকে ঠকিয়েছি—আমি অপরাধী, তা না জেনেও ক্ষমা করো।'

ঠিক জানি না, কবে থেকে মেয়েদের ঘৃণা করতে শুরু করি আমি? মার মৃত্যুর পর, বোন শ্বশুরবাড়ী চলে গেলে, সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়লাম আমি। পাঠান্তিক নিরাশ বন্ধু-বান্ধবদের সান্নিধ্য-অভাব আমাকে ঠেলে দিল আরো লেখাপড়ার দিকে। অধ্যয়নের মধ্যেই শুরু হ'ল আমার জীবন। ঘুরে বেড়ালাম লাইব্রেরী থেকে লাইব্রেরীতে, গ্রন্থ থেকে গ্রন্থে। ধর্ম, শাস্ত্র, শিল্প, বেদান্ত ইত্যাদি আমার গ্রহণ-ক্ষমতাকেও ছাড়িয়ে গেল। অনেকেই বলল পড়তে পড়তে পাগল হয়ে যাবে ও। কিন্তু তাতেও নিরস্ত হলাম না আমি, ভিতরে ভিতরে আরো শক্ত আর দৃঢ় হলাম। কী দেখেছিলাম আমি? দিনের তীব্র সূর্যালোকে,

চাঁদের ঠাণ্ডা জ্যোৎস্নায়, কাঁচের চেয়েও স্বচ্ছ ঝিলের জলে— সর্বত্রই এক ছায়া। ছায়ায় ঘৃণা জন্মে গিয়েছিল আমার। কেননা আমি ভয় পেতাম ছায়াকে। সে-জন্যে যে-রূপ সৃষ্টি করে ছায়া তাকেও ঘৃণা করতাম। ছায়া ভিন্ন কি রূপ আছে? আমি কখনো পিছনে তাকিয়ে দেখি নি। সব আলো নিবিয়ে নগ্ন আঁধারে ছড়িয়ে দিলাম চিন্তার সর্বস্ব। মাত্র একটি বস্তুই ছায়া সৃষ্টি করতে পারে না— অন্ধকার, ঘন অন্ধকার!

অনেক দিন কেটে গেল। ছায়ার প্রতি এত বেশি মায়া আমি একজনেরই দেখেছি। সে মিনি। যত বিরক্তিতে ছায়ার সঙ্গ এড়িয়ে চলতাম আমি ঠিক ততখানি ভালোবাসায় তার সঙ্গে খেলা করত ও। এমন বৈপরীত্য সত্যিই অদ্ভুত। আবার এমন দু'জনই ভালোবাসবে পরস্পরকে। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না— ছায়া আর প্রকাশের মিলন সত্যিই স্বাভাবিক ছিল।

আমার বন্ধু··· আমার বন্ধুর সংখ্যা বেশি ছিল না। তবু আমি তাকে বন্ধুই ভাবতাম। ঘরের বড় বইয়ের আলমারীটাও আমার বন্ধু। যেসব ঘরে বইয়ের আলমারী আছে সেসব ঘরই আমার বন্ধু। কিন্তু তা শুধুই হাসবার, খেলবার, কফি খাবার জন্যে নয়। সেসব ঘরের লোকজন সবাইকেই আমি চিনতাম না। এক হিসেবে মিনিই বন্ধু করে নিল আমাকে।

একটা হঠাৎ-ভুলের ফলেই এ-রকম হয়েছিল।

সেই ঘরে সেই প্রথম আমি গেছি। একটি সভায় গম্ভীর বাদানুবাদের পর বাড়ি ফেরার সময় বন্ধু বলল, 'ওই যে সবুজ ফাটকওলা বাড়ি দেখছ ওটাই আমার বাড়ি। চলো, একটু কফি খেয়ে যাবে।' ওর প্রস্তাবে চুপচাপ সম্মতি দিতে হ'ল আমাকে।

পড়ার ঘরে আমাকে বসিয়ে বন্ধু চলে গেল ভিতরে। মেজেয় রাখা একটা মোটা বই চোখ টেনে নিল। মনোবিজ্ঞানের বই। বিশ্বখ্যাত এক মহান ব্যক্তির কয়েক বছরের চেষ্টার ফল। একটুক্ষণ চিন্তা করলাম আমি, তারপর মাথা ঘোরাতেই পিছন থেকে একটি স্বর ভেসে এলো, 'না ভাই, না। নড়িয়ো না ওকে। এই যাঃ, আমার সব ছবিগুলোই তো নষ্ট করে দিলে!'

চম্‌কে উঠলাম আমি। ভয়ও পেলাম কিছুটা। ঘরে তো কাউকে আসতে দেখি নি! কোন গলাও শুনি নি! তাহলে··· তখনই মেজের ছায়ায় দাঁড়ানো একটি ছোট মেয়ের ওপর চোখ পড়ল। দেখি, তার হাতে একটা নীল রঙের পেনসিল। নাকটি তার দেয়ালে আঁকা অসম্পূর্ণ ছবির মতো। মাথা বেঁকা, বিকৃত বাঁ হাত · তার মাথাটুকু ছাড়া আর সবই আমার শরীরের ছায়ার সঙ্গে মিশে গেছে।

আমার খুব হাসি পেল। হাসতে হাসতে দম বেরুনোর জোগাড়।

হাসি শুনে লজ্জায় পালিয়ে যাবার উপক্রম করল সে। তাড়াতাড়ি ওকে ধরে ফেলে সান্ত্বনা দিলাম আমি।

'এসো, এসো। আমি আবার আগের মতো মাথা হেঁট করে বসছি। এই দেখ··· এটা ছিঁড়ে ফেলছি··· ইস্! কী সুন্দর ছিল ছবিটা। আমি খারাপ করে দিলাম।'

ও কিছু বলল না। লজ্জায় দু'হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

'কী গো মেয়ে, এইভাবে ঘরে বসা লোকদের ছবি আঁকো বুঝি?' জিজ্ঞেস করলাম।

'না··· না··· এখানে তো শুধু দাদাই বসে। কী যে মজা লাগে দাদার ছবি আঁকতে। কখনো ঘোড়ার মতো··· কখনো···।'

সশব্দে হেসে উঠলাম আমি, 'দাদার ছায়া ঘোড়ার মতো। তো আমার ছায়া নিশ্চয়ই গাধার মতো?··· ছায়া দেখতে ভয় লাগে না তোমার?'

'কিসের ভয়?'··· মাথা তুলল সে, 'ছায়া দেখে ভয় পাব কেন? সবারই তো ছায়া থাকে। ছায়ার সঙ্গে খেলা করতে কী মজা যে লাগে।'

মাথা দুলিয়ে বলল সে। চোখে আর সঙ্কোচ নেই। মনের মতো কথাবার্তা শুনে এখন সে নিজেও মুখ খুলেছে।

'ছায়ার সঙ্গে কিভাবে খেলতে হয় জানো তো? আমি দেখাচ্ছি। ওই দেয়ালের দিকে তাকাও। আমার মুখের দিকে তাকাবে না। দেয়ালে··· আরে দেখ না··· একটা ঘোড়া লাফাচ্ছে।··· দৌড়াচ্ছে··· ঘোড়ার ওপর একটা সেপাই এসে বসল!'

আঙুলগুলো অদ্ভুতভাবে নাড়াচ্ছিল সে। ছায়ার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল বাস্তবিকই ঘোড়া দৌড়চ্ছে।

মাথা ঝুঁকিয়ে, চুলগুলো সামনে এনে একটা হাতীর ছায়া তৈরি করল সে। তারপর বাঁদর নাচ দেখাল··· চার-পাঁচ মিনিট এইভাবে দেখিয়ে অতৃপ্ত হাসি হেসে বলল, 'এসব তো খুবই সোজা। এরপর কিছু দেখাতে হলে দাদাকে দরকার। আমি দাদার সঙ্গে ছায়ার মধ্যে ঝগড়া করব। সার্কাস দেখবে··· তোমার বোন কি এত জানে?'

'আমার তো বোন নেই।' দুঃখের গলায় বললাম আমি, 'থাকলেও এসব শেখাতে পারতাম না। তুমি আমার ছোট্ট বোনটি হবে?'

সে বলল, 'বাড়িতে সবাই আমাকে ছোট্ট বোনটি বলে ডাকে।

কিন্তু আসল নাম তো 'মিনি'। আমার নিজের নামই শুনতে ভালো লাগে।' আমি কি ওকে মিনি বলে ডাকব।

'আরে! এর মধ্যেই বোনটির সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল তোমার?' বন্ধুর গলা পেলাম, 'এই মেয়েটা দেখছি কাউকেই ভয় পায় না। তোমাকেও বোধহয় ছায়া-বিশারদ বানাবার চেষ্টা করছে?'

আমি বললাম, 'না। মিনি বলছিল ছায়াকে ভয় পাবার কিছু নেই। এইটুকুই বোঝাল যে আমারও ছায়া আছে। সে ছায়া অন্যের ছায়ার সঙ্গে ঝগড়াও করবে। মিনি, তোমার দাদার মতো আমি ঘোড়া বা গাধা হতে পারব না। তোমার মতো বাঁদরী হওয়াও মুশকিল!'

মিনি খুব তাড়াতাড়ি বদলে গেল। তারপর কাঁদো কাঁদো মুখে হাসি এনে বলল, 'আমি কি বাঁদরের বাচ্ছা!' তারপর ছুটে পালাল।

ও চলে যাবার পরও মুক্তোর মতো ঝকঝকে ওর চোখের জল আর হাসির শব্দ বনান্তরের ঝর্ণার মতো গুঞ্জন তুলল সারা ঘরে। বন্ধু হেসে বলল, 'ভীষণ দুষ্টু। যখন-তখন কাঁদে, হাসে বা রেগে যায়··· একটিই বোন তো! আমরা সবাই ওকে খুব ভালোবাসি। ও না থাকলেই বাড়ি অন্ধকার। বাচ্চারা না থাকলে বাড়িকে বাড়ি বলে মনে হয় না, তাই না?'

আমি কিছু বললাম না। বইপত্তর নিয়ে আলোচনা করলাম। রাজনীতিও এসে পড়ল। তারপর খুশি মনে ফিরে এলাম বাড়ি। জীবনে এই প্রথম ভালোবাসা স্পর্শ করে গেল আমাকে।

তখন থেকেই মিনির বাড়ি আমারই বাড়ি হয়ে গেল। তার মা-বাবাও আমাকে নিজেদের লোক ভাবতেন। পারিবারিকভাবে ঠিক এতখানি ভালোবাসার স্বাদ আগে পাই নি। মনোবিজ্ঞান-

নির্ভর আমার বিশ্বাসগুলো একটু শিথিল হয়ে এলো। মিনি হয়ে গেল আমার পর্যবেক্ষণের বস্তু। ক্রমশ তার এক-একটি রূপ উদ্ভাসিত হ'ল আমার চোখে। এক-একটি পরিবর্তন···যে-হেতু মেয়ে···ফ্রক ছেড়ে স্কার্ট আর ব্লাউজ ধরল। তার ছায়াও দীর্ঘ হতে শুরু করল। হাবভাবও বদলাতে লাগল। প্রাইমারি স্কুল ছেড়ে সে গেল হাই স্কুলে। তবুও কোন বাধা সৃষ্টি হ'ল না আমাদের মধ্যে। মিনি আমাকে 'বড়দা' বলে ডাকত। ওর যত প্রশ্নের জবাব দিতে হ'ত আমাকেই। স্কুলে শিক্ষিকা একটা অঙ্ক বুঝিয়ে দেন নি, সেটা ভুল হয়েছে, সেজন্যে মারা কি ঠিক? মারীকুট্টি আর জান-এর ঝগড়ায় কার পক্ষ নেওয়া উচিত? এ-রকম অনেক কথা। কিন্তু বইয়ে নেই এমন প্রশ্নের জবাব দেবার সাধ্য আমার ছিল না। মিনি যদিও ভাবত বড় বড় বই পড়ার জন্যে আমি সবই জানি।

মিনি আর আমার মধ্যে ঝগড়াও লাগত। আমি বলতাম মেয়েরা আকাট মূর্খ আর পরনির্ভর হয়। পুরুষের ষাট ভাগ বুদ্ধিও তাদের থাকে না। তাদের কপালে চাঁদের আলো ছাড়া আর কী আছে?'

ঝোঁক বুঝে মিনি বলত, 'চাঁদের আলো কি কম নাকি? দাদা। জ্যোৎস্নার ছায়া কি দেখেছ তুমি কখনো? চাঁদনী রাতের··' জিজ্ঞেস করত সে।

'পুরুষের মাথায় কি আলোর বদলে ঘন অন্ধকার ভরা? নাকি কড়া রোদ?'

এইভাবে চলত আমাদের খুনসুটি। একদিন সে জিজ্ঞেস করল, 'এখন তোমার ধারণায় মেয়েরা কী?'

'জ্যোৎস্নার ছায়া।' ঠাণ্ডা গলায় বললাম আমি।

নম্র গলায় আমাকে শুধরে দিল সে, 'না, দাদা, অশ্রুর হাসি। এই শব্দটাই উপযুক্ত।'

মেয়েরা সত্যিই কত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়। যে দূরত্ব পেরুতে পুরুষদের লাগে ছ' বছর, ছ' মাসেই একটি মেয়ে সেই দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। একটা খবর-কাগজের চাকরি নিয়ে বছর দুয়েক বিদেশে কাটাতে হ'ল আমাকে। ফিরে এসে দেখি ওদের বাড়ির কাপড়.শুকোবার তারে স্কার্টের বদলে শাড়ি ঝুলছে। বাড়ি জুড়ে একটা অস্বাভাবিক মৌনতা। মিনির জন্যে কেনা মিষ্টির ঝুড়ি দেখে হেসে ফেলল বন্ধু, 'সম্পাদক মশাই, আপনি নিশ্চয়ই এত বোকা নন? মিনি কি এখনো সেই খুকীটি আছে! তোমার মাথার ঠিক থাকলে মিষ্টির বদলে ওর জন্যে একটা ভালো বর খুঁজে আনতে। এখন অবশ্য সেটাও দেরি হয়ে গেছে। সামনের মাসে পনেরো তারিখে ওর বিয়ে। ব্যাপারটা কী হে, তুমি ওখান থেকে একটা চিঠি পর্যন্ত লিখলে না?'

আঙুলটা দাঁতে কামড়ে ধরলাম আমি। মিষ্টির ঝুড়িটা পড়ে গেল হাত থেকে। আজ থেকে মিনি তাহলে আর মেয়ে থাকল না? সে কারুর স্ত্রী হয়ে যাবে? কিন্তু আমি একটি ছোট বোন কোথায় পাব?···মিনির সঙ্গে দেখা না করেই ফিরে এলাম বাড়ি। আমি কি সত্যিই ওকে আর দেখতে চাই নি?···পরিবারের নিকটতম বন্ধু হিসেবে মিনি এবং তার মায়ের সঙ্গে সম্ভবত দেখা করতে পারতাম। অবশ্য তখন আমাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করত একটা রেশমের শাড়ি···কালো পাড়-দেওয়া রেশমের শাড়ি। আমার মিনি যদি কোনদিন বড় না হ'ত···যদি···

নিমন্ত্রণ করা সত্ত্বেও মিনির বিয়েতে গেলাম না আমি। ওর স্বামী একজন পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টর। মোটাসোটা আর বড়লোক। মিনি শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। আমি কি ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম ?— না। সে-বয়সে ওকে আমি কখনো দেখিনি···তবু।

শুষ্ক আর নীরস শাস্ত্রপাঠের দিন এসে গেল। ছ' মাস···এক বছর, না কি আরো বেশি···? এইভাবে কেটে গেল অনেকদিন।··· মিনির সঙ্গে আর দেখা হ'ল না।

একটা রাজনৈতিক সভায় গুলিগোলা চলল। আমার বন্ধু সেই দুর্যোগে মারা গেল। আর, নিজের ভগ্নীপতিরই গুলি খেয়ে। তার শবদেহ বাড়িতে পৌঁছে দেবার ভার পড়ল আমার ওপর। আসন্নপ্রসবা মিনি তখন বাড়িতে। বুড়ো মা-বাবা···সেই করুণ দৃশ্যের বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বজ্রাঘাতে স্তব্ধ মা-বাবার সামনে, প্রাণের চেয়ে প্রিয় ভাইয়ের শবদেহের সামনে···মৃত্যুর সেই পরিবেশে যুবতী মিনিকে দেখলাম আমি। সে কাঁদল না। অজ্ঞানও হয়ে পড়ল না। মাটির মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে থাকল শুধু। ভাইয়ের বুকের রক্তের দিকে তাকিয়ে থাকল এক দৃষ্টিতে। এই নৃসংশ কাজের জন্যে দায়ী তার স্বামী। তার গর্ভে যে-শিশু বড় হচ্ছে ক্রমশ তার বাবা···

'মিনি···!'

'দাদা!' চমকে উঠল সে, 'দাদা···আমার বড়দা···তাহলে সকলের সব কথাই মিথ্যে। আমার দাদা মরে নি। আমার স্বামী দাদাকে মারে নি। আমার দাদা আছে— আমার চিরকালের দাদা আছে— আমার চিরকালের দাদা আছে। নেই দাদা ?···বলো ?'

'আছে।' জোর গলায় বললাম আমি। শুধু ওকে শান্ত

করার জন্যেই নয়। হ্যাঁ···আমারও একটি বোন চাই। চাই মুমূর্ষু এই জীবনকে জাগিয়ে তোলার জন্যে। চিন্তার মুক্তির জন্যে। মিনি ছাড়া আর কেউই এর উপযুক্ত নয়।

বন্ধুর সুন্দর আর মজবুত দেহটি মরে পড়েছিল পালঙ্কে। আমি একবার সেদিকে তাকালাম, একবার মিনির কাতর চোখের দিকে। মিনির চোখের এই দৃষ্টি কি তার ভাই সহ্য করতে পারত!··· আমি ছোট বোনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওর এলোমেলো চুল ঠিক করে দিলাম। 'কেঁদো না, মিনি। লক্ষ্মী বোনটি, কেঁদো না। এই তো তোমার দাদা আছে। ছু' ভাই মিলে এখন এক হয়ে গেছি। এ-কথা তোমার দাদাই বলছে, কেঁদো না···।'

মিনির গলা বুঁজে এলো। আমার বুকের কাছে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকল যেন মুষলধার বৃষ্টিতে পাখির ছানা তার মায়ের ডানার আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে।

চোখের জলে আর্দ্র, গলা কাগজের মতো তার গালে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চুম্বন করলাম আমি। দুঃখীর জন্যে দুঃখীর চুম্বন। জীবন আর মৃত্যু উভয়েরই সান্ত্বনা। সেই চুম্বন সম্পর্কে তোমরা অনেক কথা বলতে পারো। বদমাইস··· চরিত্রহীন··· যা ইচ্ছে তোমাদের বলতে পারো। তবু সেটাই গর্ব।··· ওর ভাইয়ের হত্যাকারী ইন্‌স্‌পেক্টরও দেখেছিল সেই দৃশ্য।

মিনি! আমার আদরের ছোট বোনটি। তোর জীবনে এত বড়ো পরিবর্তন হবে এটা আগেই যদি আমি জানতে পারতাম··· জানতে পারতাম··

গল্প এইখানেই শেষ। মিনির বিষয়ে আর কিছু বলতে চাই না। তোমার কলমে যতক্ষণ কালি আছে, যতক্ষণ চিন্তায় ছেদ পড়ছে না কোন, তুমি লিখে যাও। আমি কি তার প্রেমিক! লোকে হয়তো তাকে বেশ্যা বলবে! যা মন চায়, লেখো। আমার কোন বক্তব্য নেই। সেও কিছু বলবে না। হত্যাকারী সেই ইন্স্‌পেক্টর সন্দেহ করেছিল ওকে, মারধোর করেছিল, বন্দী করে রেখেছিল। সে কোন নালিশ করে নি। স্বীকারও করে নি। পরমা পবিত্র স্ত্রীর মতো নীরবে সব কিছু সহ্য করে চলে গেল পৃথিবী থেকে।

পুরানো ছায়ার ছবিতে ভরা ঘরে, যে-খাটে তার ভাইকে শোয়ানো হয়েছিল, সেই খাটের ওপরেই মিনিকে শায়িতা দেখলাম আমি। ঠোঁটজুড়ে ঝিলিক দিচ্ছে সেই পুরনো হাসি। সহস্র অশ্রুবিন্দু জমে গড়ে-ওঠা সেই হাসি··· আমাকে দেখেই সে জিজ্ঞেস করল, 'বড়দা! এই মেয়েটি কেমন?'

আমায় গলা কেঁপে উঠল, আমি ওর কথায় সায় দিলাম।

'এই-ই সেই অশ্রুর হাসি, বোন!'

'শুধু মেয়েটিই নয়, হয়তো পুরুষটিও।'

পলাতকা

কারুর নীলকণ্ঠ পিল্‌লে

ট্রেনে চড়ে কোথাও যাবার সময় জানলার ধারে বসতে বেশ মজা লাগে। বিশেষত কোল্লম থেকে চেংকোট্টা পর্যন্ত পথটুকু। জমিতে কর্মরত মানুষ, পাহাড় ইত্যাদি দেখে বেশ একটা আনন্দের অনুভূতি হয়। রেল লাইনের ধারের ঘরবাড়ি, মাঠ-চরা গরু, রেলগাড়ির আওয়াজ শুনে ছুটে আসা হাসিখুশি বালক— এইরকম কিছু কিছু দৃশ্য গাড়ির গতির সঙ্গে তাল রেখে হঠাৎ-হঠাৎ আবির্ভূত হয় চোখের সামনে আর তেমনি হঠাৎই অদৃশ্য হয় আবার। এসব দৃশ্য কি সত্যিই ভালো লাগে না আমাদের? সবুজ ক্ষেতের মাঝে-মাঝে খালপথ, কখনো বা লাইনে হাতুড়ি-চালানো মানুষ, কখনো দূরে, কখনো উল্টো রাস্তার যাত্রী রেল মজুরদের শাবল দিয়ে রেলকে প্রণাম করার ধরন দেখতে খুবই ভালো লাগে আমার। ঘন জঙ্গল, আকাশের সঙ্গে আলাপরত পাহাড়, হাতীর মতো বিশাল প্রস্তরখণ্ড— এ-সবের নিশ্চল দাঁড়িয়ে-থাকার দৃশ্য কাকে না সন্তুষ্ট করে! ধূ ধূ নিষ্প্রাণ প্রান্তর ছাড়িয়ে গাড়ি যখন অন্ধকার সুড়ঙ্গের দিকে ধাবিত হয়, যাত্রীদের মন তখন ছম্‌ছম্ করে ওঠে। সুড়ঙ্গের শেষে পুনরায় আলোর সমাগমে মনে যে-প্রসন্নতার সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে পুনর্জন্ম লাভের তুলনা করা যেতে পারে। সে-আনন্দের পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

জানলার পাশে বসবার জায়গা পেলেই সৌন্দর্য আস্বাদনের ধরন পাওয়া যায়। আমি বসেছিলাম বেঞ্চের মাঝামাঝি জায়গায়।

প্রচণ্ড ভিড় গাড়িতে। বাঁদিকে ডানদিকে, ওপরে নীচে, সামনে পিছনে— সর্বত্র গিসগিস করছে মানুষ। খুব জোরে জোরে কথা বলছে যাত্রীরা। আমার ঠিক পাশেই বসে একজন অপরিচিত ব্যক্তি, কিন্তু কে কার পরোয়া করে! তাদের মধ্যে এমনকি পারিবারিক প্রসঙ্গ নিয়েও আলোচনা চলছে। আমি একা। না পারছি কারুর সঙ্গে কথা বলতে, না পারছি অন্যের আলোচনায় নাক গলাতে।

জানলার পাশে জায়গা না পেলে সঙ্গে একটি বই থাকা অবশ্যই জরুরী, কিন্তু আমার কাছে কোন বইও ছিল না। পরের স্টেশনে গাড়ি থামতে আমি একটা খবরের কাগজ কিনে নিলাম। সাধারণত লোকে পাঁচ-দশ মিনিটেই কাগজ পড়া শেষ করে, কিন্তু আমি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলাম কাগজ। প্রতিদিনের মতো 'নিরুদ্দেশ' স্তম্ভটি পড়লাম। তারপর ক্রমান্বয়ে 'রাজধানী থেকে কালিকাব', 'দুষ্টজনের বেয়াদপি', 'বিপজ্জনক পুল' ইত্যাদি সব কিছুই পড়ে ফেললাম। সম্পাদকীয়ও পড়লাম। 'নিরুদ্দেশ' শীর্ষক স্তম্ভটি পড়লাম বার তিনেক। গোড়ার দিকটা খুবই ভালো। সেখানে এক পলাতকা স্ত্রীর খবর ছিল। যে তার খবর দিতে পারবে পুরস্কার দেওয়া হবে তাকে। বয়ানটি ছিল এইরকম— 'সন্ধানদাতা যেন টিকিট কেটে তাকে আন্দামানে পাঠিয়ে দেন। সন্ধানদাতাকে টিকিটের মূল্য ও পুরস্কার হিসাবে দু'শো টাকা দেওয়া হবে।' এ-রকম মূর্খ স্বামীর হাত থেকে নিষ্কৃতি-পাওয়া স্ত্রীর জন্য গর্ব হ'ল আমার। পলাতকা স্ত্রী এবং প্রতীক্ষারত স্বামী— দু'জনে আমাকে চিন্তান্বিত করে তুলল।

পরের স্টেশনে গাড়ি পৌঁছলে যাত্রীদের ওঠানামা ও উচ্চগ্রাম

কথাবার্তার মধ্যে আমি সেই স্বামী-স্ত্রীর ব্যর্থ বিবাহিত জীবনের এক ছবি নিজের কল্পনায় দেখতে লাগলাম। এই সময় সকলেই চুপ করে গেল একসঙ্গে আর সকলেরই দৃষ্টি গিয়ে পড়ল দরজার বাইরে ঝগড়ার দিকে। দু'জন লোক গাড়িতে উঠতে চাইছে আর তাদের বাধা দিচ্ছে একজন স্ত্রীলোক। বসবার জায়গা না পেয়ে সে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। ঝগড়াটা চলল অনেকক্ষণ ধরে। শেষে সেই স্ত্রীলোকটি বলল, 'গতবার তোমাদের মতোই একটা লোক আমার তিনশো টাকা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।'

কথাবার্তা না বলে পুরুষ দু'জন তখন চলে গেল অন্য কামরার দিকে। গাড়িও চলতে শুরু করল। আমার পিছনে বসে থাকা লোকটি বলল, 'ওর কথাগুলো শুনলে? কে বলো তো?'

অন্য একজন বলল, 'এ-ধরনের লোকের কাছে হার মানতেই হয়।'

'তুমি হলে কী করতে?'

'টাকা চাইলে দেব।' চশমা-পরা লোকটি বলল, 'কিন্তু আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে থাকতে হবে।'

কথাগুলো মহিলার কানে গেল না, সে দাঁড়িয়ে ছিল অনেক দূরে। চশমা-পরা লোকটি আর তার সঙ্গী তারপরেও অনেকক্ষণ এ-কথা সে-কথা নিয়ে আলাপ চালালো। তারা বসেছিল আমারই কাছাকাছি। মনোযোগ না দিলেও তাদের কথাবার্তা কানে আসছিল আমার। কেন জানি মনে হ'ল ওই চশমা-পরা লোকটিই পলাতকা স্ত্রীর স্বামী। স্ত্রী পালিয়ে যাওয়া পর্যন্ত লোকটি ছিল বোকা। এ-রকম আত্ম-প্রশংসা আমি এ-পর্যন্ত শুনি নি। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপিয়েই লোকটি বেরিয়ে

পড়েছে স্ত্রীর খোঁজে। এমন নির্বোধ লোকের স্ত্রীর প্রতি স্বভাবতই সহানুভূতি জাগল আমার। রাস্তার দু'দিকের বিলীয়মান প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে না পাওয়ার জন্যে এখন আর আমার দুঃখ হ'ল না। পড়ার জন্যে সঙ্গে বই না থাকাতেও আর ক্ষোভ হ'ল না। পলাতকা স্ত্রী আর তার নির্বোধ স্বামীর চেয়ে সুন্দর গল্প আর কী হতে পারে!

চশমা-পরা লোকটি এক স্বাস্থ্যোজ্জ্বল নবীন যুবক। তার স্ত্রীকে কেউ দেখেছে কি না এ-খোঁজ সে কারুর কাছেই নিচ্ছে না। তার চেহারাতেও কোন দুঃখ ফোটেনি। লোককে তাক লাগিয়ে দেবার জন্যেই খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপিয়েছে। এতে কোনই সন্দেহ নেই যে ওই বিজ্ঞাপনটি হস্তীর হস্তিনী নিধনের মতো ব্যাপার। মার সইতে সইতে সে বেচারী প্রাণ দিল ঝিলের জলে। মনে হয় ব্যাপারটা সে জানে। পুলিশের হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে ঘটনাটা ছাপিয়ে দিয়েছে কাগজে। জিজ্ঞেস করলেই ওর নামটা জানা যেতে পারে।

পাহাড় থেকে নেমে গাড়ি যাচ্ছিল সমতলের ওপর দিয়ে। এই পথে যেতে-যেতে কিছু যাত্রী নেমে গেছে আবার নতুন কেউ কেউ উঠেছে। যারা এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল তারা বসার জায়গা পেয়েছে, যারা বসেছিল তারা আরো গুছিয়ে বসেছে। চশমা-পরা লোকটি কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে বাঙ্কের ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে-থাকা সেই মহিলা ঠিক আমার সামনে এসে বসল। বুঝতে পারলাম সে একা। কিছুক্ষণ আগেই তার মেজাজ আমি লক্ষ্য করেছি। কারুর চেয়ে কম যায় না। গায়ে একটু ছোঁয়া লেগেছিল বলে এই খানিক

আগেই দু'জন পুরুষকে সে ধমকে অন্য কামরায় পাঠিয়েছিল, এখন আবার পুরুষদের মাঝখানেই বসে আছে। ওর দু' পাশের লোকদুটিও অপরিচিত, উঠেছিল চেংকোট্রা স্টেশনের পরে। যুবতী গাড়ি ধরেছিল কোট্রারকোরা স্টেশন থেকে।

চশমা-পরা লোকটি চুপ করে যেতেই আমার সমস্ত নজর ওই স্ত্রীলোকটির ওপর পড়ল। 'নিরুদ্দেশ' অংশটি খবর-কাগজে আর-একবার পড়লাম। বয়স প্রায় মিলে যাচ্ছে, আর স্ত্রী যে সুন্দরী সেটা লেখাই ছিল। সে-লক্ষণও মিলে যাচ্ছে এখানে। রঙও প্রায় সেইরকমই। আমার মনে হল পুরস্কার হিসেবে ঘোষিত টাকাটা আমিই পেয়ে যাব! হেসে ফেললাম আমি। পলাতকা স্ত্রী এইখানেই। আর তার অনুসন্ধানকারী চশমা-পরা লোকটি শুয়ে আছে ওপরে। একজন স্বামী, অন্যজন স্ত্রী। যদি সত্যি সত্যিই এ-রকম ঘটে যায় তাহ'লে…

নাঃ! এরকম হবার কোনই সম্ভাবনা নেই। মুখোমুখি না দেখলেও মেয়েটির গলার স্বর নিশ্চয়ই তার কানে গেছে। স্ত্রীর গলার স্বর কোন্ স্বামীই না চিনতে পারে? অবশ্যই এদের মধ্যে কেউ একজন খবরটা ছাপিয়েছে। কিন্তু সে কোন্‌জন? তার ঠিকানা একমাত্র সেই স্ত্রীই বলতে পারে। যেমন স্বামী, তেমনি স্ত্রী। এমন বুদ্ধিমতী স্ত্রী কখনোই অমন পুরুষের সঙ্গে ঘর করতে পারে না। যে-স্বামী এই ধরনের আচরণ করে সে মূর্খ ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এই কারণেই পলাতকা স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করার জন্যে খুঁজতে বেরিয়েছে সে।

হয়তো গোড়ায় সে বলেছিল, 'যেতে চাও যাও। যা ইচ্ছে করো।'

তারপর হয়তো স্ত্রী ভেবেছিল, চীৎকার চেঁচামেচিতেও যদি ওর লজ্জা না হয়, তাহলে তার নিজের পক্ষেই চলে যাওয়া ভালো।

আমার সামনে যে স্ত্রীলোকটি বসে আছে কথাবার্তায় সে কারুর কাছে হার মানবার নয়। সে পুরুষের সমান শক্তিই ধরে। এমন স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে তার দুঃখী স্বামীর অবস্থাটা দয়ার উদ্রেকই করে··।

নিশ্চিত করে কিছু বলা সত্যিই মুশকিল। হতে পারে পুরুষটি প্রবল-পরাক্রম। দিন দু' তিন বাইরে-বাইরে ঘুরে ব্যাপারটা খেয়াল হতে স্ত্রীটি ভয় পেয়ে গেছে। অনুসন্ধান করে যে খবর দিতে পারবে সে পুরস্কার পাবে, শুধুমাত্র এই লোভেই অনেকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়বে। এর মধ্যে কারুর না কারুর ফাঁদে সে পড়বেই। কখনো কখনো এমনও হয়, অনুসন্ধান করে যে খুঁজে বার করবে পুরস্কারের রূপে মেয়েটির সঙ্গেই জড়িয়ে পড়বে সে। যদি এমন হয় তাহলে ভাগ্য ভালোই বলতে হবে— একটা ফয়সালা হ'ল, আবার লোকের চোখে ধুলোও দেওয়া হ'ল।' নাঃ, স্বামীটি সত্যি সত্যিই বুদ্ধিমান।

আমার সামনে যে বসে আছে সে-ই সেই পলাতকা স্ত্রী। এই কামরার আর কেউই সে-কথা জানে না। আমিও কাউকে তা জানাব না। পলাতকা স্ত্রীকে খুঁজে বের করার খ্যাতিও আমিই পাব। মাদুরা স্টেশনে ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তাকে পুলিশের হেফাজতে তুলে দেব। তারপর টেলিগ্রাম পাঠাব স্বামী ভদ্রলোকটিকে। নিতান্তই পুরস্কারের টোপ নয়, স্ত্রীর আর না ফেরার কোন মতলব যদি স্বামীটি ক'রে থাকে, তাহ'লে

আমার এ-কাজে মাথায় বাড়ি পড়বে তার। এইভাবেই ওর চালাকি বের ক'রে দেওয়া যাবে।

একটানা আমার চোখের দৃষ্টি থাকল তার দিকে। খানিক বাদে সে আমি যে বেঞ্চিতে বসেছিলাম, সেখানেই উঠে এলো। হেসে-হেসে কথা বলতে লাগল। খুব মন দিয়ে আমি ওর কথাবার্তা শুনতে লাগলাম। ওপরের বাঙ্কে ঘুমিয়ে-থাকা চশমা-পরা লোকটিকে দেখে সে বলল,

'ওই লোকটি এখনো বিয়ে করে নি। মঙ্গলসূত্র বানাবার সোনা দিয়ে নিজের দাঁত বাঁধিয়ে নিয়েছে।'

আমি চমকে উঠলাম। কথাটার অর্থও অবশ্য বোধগম্য হ'ল সঙ্গে সঙ্গেই। ওপরে যে-লোকটি শুয়ে আছে খানিক আগেই সে 'আমি হলে দেখিয়ে দিতুম' গোছের বাহাদুরি দেখিয়েছিল। মহিলাটি তার জবাব না দিয়ে ছাড়বে না। এমন কথা শোনাবে যাতে সবাই লজ্জা পায়। লোকটি শুয়ে আছে আমারই দিকে মুখ ক'রে। নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছে সকলকে। মহিলাটিকেও। তখন ওই কথাগুলো বলেছিল কেন? রাস্তায় পথ-চলা মেয়েকে না দেখেশুনে বিয়ে করলে যা হয়। এবারও নিশ্চয়ই একটা জবাব না দিয়ে পারবে না।

লোকটি কিন্তু কিছুই বলল না। মহিলাটি এবার আমার একেবারে পাশে এসে বসল। ভালোই হ'ল। অন্তত মুখোমুখি বসে থাকার বিড়ম্বনা থেকে বাঁচা গেল। কিছুক্ষণ আগেও আমি তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম। এখন ভাবলাম, ওই ধরনের কথা আমাকে বললে লজ্জায় মাথা তুলতে পারব না। কিন্তু সে-রকম কিছুই শুনতে হ'ল না। বুঝতে পারছি না, হঠাৎ এমন চুপ ক'রে গেল কেন!

বুঝেছি! তাহলে এই ব্যাপার! সবটাই সাজানো! লোকটি নিশ্চয়ই একে ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর দু'জনেই পরস্পরের অপরিচিত হওয়ার অভিনয় করছে, লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্যে একজন অন্যজনকে খোঁচা দিয়ে যাচ্ছে। আমার অনুমান ঠিকই। দুজনেই গাড়িতে উঠেছিল কোট্টারকোরা স্টেশনে। সম্ভবত কোল্লাম থেকে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চলে এসেছে। ব্যাপারটা ধামা চাপা দেবার জন্যে মহিলা আগাগোড়াই গল্পে মশগুল; আর লোকটিও একই ধরনের, ভয়ডর বলে কিছু নেই। মহিলা তো বেশ মেজাজেই কথা বলছে। ভালোই হ'ল, বামাল ধরা পড়ল চোর।

মাদুরায় গাড়ি পৌঁছক, দু'জনকেই তুলে দেওয়া যাবে পুলিশের হাতে। আমি আবার 'নিরুদ্দেশ' স্তম্ভটির ওপর চোখ বুলিয়ে নিলাম। এই সেই পলাতকা স্ত্রী। একা যুবতী! রীতিমতো এক ভদ্রলোককে কিনা বলে দিল 'মঙ্গলসূত্র বানাবার সোনা না থাকায় লোকটা বিয়ে করতে পারেনি।' আর এটা শুনেও কিনা লোকটি কিছুই বলল না! লোকটি মূর্খ হলেও একটুও গোবেচারা নয়। খানিক আগেই নিজের সাহসের বড়াই করছিল।

এত কাণ্ড সত্ত্বেও অন্য যাত্রীরা এদের বিষয়ে এতটুকু উৎসাহ দেখাল না। এদের রহস্য ওরা জানবেই বা কী করে! বিরুদনগর গাড়ি পৌঁছলে মেয়েটি একেবারে আমার গা-ঘেঁষে এসে বসল। তোমার নাম কি লক্ষ্মী?— জিজ্ঞেস করব কি না ভাবলাম। তাহলে অবশ্য কিছুটা বোঝা যেত। কিন্তু এভাবে কি জিজ্ঞেস করা যায়? যদি পাল্টা প্রশ্ন ক'রে বসে, তুমি কে হে?

সেনসাসের লোক নাকি? তা হলেই মাটি। বুঝলাম না এই বাক্যবাগীশ মহিলাটির সঙ্গে কথা বলতে আমি এত ইতস্তত করছি কেন?

শেষে একটি নিরীহ প্রশ্ন করলাম, 'কোট্টারকোরা থেকে গাড়িতে উঠেছ?'

'কী করে জানলে?'

'মনে হচ্ছে সেইরকম দেখেছি আমি।'

'তাহ'লে আবার জিজ্ঞেস করছ কেন? বাজিয়ে নিতে বুঝি?'

'না, শুধু এটুকু জানবার জন্যে উত্তরটা তুমি ঠিক-ঠিক দিচ্ছ কিনা?'

'কেন, আমি কি কিছু চুরি করেছি?' দৃঢ় গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

এরপর আর কথা বাড়ানোর ইচ্ছে ছিল না আমার, চুপ করে থাকাই ঠিক হ'ত। কথা বাড়ালেই হয়তো অনেক কথা এসে পড়বে। সকলেই শুনতে পাবে। তার সে-সব কথার জবাবও হয়তো আমি দিতে পারব না। অবলা নারী ব'লে লোকেও হয়তো ওরই পক্ষ নেবে। এসব ভেবে চুপ করে থাকলাম আমি।

কিছুক্ষণ পরে সে জিজ্ঞেস করল, 'আসছ কোথা থেকে?'

'কোল্লাম।'

'যাবে কোথায়?'

'সেটা জানতে চাইছ কেন?'

'বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে বুঝি? নাকি লুকিয়ে পালাচ্ছ কোথাও?'

'লুকিয়ে পালানোটা তো আজকাল মেয়েদেরই কাজ।' বললাম আমি।

'সেটা পুরুষদের দোষে।'

'যার দোষেই হোক, যারা লুকিয়ে পালায় একদিন না একদিন ঠিকই ধরা পড়ে যায়।'

'তোমার কেউ বুঝি পালিয়েছে এইভাবে?'

'না, আমার কেউ নয়। এভাবে পালানো একজনকে ধরে ফেলেছি।'

'এতই যখন মুরোদ...', কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল সে, 'আপনি কি সত্যি সত্যিই মাদুরা যাচ্ছেন?'

আমি ভাবলাম ধরা পড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা জেনে গেলে মাদুরার আগেই ওরা গাড়ি থেকে নেমে পড়বে। ওরা যেখানে নামবে আমার সেখানে নামবার উপায় নেই। সুতরাং ঠিক করলাম পশুমলা স্টেশনের পরেই ওর সঙ্গে কথা বলব। ইতিমধ্যে ভালো হয় যদি কেউ আমাদের দুজনের মাঝখানে এসে বসে। কিন্তু কেউই এলো না। এইভাবে পশুমলা স্টেশনও পার হয়ে গেল।

সে জিজ্ঞেস করল, 'মাদুরা থেকে কোথায় যাবেন?'

'সেখানে পৌঁছে ঠিক করব।'

'যাবার জায়গার কোন ঠিক নেই বুঝি?'

যদি তাই হয় তাহলে কি সেও আমার সঙ্গে যাবে— জিজ্ঞেস করব ভাবলাম। সোনার দাঁত-পরা লোকটি তখন ওপরে ঘুমুচ্ছে। যা সম্মান লোকটি পেল তা আমার জানা হয়ে গেছে।

দূরত্ব আর খুব বেশি নেই। মাদুরায় পৌঁছে এদের সব চালাকিই ফাঁস করে দেব।

এদের দুজনকে পুলিশের হাতে দিতে হলে অন্যদেরও সাহায্য

চাই। এ-ব্যাপারে সহযাত্রীরাও নিশ্চয় সাহায্য করবে আমাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার নাম কি লক্ষ্মী?'

'কী করে জানলেন?'

'সে-কথা পরে, আগে সত্যি কথাটা বলো?'

'শুধু শুধু মিথ্যে বলব কেন, আমার নাম তো লক্ষ্মীই।'

'বাড়ি কোথায়? কোল্লাম?'

হাসতে হাসতে সে বলল, 'এর আগে কি কোথাও আমাদের দেখা হয়েছিল?'

'তাও বলব। কালই বেরিয়েছ বাড়ি থেকে?'

'আপনি কি পুলিশের লোক? পুলিশের মতো প্রশ্ন করে যাচ্ছেন?'

'কোল্লাম থেকে এক মহিলা পালিয়ে গেছে। আমি ঘটনাটা দেখেছি কাগজে। বয়স, রঙ, নাম—সবই তোমার মতো। যে তোমাকে নিয়ে পালাচ্ছে সেও আছে এই গাড়িতে। আমি সবই জানি।' বললাম আমি। যারা কাছাকাছি বসেছিল তারাও শুনল এ-কথা। ভালোই হ'ল।

'কাগজটা আছে কাছে? দেখাবেন একটু?'

এর সঙ্গে কে আছে? যাত্রীরা সবাই তখন এটাই জানতে চায়। সমস্ত কামরা জুড়ে হৈ-চৈ পড়ে গেছে ততক্ষণে। কিন্তু ওকে দেখে মনে হচ্ছে না যে এসব ভ্রূক্ষেপ করছে।

'তাহ'লে এখন আপনি কী চান?' আমাকে জিজ্ঞেস করল সে।

'ধরে পুলিশে দেব।' বলল একজন।

প্রায় শিশুর সরলতায় সে বলল, 'মাদুরা পৌঁছে নানপ্পন

নামে একজন পুলিশ পাবেন। আমাকে তার কাছেই সঁপে দেবেন।'

'ঠিক আছে। সে-সব আমি বুঝব।' বললাম আমি।

সোনার দাঁতের লোকটি তখন জিজ্ঞেস করল, 'নানপ্পন কে হয় তোমার?'

'আমার? তিনি আমার স্বামী।'

ভাড়াটে বাড়ি

পি. সি. কুট্টিকৃষ্ণণ 'উরুব'

একটু রাগের মাথায়ই এসে ঢুকেছিলাম নতুন বাড়িতে, এত তাড়াতাড়ি আবার বাসাবদল করতে হবে ভাবি নি। তিন মাসের ভাড়া ব্যাঙ্কে জমা রাখতে হবে এই অজুহাতে আমাকে বের করে দেওয়ার দরকার ছিল না। ভাড়া না পেলে সংসার চলবে না— বাড়িঅলার অবস্থাও ঠিক তেমন নয়। আসলে টাকাটা সে ব্যাঙ্কে জমাতে চেয়েছিল, এটাই তার জেদ। চার মাস তার বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও কোনরকম খাতির করল না। 'স্যার, বাক্স বিছানা বাইরে করে দিচ্ছি, বাড়িটা দয়া করে ছেড়ে দিন।' আসলে ও বলতে চেয়েছিল, 'যা বেটা কুকুর, বেরিয়ে যা।' আমি বুঝতেই পারছিলাম খুব রেগে গেছে লোকটি, গলার স্বরটি যদিও বেশ শান্ত। নির্বোধ ভেবেই নিয়েছিল এখান থেকে বের করে দিলে আর কোথাও ঠাঁই পাব না; সত্যি, যাব কোথায়? আমার জন্যে অন্য একটা বাড়ি কেউ নিশ্চয়ই তৈরী করে রাখেনি। সে-রকম হলে কি কেউ আর ভাড়া দিয়ে এই এক চিলতে ঘরে থাকে।

আমার মতো ভাড়াটে পাবার জন্যে তার লালায়িত হওয়াই উচিত, কারণ আজ পর্যন্ত আমি কোন ঝামেলা করিনি। প্রতিবেশীরাও আমাকে ভালো লোক বলে জানে। 'একটি ভদ্র ছেলে।......।' আমার সম্পর্কে এই তাদের ধারণা। আমার আগে সেখানে থাকত এক দর্জি। মোটামুটি একটা ইতিহাস

সৃষ্টি করে সে চলে যায় সেখান থেকে। প্রতিবেশীরা একজোট হয়ে রটনা করেছিল শহরের সমস্ত মেয়ে ভিখিরি ওই ঘরে রাত কাটায়। আমাদের মূর্খ দাদাটির এ ব্যাপারে কোন খেয়ালই ছিল না। ঠিক সময়ে ভাড়াটা পেলেই তার হল। অসামাজিক কিছুর জন্যে কোনই চিন্তা ছিল না তার।

আমি ওই ঘরে ঢোকার পর থেকে সেখানে কোন স্ত্রীলোকের নিঃশ্বাস পর্যন্ত পড়েনি। পুবের ঘরের বুড়ী দিদিমাকে পাশের ঘরের মহিলা একদিন বলেছিল, 'কী বলব দিদিমা, এখন অনেক শান্তিতে আছি।' সত্যই আমি সারাক্ষণ চুপচাপ থাকি। মাঝে মাঝে কিছু লিখি। বেশিরভাগ সময়েই শুয়ে থাকি। একবার একটা কবিতা পড়েছিলাম চেঁচিয়ে। হাজার হোক, মানুষ তো! আর তক্ষুনি প্রতিবেশী এক প্রৌঢ়া দরজার কাছে এসে হেসে বলল, 'গান গাইছ বুঝি?'

সেদিন থেকে কবিতা পড়াও বন্ধ করে দিলাম। আমার গলার স্বর আর ঘরের বাইরে যায় না। কিন্তু পৃথিবীতে সুখে শান্তিতে থাকার জো আছে নাকি!

আগের লোকটি ছিল চতুর। ভাড়া যা দিয়েছিল তা প্রায় সুদে-আসলে তুলে নিল। 'তুমি ঘর না দিলে এ-রকম একশোটা ঘর পাব,' এই বলে ঘর ছেড়ে দিল। ঘরটা দেড়মাস খালি পড়ে থাকল।

বাপের চেয়ে ছেলে আরো আকাট। বসন্তের দাগ ভর্তি মুখের দিকে তাকালেই চেহারার অলক্ষুণে ভাবটা চোখে পড়ে। বউ যে ওকে ছেড়ে চলে গেল তার কারণও এই। বাপ যখন কথা বলছিল তখন ভোটের মতো চেহারা নিয়ে ও দাঁড়িয়েছিল পিছনে।

এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে এখন পর্যন্ত একটি স্ত্রী-ই ছেড়ে গেছে ওকে— মুখের যা চেহারা, তাতে একসঙ্গে একশো স্ত্রী ওকে ছেড়ে যেতে পারে।

বাপ হয়তো ডাকল, 'শঙ্কর…!'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এলো, 'কী বাবা!' গলার স্বর গাধার মতো, কর্কশ! এতদিন যে একটি মহিলা কী করে সহ্য করে ছিল! ব্যাপারটা আমার এখনো আশ্চর্য লাগে। সে নিশ্চয়ই কৃপণ ও নির্বোধের সঙ্গে মানিয়ে-চলা কোন সাধ্বী হবে। আমি তাকে কোনদিন চোখেও দেখিনি। আমার ওই বাড়িতে আসার দেড় মাস আগেই সে চলে গিয়েছিল বাড়ি ছেড়ে। বাপ-বেটার কেউই বুঝতে পারেনি সে চলে যাবে এত তাড়াতাড়ি। তারও বাবার আছে ভাড়া দেবার মতো বাড়ি আর ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা। এই অর্থপিশাচগুলোকে কী করে সম্মান করবে সে! চলে যাবার পরও তাকে ফিরিয়ে আনার অনেক চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সবই ব্যর্থ।

সে নিশ্চয়ই সুশীলা ছিল। 'তোমাদের সঙ্গে সাপ ছাড়া আর কেউ ঘর করতে পারে না,' এই বলে সে এদের বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এটাই সত্যি, সাপও এদের সঙ্গে ঘর করতে পারবে না। বাপ কিছু বলার আগেই ছেলে তো আমার বিছানাপত্তর উঠিয়ে বাইরে রেখে এলো। আমি বলতে চাইছিলাম এখনই ঘর খালি করা যাবে না। কিন্তু প্রতিবেশীরা ভাবতে পারে ভাড়া না দিয়ে আমি ঝগড়া করছি। ওই বুড়ো আর তার ছেলের মতো আমিও কী করে আত্মসম্মান নষ্ট করি। কথাবার্তা যা বলার তাড়াতাড়ি বলতে হবে। চেঁচামেচির সম্ভাবনায় ওদের কথামতো তিনমাসের ভাড়া সম্পর্কে কাগজে লিখে সই করলাম, দিলাম

ওদের হাতে। ওরা বোধহয় ভাবল ওদের ধমক শুনেই আমি এটা করলাম। ভেবেছিল একটা বাজে কাগজে আমাকে সই করিয়ে নেবে! এবার বুঝবে। প্রতিবেশীরা না থাকলে আরো আগেই বুঝিয়ে দিতাম।

তবু আমার রাগ গেল না। আরো ভাবলাম, বন্ধুর সাহায্যে এই ঘরটা না পেলে কী হ'ত! এই বৃষ্টির মরশুমে কি দোকানের বারান্দায় শুয়েই রাত কাটাতাম? এ-বিষয়ে ওই নির্বোধ লোকগুলি কি একবারও ভেবেছে? বুনো মোষের মতো চেহারার ওই বাপের বেটা শংকরণের মাথায় কি ঢুকবে এ-কথা? সমাজের আসল অবস্থা বোঝার মতো বুদ্ধি কি আর এই জানোয়ারদের আছে?

নতুন ঘরটায় চলে আসার পরেও নিন্দাবাদের শেষ হল না। হঠাৎ একটি স্ত্রীলোক এসে হাজির।

বিনীত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'সাত নম্বর ঘরে আপনিই এসেছেন বুঝি?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। বলুন?'

'চাবির দরকার নেই?' তেমনি বিনীত তার গলার স্বর।

'কেন, বাড়িঅলা কোথায়?'

'চাবিটা রাখুন। সাবধানে রাখবেন, আর কিন্তু চাবি নেই।' জবাব এলো।

'আজ্ঞে!'

'মাফ করবেন, আমি আপনাকে ঠিক চিনতে পারিনি।'

'বুঝতেই পারছি।'

'তাহ'লে আমি ওপরে যাই।' আমি চাইছিলামই সে চলে

যাক। তবু, হঠাৎ স্ত্রীলোকটি বলল, 'ঘর পরিষ্কার করেছে কিনা জানি না, ঘরটা দেখিয়ে দিই। আপনার কাছে ঝাঁটা আছে তো?'

হ্যাঁ বলতেই ইচ্ছে করছিল, কিন্তু, ঝাঁটা সত্যিই ছিল না। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম। যে-চাকরটি বাক্স-বিছানা তুলে নিয়ে গিয়েছিল, সে ফিরে এলো ততক্ষণে। বলল, 'স্যার, ঘর তো বন্ধ!'

'আমি খুলে দিচ্ছি।' স্ত্রীলোকটি বলল। তারপর আমাদের দু'জনের আগে আগেই সিঁড়ি উঠতে লাগল। তার পিছনে আমি আর চাকরটি। ওপরে ওঠার সময় তার কালো, ঘন আর কোঁকড়ানো চুল অন্ধকার ঢেউয়ের মতো দুলছিল। মনে হচ্ছিল কিছুক্ষণ আগেই সে স্নান করেছে। চুল শুকোয় নি এখনো। তেল আর সাবানের মৃদু সুগন্ধ আস্বাদন করতে করতে আমি ওপরে উঠতে লাগলাম।

সাত নম্বর ঘরের সামনে পৌঁছে স্ত্রীলোকটি বলল, 'চাবিটা দিন।'

চাবিটা তুলে দিলাম তার হাতে। সে ঘরের দিকে তাকিয়েছিল আর আমি তার দেহবল্লরীর দিকে। বছর তেইশ-চব্বিশ বয়স হবে। চাঁপা-ফুলের মতো গায়ের রঙ, কানে সাদা পাথরের ফুল, মাথা নড়লেই সেটা আলোর ফুল্‌কি ছড়াচ্ছিল।

'বাক্সটা বাইরেই থাকুক। কুলিটাকে ছেড়ে দিন। আমি ঘরটা একটু পরিষ্কার করে দি।'

সে নীচে চলে যেতে কুলিটাকে ছেড়ে দিয়ে ঘরের চারদিকে তাকালাম আমি। দুটো বড়ো জানলা আছে। বেশ আলো পাওয়া যাবে। বিশুদ্ধ হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেবার সুযোগ পাব। মানুষের বাস করার পক্ষে ঘরটা সত্যিই উপযুক্ত। আগের বুড়োটার

ঘরের মতো নয়। গৃহকর্ত্রীও মনে হয় বেশ ভালো, না হলে ঘর পরিষ্কার করার জন্যে ব্যস্ত হ'ত না। বারান্দাটিও সুন্দর। ওখানে বসে সবুজের সমারোহ অবলোকন করা যাবে।

'দাঁড়িয়েই আছেন?' ঝাঁটা নিয়ে ফিরে এলো সে। 'এক্ষুনি পরিষ্কার করে দিচ্ছি।' ঘর ঝাঁট দিয়ে জল দিয়ে মুছে দিল সে। বাক্স-বিছানা গুছিয়ে রাখতে সাহায্য করল আমাকে। তখনই ভালো করে লক্ষ্য করলাম ওকে। চোখ দুটি সুন্দর নয়, কিন্তু তীক্ষ্ণ। যেন বহু প্রশ্নে তীক্ষ্ণ হয়ে আছে। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে আমি বিশেষ মাথা ঘামালাম না।

'এতদিন কি মিস্টার শঙ্করণের বাড়িতে ছিলেন?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'কেমন লাগত সেখানে?'

'কী বলব, কোন রকমে ছিলাম। ঘরটা ছিল ইঁদুরের ঘরের মতো।'

'লোকটাকে চেনা খুব মুশকিল।'

'আপনি চেনেন ওকে?'

'খুব ভালো করে চিনি।' ব'লে শব্দ করে হেসে উঠল সে।

'কোন্‌টা বেশি পাজি— বাপ না ছেলে?'

'শয়তান আর পিশাচ!' সে হাসতে লাগল।

'ছেলেটা সত্যিই পিশাচ!' আমিও হেসে ফেললাম। ওর কথাবার্তা বেশ ভালো লাগছিল আমার। তাহলে আমার মতো করে আর কেউও ভাবে।

'আপনাকে বের করে দেবার জন্যে একেবারে তৈরি ছিল কী বলুন?'

এ-কথাও যে ও জানবে এটা আমার ধারণা ছিল না। শুনে ভালো লাগল না।

'যার নিজের ঘর নেই সে রাস্তায় থাকবে, পিশাচগুলো এইরকমই ভাবত!'

সে বলল, 'হ্যাঁ, অনেকটা তাই।'

আমি সায় দিলাম!

'ওদের কি মানুষ বলা যাবে?'

'না।'

'আমার তো ওদের মুখ দেখতেও ইচ্ছে করে না।'

'ঘৃণা হয়।' খুশির গলায় এতটা বলে আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। ওর চোখেও খুশি উপ্‌ছে পড়ছিল।

'আপনার নামটা জানতে পারি কি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'পঙ্কজম।'

'আপনার বাবা?'

'বাইরে গেছেন। আমি পাশের ঘরে থাকি; কোন দরকার পড়লে আমাকে জানাবেন।'

'আচ্ছা।'

পঙ্কজম নীচে চলে গেল। বারান্দার রেলিঙের কাছে দাঁড়িয়ে আমি ওর কথা ভাবতে লাগলাম। হাসিখুশি আর যুবতী স্ত্রীলোক। মোটেই লাজুক নয়। এমন স্ত্রী সকলেরই পছন্দ হবে।

'টম্যাটো চাই···টম্যাটো?' নীচে কেউ হাঁক দিল। সেই শব্দে হুঁস হ'ল আমার। জবাব না দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলাম আমি। এখন স্নান করে নেওয়া দরকার।

স্নান সেরে, জামা কাপড় বদলে আমি যখন বাইরে বেরুচ্ছি, পঙ্কজম তখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে বারান্দায়।

'খেতে যাচ্ছেন?' আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।' আমি বেরিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালেও পঙ্কজম আমার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। আশপাশের সমস্ত ঘরে গিয়ে প্রত্যেকের কুশল জিজ্ঞেস করল। পাশের একটি ঘরে থাকেন এক মুনীমজী। সারাক্ষণ চুপচাপ, নিজের ভাবনায় ডুবে থাকেন। তারও আগের ঘরে থাকেন গোঁফঅলা মোটা একটি লোক— এক প্রধান অধ্যাপিকার স্বামী। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে এখানে এসে উঠেছেন। মুখ দেখে মনে হয় সামান্য সহানুভূতি জানালেই ভেঙে পড়বেন কান্নায়। আর-এক দিকের ঘরে থাকেন এক খদ্দরধারী ভদ্রলোক, উস্কোখুস্কো, শুকনো চেহারা। তার ঘরের সামনে কথাবার্তার আওয়াজে কান পেতে শুনলাম তিনি রাষ্ট্রীয় নেতা আর মন্ত্রীদের সমালোচনা করছেন। হাসতে হাসতে ফিরে এসে পঙ্কজম আমার ঘরের সামনে দাঁড়াল।

'কোন অসুবিধা হয়নি তো?'

'না।'

'শেষ পর্যন্ত, একজন লেখকও এসে গেলেন এখানে, এতে আমি খুব খুশি।'

তাহলে কি পঙ্কজম আমাকে লেখকই ভাবে? এই পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল আমার প্রতি তার সমস্ত ব্যবহার সাধারণ সৌজন্যপ্রসূত। হাসি সামলে আমি বললাম, 'ঐ ঘরে যিনি থাকেন…?' আমি খদ্দরধারীর কথা জিজ্ঞেস করছিলাম।

শান্ত গলায় পঙ্কজম আমার কাছে বর্ণনা করল তার কাহিনী।

'পাগল বুঝি ?'

'তা ঠিক বুঝতে পারি না।'

শুনলাম লোকটি স্বাধীনতা-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে চার বার জেল খেটেছে, মারও খেয়েছে কয়েকবার। একটি ছেলে আছে, সে থাকে বোম্বাইয়ে। ছেলে যা টাকা পাঠায় তাতেই যেমন-তেমন করে চলে যায়। তার কাজের মধ্যে শুধু সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত বিশ্বসংসারের নিন্দে করা।

'হতাশ ব্যক্তির কি আর কোন কাজ থাকে না!'

'অনেক কাজই থাকে—'

আমি পঙ্কজমকে বসতে বললাম। সে বসল না, চলেও গেল না। দাঁড়িয়ে থেকেই কথা বলতে লাগল। কথাবার্তার মধ্যেই শঙ্করণ প্রসঙ্গ এসে পড়ল; তার সম্পর্কে খুঁটিনাটি বর্ণনা দিল পঙ্কজম।

আমি বললাম, 'ওকে আপনি খুব ভালো ক'রে চেনেন মনে হচ্ছে ?'

'কী করব, আমার কপাল।'

'তার মানে ?'

প্রশ্নটা এভাবে করা উচিত হয়নি, মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল।

'ন' মাস ওই বুদ্ধটার সঙ্গে জীবন কাটিয়েছি, সেটাই আমার পরাজয়।'

'মানে···?' বসে ছিলাম, উঠে দাঁড়ালাম।

'আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমি ওর স্ত্রী ছিলাম।'

আমি আর কোন কথা বলতে পারলাম না।

আমার মনোভাব বুঝতে পেরে পঙ্কজম বলল, 'বলুন তো, ওই লোকের সঙ্গে কেউ ঘর করতে পারে?'

না, পারে না। তবু আমি এ-কথা উচ্চারণ করলাম না।

পঙ্কজম তখনো বলে যাচ্ছে, আমি শুনছি।

'কতবার যে আমার সঙ্গে অপমানজনক ব্যবহার করেছে! আমি সবই চুপচাপ সহ্য করে গেছি, শুধু ভাবতাম লোকে কী বলবে আত্মীয়স্বজন কী বলবে! কিন্তু সহ্যেরও তো সীমা থাকে!'

'তা ঠিক···।'

'লোকটা কিছুই বুঝত না।'

'আপনার জন্যে সত্যিই দুঃখ হয়।' আমি বললাম।

'হবেই। যার হৃদয় আছে তারই দুঃখ হবে। আপনি তো লেখক, সাধারণ লোকের চেয়ে আপনি অনেক বেশি অনুভব করতে পারবেন।'

নিজের বোকা-বোকা হাসি লুকিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে আমি ওর কথা শুনছিলাম।

'আমি আপনার কাজে অসুবিধে করছি।' এই বলে ঘরের বাইরে চলে গেল সে।

রোজই খুব সকালে আমার ঘরে চলে আসত পঙ্কজম। পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করত আর ওরই মাঝে-মাঝে অভিশাপ দিত শঙ্করণকে।

আস্তে আস্তে খদ্দরধারীও আসতে শুরু করল আমার কাছে।

'যা দিনকাল পড়েছে তাতে আর-কিছু যে হচ্ছে এটাই আশ্চর্য। মানুষের সব সততা উবে গেছে? আমি এটাই শুধু জানতে চাই। আজকাল নেতারাও নিজের অনুগামীদের বিশ্বাস করে না।

শুধু ভয়, যদি চলে যাবে না তো! বাকি লোকেদের মাথা খাড়া করে দাঁড়ানো উচিত।...সেটাই সম্ভব, মশাই, সেটাই দরকার। কী বলুন?'

সেটা যে সম্ভব নয়— আমি আর তা বললাম না।

এরই মধ্যে পঙ্কজম হঠাৎ বলল, 'স্ত্রীর ওপরেও স্বামীর বিশ্বাস নেই।'

'স্বামীর ওপর স্ত্রীরও নেই।'

গলাটা চেনা লাগল। পিছনে তাকিয়ে দেখি দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন প্রধান অধ্যাপিকার স্বামী। তাঁর চোখ থেকে গোঁফের ওপর দু'-তিন ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। সর্বত্র যেন শোকের ছায়া নামল। কেউ আর কিছু বলল না। সকলেই চলে গেল আস্তে আস্তে। দ্রুত পায়ে নীচে চলে গেল পঙ্কজম। 'মনস্যাক্ষী রহিত জীব!' এই বলে খদ্দরধারী নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। প্রধান অধ্যাপিকার স্বামী বললেন, 'বড়ো দুঃখী এই পৃথিবী!'

একটা নতুন কবিতার ভাবনা উঁকি দিচ্ছিল আমার মাথায়। কিন্তু ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখের পাতা, বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম আমি।

পরের দিন সন্ধ্যায় বারান্দায় বসে ছিলাম। দেখি প্রধান অধ্যাপিকার স্বামী দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে। গেটের কাছে আছে বড়ো গাছের ছায়া, রোজ স্কুল ছুটির সময় সেইখানে দাঁড়িয়ে নিজের স্ত্রীকে দেখেন তিনি। স্ত্রী চোখের আড়ালে চলে গেলে গোঁফের ওপর লেগে-থাকা চোখের জল মুছতে মুছতে ফিরে আসেন ঘরে। হয়তো এই দুঃখভোগের মধ্যেই এক ধরনের

সুখ পান তিনি। খদ্দরধারী দিনের অনেকটা সময়ই ঘুমিয়ে কাটায়। বিকেল চারটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত নিয়মিত ঘুমোয়; তারপরই শুরু হয় তার লোকনিন্দা। রাত জেগে রোজই এক গাদা চিঠি লেখে, সারাদিন কাজ বলতে ওইটুকু— প্রতিদিনই এক বাণ্ডিল চিঠি পাঠায়। বিকেলের এই সময়টায় চারিদিক জুড়ে বিরাজ করে অবিচ্ছিন্ন শান্তি। বারান্দার রেলিং থেকে নীচের দিকে তাকিয়েছিলাম আমি। আকাশে ছড়িয়ে আছে সূর্যের আলো। চারিদিকে সবুজের সমারোহের দিকে তাকিয়ে পৃথিবীকে খুব খারাপ বলে মনে হয় না।

'টম্যাটো চাই— টম্যাটো?'

নীচে থেকে হাঁক শুনলাম। সাধারণত আমি এ-সব হাঁকে কান দিই না। আজ বললাম 'না ভাই, চাই না।'

'কী চাই না?'

দেখি পঙ্কজম দাঁড়িয়ে আছে পিছনে। আমি উঠে দাঁড়ালাম।

'বসুন।'

'না, আপনি বসুন, আমি এখানে বসছি।' একটা চেয়ার টেনে নিল পঙ্কজম। লাল শাড়ি আর হলদে ব্লাউজে তাকে চমৎকার লাগছিল।

সান্ধ্য সূর্যের আভায় তার চোখের দৃষ্টি ছুরির ফলার মতো চকমক উঠল।

'কার সঙ্গে কথা বলছিলেন?'

'টম্যাটোওলার সঙ্গে।'

'ব্যস, এই!' ব'লে সে দূরে গিয়ে বসল।

সেদিনও শঙ্করণকে নিয়ে কথাবার্তা হ'ল।

'এখন আবার কাছে আসতে চাইছে।' পঙ্কজম বলল।

'আবার কী হ'ল?'

'কাকীকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে।'

'কী বলছে?'

'ফিরে যেতে বলছে। ওর সঙ্গে তো একটা সাপও থাকতে পারে না।'

কিছু না বলে আমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

'বাবা চুপ করে থাকলেন, কিন্তু আমি ছেড়ে কথা বলিনি।'

আবার সে পুরো ঘটনা বর্ণনা করল।

'এত রেগে যাবার কী আছে?' মাঝখানে প্রশ্ন করলাম আমি। পরে, সামলে নিয়ে বললাম, 'এভাবে জিজ্ঞেস করায় কিছু মনে করলেন না তো?'

'না, তা কেন! আমার দুঃখ এতদিন কেন জিজ্ঞেস করেন নি। এ-সব কথা তো রাস্তার লোক জড়ো করে বলতে ইচ্ছে করে, যাতে সকলেই জানতে পারে।'

'কেন?' সংযত প্রশ্ন করলাম আমি।

'লোকটা আসলে চাকর।'

'কার?'

'বাবা, মা, বারান্দার রেলিঙ, সকলের। সিনেমা দেখতে যাবে তাতেও মার অনুমতি দরকার। সব কাজের জন্যেই কৈফিয়ৎ দিতে হ'ত। আমার ভূমিকা ছিল রাস্তার ধুলোর মতো। এত সহ্য করেছি। তারপর কী হ'ল শুনুন। ওর নামে দশটা দোকান আছে। অন্যদের দেউলিয়া করে কিনেছিল। আমি বলেছিলাম দোকানগুলো আমার নামে লিখে দিতে। পয়সার লোভে করিনি। আমি শুধু ওকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম।'

'তারপর ?'

'ব্যস, শুরু হ'ল ঝগড়া। একদিকে ওর মা, একদিকে আমি। ছেড়ে কথা কইনি। অনেক কথা, ঝগড়া। আমায় যখন মারতে এল, বললাম, ভাগো। তারপর বাপের বাড়ি চলে এলাম।'

'তাহলে ঠিকই আছে।'

'আমার ওপর বিশ্বাস নেই বলেই তো আমার নামে লিখে দিতে চায়নি ?'

'সেইরকমই তো মনে হয়।'

'তাহলে আমি থাকব কেন ? পয়সার লোভে নয়, শুধু পরীক্ষা করার জন্যেই বলেছিলাম। আপনি এখানে আসায় পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে কাল নানা কথা বলেছে।'

'আচ্ছা।'

'আমার বাড়ি, আমি যাকে ইচ্ছা ভাড়া দিতে পারি, বলুন ?'

সে তাকিয়েছিল আমার মুখের দিকে, আমি দরজার দিকে। ক্ষণিক স্তব্ধতা নামল।

সে কথা বলে যাচ্ছিল এক নাগাড়ে। আমি শুনছিলাম। জবাব দিচ্ছিলাম না। বলার মতো কিছু ছিলও না। সিড়ি দিয়ে নেমে যাবার সময় পিছন ফিরে সে বলল, 'আজ খেতে গেলেন না ?'

'না,' দ্বিধান্বিত গলায় বললাম, 'পেটটা ভালো নেই।'

'তাহলে আমি একটা বড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি, হজম ভালো হবে।'

আসলে কিন্তু ক্ষিদেয় চোঁ-চোঁ করছিল পেট। সেখানে নাড়ি-ভুঁড়ি ছাড়া আর কিছু ছিল না। তবু ভালো, সম্পাদক গোটা দশেক টাকা দেবেন বলেছেন। বড়ি গিলে পেট পুরে খাব।

কিছুক্ষণ বাইরে থেকে ঘুরে এসে কানে এলো খদ্দরধারীর ঘরে চার-পাঁচজন কথা বলছে। আলাপ বেশ জোরেই চলছিল, সেই সঙ্গে হাসি-মস্করা। আজ পর্যন্ত ওই ঘর থেকে এ-ধরনের শব্দ আসেনি। আমি উঁকি দিয়ে দেখলাম পাঁচ-সাতজন বসে আছে ভিতরে। ঘরে ফিরে এলাম। ওরা কখন চলে গেছে খেয়াল করিনি। দিনের স্বপ্নে পঙ্কজমের মুখ ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরের দিন সকালে হাসিমুখে খদ্দরধারী আমার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল.। কাউকে গালমন্দ না করেই ঢুকল আমার ঘরে।

'ওরা জবরদস্তি করলে আমি ফেরাই কী করে বলুন? ওরা সব দিল্লীর বন্ধু!' বলে হাসতে লাগল। সে-সব কথার কিছুই বোধগম্য হল না। সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে থাকলাম আমি।

'মনে হয় আমার দাঁড়ানো উচিত!'

'কী ব্যাপার!'

'নির্বাচন-প্রার্থী হয়ে। সময় বদলে যাচ্ছে। হা···হা·· হা···'

'নির্বাচনের ব্যাপার?'

'হ্যাঁ, জনতা চাইছে আমাকে। জনতাকে নেতৃত্ব দিতে হবে। সেবার সুযোগ আমি কখনো হারাইনি। হা···হা···হা···'

'আপনি রাজী হয়েছেন?'

'না হয়ে কী করব! হাঃ···হাঃ···হাঃ···'

খদ্দরধারীর সেদিন অনেক কাজ। চিঠিপত্র লেখা, নিজের জিনিসপত্র গোছানো, বাঁধাছাঁদা করা, চাকর ডাকা, সিঁড়ি ভাঙা এবং যাওয়া। সুতরাং ব্যস্ত হবেই।

সন্ধ্যাবেলায় আমাকে বলল, 'আমি আজই জায়গা বদল করতে যাচ্ছি।'

'নমস্কার।' বললাম আমি।

'নমস্কার। হাঃ...হাঃ...হাঃ...'

হাসতে হাসতে সে নেমে গেল নীচে। আমিও গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলাম। ফেরার সময় প্রধান অধ্যাপিকার স্বামীর গোঁফে দু'-তিন ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল।

লোকটির গালমন্দ বন্ধ হতে চারিদিক থমথমে হয়ে উঠল। আবহাওয়ায় বিষাদের ছোঁয়া। সেদিনই সন্ধ্যায় পঙ্কজম এসে বলল, 'ওর গালমন্দ করার আর কিছুই থাকল না। এইরকমই হয় মানুষের!'

'সেটাই নিয়ম।'

'কিন্তু আমি হলে সব বন্ধুদের ঘর থেকে বের করে দিতাম। আপনি হলে কী করতেন?'

প্রশ্নটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। ভাবনায় পড়লাম। তবু, ভেবেচিন্তে বললাম, 'দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিতাম। খুলতাম না এক সপ্তাহ।'

হাসিমুখে পঙ্কজম তাকাল আমার দিকে। বলল, 'আপনি দিন-দিন রোগা হয়ে যাচ্ছেন। খাওয়াদাওয়া করুন ভালো করে।'

'ঠিক আছে।'

'আপনার কি টাকাকড়ির টান যাচ্ছে?'

'না। ঠিক তা নয়।'

'লেখকরা কত অসুবিধের মধ্যে থাকেন আমি জানি। আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। আজ থেকে আপনি আমার এখানেই খাবেন।'

'কী দরকার অসুবিধে করার?'

'হাজার হোক, আমি মানুষ।' সে বলল, 'সকলকেই আগের বাড়ির বাড়িওয়ালার মতো ভাববেন না।'

'আমি কোনদিনই তা ভাবিনি।'

'শুনুন, আজও একটা লোক পাঠিয়েছিল।'

'কেন?'

'এটা জানাতে যে দোকানের অর্ধেক আমার নামে লিখে দিয়েছে।'

'ব্যাপার তো ভালোই এগোচ্ছে।'

'কেমন লোভী দেখুন! ভাগ্য ভালো যে দোকানের সিঁড়িগুলো শুধু আমার নামে লিখে দেয়নি। আমি সেইভাবেই জানিয়ে দিয়েছি। ওখান থেকে সব মিলিয়ে 250 টাকা ভাড়া পায়। তার অর্ধেক পাবে ওরা, অর্ধেক আমি। অর্থাৎ আমাকে 125 টাকার স্ত্রী বনে যেতে হবে! এমন লোকের সঙ্গে কি পেরে ওঠা যায়! আমি ওকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আপনি কী বলেন?'

'ক্ষমা করে দেওয়াই তো ভালো।'

'আমার তৈরি খাবার আপনার পছন্দ হবে কি না জানি না।'

'সম্ভবত খুবই পছন্দ হবে।'

এইভাবে আরো একটি মাস কেটে গেল। এখনো ভাড়া দিতে পারিনি। সাকুল্যে দু' মাসের ভাড়া বাকী পড়ল।

'ভাড়াটা এখনো দিতে পারিনি।' স্মরণ করিয়ে দিলাম।

'চিন্তার কিছুই নেই। আমি আগের বাড়িঅলার মতো ব্যবহার করব না। সংসারে কেউ বড়লোক হয়, কেউ গরীব…'

পঙ্কজম সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে, আমি তাকিয়ে থাকি সেই লক্ষ্মীপ্রতিমার দিকে।

আরো তিনদিন কেটে গেল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিলাম। সকালবেলা, বাজারে ভিড় লেগে আছে। মোটর, সাইকেল, ভিখিরি, ছাত্র-ছাত্রীরা দ্রুত এদিক থেকে ওদিকে যাতায়াত করছে। হঠাৎ চোখে পড়ল শঙ্করণ আসছে। এত ভিড়ের মধ্যেও নির্বোধ লোকটিকে চিনতে অসুবিধে হ'ল না। সে এই বাড়ির দিকেই আসছে! বালি তাহলে ঋষ্যমূক পাহাড়ে চড়তে শুরু করল?

আমি জানলা থেকে মুখ সরিয়ে নিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি লোকটা আমারই ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'আপনার কাছেই এসেছি।' বলল সে।

'হঠাৎ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'বাকী টাকাটার জন্যে।'

'এখন তো আমার কাছে কিছুই নেই।'

'কবে দিতে পারবেন?'

'যেদিন পারব বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

'এটা কি ঠিক হ'ল?'

কথা শুনে রাগ হয়ে গেল আমার। বললাম, 'ঠিক-বেঠিক শেখাতে এসেছেন আমাকে?'

'আমাকেও বোকা পেয়েছেন নাকি?'

তারপর চলল কথা কাটাকাটি। গলা চড়তে লাগল। আমিও পেছপা হতে নারাজ।

'ত্যাখো, এটা তোমার বাড়ি পাওনি।'

পিছন থেকে গলার স্বর শুনে শঙ্করণ ফিরে তাকাল। উত্তেজিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে পঙ্কজম। দেখেই কেমন অসহায় হয়ে পড়ল শঙ্করণ।

'এখানেও কি ঝগড়া করতে এসেছ?' পঙ্কজম আবার জিজ্ঞেস করল।

'শোনো, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।' শঙ্করণ বলল পঙ্কজমকে, 'তোমার সঙ্গেও দেখা করতে এসেছি।'

'হঠাৎ আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে?'

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল পঙ্কজম।

'সত্যিই সে-জন্যে এসেছি। শোনো-না!' সিঁড়ির দিকে এগোতে লাগল শঙ্করণ। আমি কান খাড়া করে থাকলাম।

'আমি ওটা এনেছি। এই দ্যাখো দলিল। সব ঘরগুলোই তোমার নামে করে দেওয়া হয়েছে।'

'তাহলে তুমি আমাকে বিশ্বাস করো?'

'তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারি না…'

পরের কথাগুলো শুনতে পেলাম না। সিঁড়ির বাঁকে হারিয়ে গেল ওরা।

আমি ভাবতে লাগলাম এরপর কী হবে! পঙ্কজম নিশ্চিত স্বীকার করবে না ওকে, কড়া-কড়া কথা শুনিয়ে ভাগিয়ে দেবে। ওর সঙ্গে যে সাপও থাকতে পারে না!

সেদিনও খাবার এলো। তৃপ্তি করে খেলাম আমি। কিন্তু, পঙ্কজমের কী হ'ল বুঝতে পারছি না; আর সে ওপরে আসেনি। তার সম্পর্কে জানার জন্যে অত্যন্ত উৎসুক হয়ে উঠলাম আমি। সন্ধেবেলায় অবশ্যই আসবে, ভাবলাম। তার অপরূপ রূপ নানা তরঙ্গ তুলল আমার বুকে। অনন্য তার সেই রামধনুরঙা রূপ।

সন্ধ্যার আগে থেকেই বারান্দায় ঘুরঘুর করতে লাগলাম আমি।

সময় চলে যাচ্ছে। চারিদিকের সামান্যতম শব্দেই উৎকর্ণ হয়ে উঠছি, কিন্তু তার আর দেখা নেই। দেখতে দেখতে দিনশেষের আলোয় ছায়াচ্ছন্ন হয়ে উঠল বারান্দা।

আমার হঠাৎ মনে হ'ল সে আর আসবে না। কিন্তু তা কী করে হয়! আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। সন্ধ্যা উতরিয়ে গেল, তবু সে এলো না।

যদি সে না আসে, কেন আমি তার প্রতীক্ষা করব? আমি ঘরের ভিতরে গিয়ে বসলাম। কবিতার বইটা টেনে নিলাম হাতে। কবির চিন্তার সঙ্গে একাত্ম করতে চাইলাম নিজের অনুভূতি। প্রেরণার সঙ্গে নিজের চিন্তা ঘুরতে লাগল চক্রাকারে। এই কবিতাটি পড়লে তবু কখনো কখনো মন শান্ত হয়।

'সুন্দর নিজের দেহে স্তব্ধ হয়ে আছ তুমি, হে জীবন-পতঙ্গ, দুঃখে ভুগে, কালের কবলে…।'

জীবন-পতঙ্গ স্তব্ধ হয়ে গেছে। তাহ'লে—? ছিঃ! কোন সান্ত্বনা পেলাম না। বইটা বন্ধ করে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। তবুও কানে বাজতে লাগল কথাগুলি—'হে জীবন-পতঙ্গ, স্তব্ধ হয়ে আছ তুমি…'

একটা আচ্ছন্নতার ঘোরে ছটফট করছিলাম আমি। কখনো ডান পাশে ফিরি, কখনো বাঁ পাশে। গুনগুন করি, তারপর চুপ করে যাই নিজেই। কখন ঘুমিয়ে পড়ি খেয়াল থাকে না কোন। ঘুম ভাঙার পর দেখলাম সামনে রাখা খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ইচ্ছে হ'ল ফেলে দিই ছুঁড়ে। কিন্তু খাবার কে রেখে গেল? সম্ভবত চাকরে।

বিছানায় উঠে বসলাম। বিড়ি ধরালাম একটা। বাইরে জুতোর

শব্দ। শঙ্করণ এসে আমার সামনে দাঁড়াল। আমি কিছু বললাম না। সে'ই জিজ্ঞেস করল, 'ভাড়াটা কী হবে?'

'কালকে যা বলেছি তারপরে আর নতুন কিছু বলবার নেই।'

'না-না, এই ঘরের ভাড়ার কথা হচ্ছে।' পিছন থেকে ভেসে এলো একটি মধুর গলা। পঙ্কজমের গলা। আমি শঙ্করণকে দেখলাম, ওর গায়ে-গায়ে দাঁড়িয়ে থাকা পঙ্কজমকেও। চারিদিকে তাকালাম। কিছু না বলেই বিছানাটা গুটিয়ে ফেললাম, তালা লাগালাম বাক্সে। দুটোকে এক জায়গায় এনে জড়ো করলাম।

'আমি আজই চলে যাচ্ছি।'

শঙ্করণ আবার জিজ্ঞেস করল, 'ভাড়াটা?'

আমি জবাব দিলাম না।

'ভাড়া দিয়ে এ-সব জিনিস নিয়ে যাবেন, বুঝলেন···', খুব শান্ত গলায় বলল পঙ্কজম।

তারপর, জামা বদলে আমি যখন বাইরে যাচ্ছি, পঙ্কজম জিজ্ঞেস করল, 'চাবিটা কোথায়? এর ডুপ্লিকেট নেই।'

'ঐ, ওখানে আছে।' চাবিটা দেখিয়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম আমি। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় প্রধান অধ্যাপিকার স্বামীও এলো পিছনে পিছনে। গেট পর্যন্ত এসে জিজ্ঞেস করল, 'আপনিও চলে যাচ্ছেন?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

একটা দীর্ঘশ্বাস সম্বরণ করলেন ভদ্রলোক। চোখ দু'টি ঝাপ্‌সা হয়ে এলো। আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম। আমার মনে হ'ল, যেন নিজেকেই দেখছি। ওঁর কী মনে হ'ল জানি না।

'টম্যাটো চাই···টম্যাটো···',একটা হাঁক কানে এলো।

বললাম, 'চাই!'

পকেটে হাত দিলাম আমি। ন' আনা মতোন পয়সা ছিল। দুটো পাকা টম্যাটো কিনে, একটি প্রধান অধ্যাপিকার স্বামীর হাতে দিয়ে বললাম, 'খান। ওতে ভিটামিন আছে।'

দ্বিতীয় টম্যাটোটি খেতে-খেতে রাস্তায় পা দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম আমি। বিছানা-বাক্সর জন্যে এখন আর মায়া নেই। কবিতার সেই অংশটি গুঞ্জন তুলছিল কানে··· হে জীবন-পতঙ্গ··· টম্যাটো খুবই স্বাদু, কবিতাটিও।

ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা

বেটটুর রামন নায়ার

পোন্নন বাজার থেকে ফিরছিল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, সুতরাং সে জোরে পা ফেলে হাঁটছিল। ক্ষুধার জ্বালায় পিত্তি উঠে আসছে গলা দিয়ে।. এই সময় এক কাপ চা খেলেও কিছুটা কাজ দিত।··· পুল পার হয়ে আর কোন দোকান নেই। পকেট হাতড়ে ও একটা আধুলি বের করল। কাল রবিবার। এক পয়সা রোজগারের সম্ভাবনা নেই। সোমবার সকালেও চা খেতে হবে! এই আধুলিটা ভাঙানো ঠিক হবে না। এই ভেবে পয়সাটা আবার পকেটে রাখল সে।

বাঁ দিকের দোকানে দড়ির আগুন পেয়ে বিড়ি ধরিয়ে নিল পোন্নন। দোকানে সাজিয়ে রাখা পাকা কলাগুলোর দিকে তাকিয়ে জিভে জল এলো তার। আবার পয়সাটা ছুঁলো এবং চোখ ভরে কলার স্বাদ নিতে নিতে এগিয়ে গেল। সে ভাবতে লাগল— পাচ্চু নায়ারকে আধুলিটা দিলে সে খুব খুশি হবে এবং সোমবারের চা-টাও পাওয়া যাবে। যে করেই হোক, কিছুক্ষণ সহ্য করতে হবে। উর্ধ্বমুখে বিড়ির ধোঁয়া ছুঁড়ে সে হাঁটতে লাগল।

নির্জন রাস্তা। দু'ধারে ছোট ছোট গাছ। সন্ধের হাওয়ায় জংলী ফুলের মিষ্টি গন্ধ হাওয়ায় একটা আমেজ এনে দিয়েছে। লাল জলন্ত খুরপির মতো আকাশটাকে দেখা যাচ্ছিল অনেক দূর পর্যন্ত।

তন্ময় হয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিল পোন্নন। হঠাৎ ঝরনার ঝিরঝির শব্দে তন্ময়তা ভেঙে গেল। পাশেই একটা ছোট জলাশয়। স্বচ্ছ জল। স্নান করারও সুবিধে আছে। পোন্ননেরও স্নান করার দরকার ছিল। পরনের কাপড় খুলে ঘাটের ওপর রেখে ও জলে নেমে পড়ল। ঠাণ্ডা জলের স্পর্শে শরীর জুড়িয়ে গেল ওর। অনেকক্ষণ পর্যন্ত গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে রাখল নিজেকে। তারপর গা মুছে কাপড় পরে নিল। পেট ভরে জল খাবার পর এখন আর সে ক্ষুধা বা দুর্বলতা বোধ করছিল না। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলল সে।

অন্ধকারে ছেয়ে আসছে চতুর্দিক। ঝরনার জলের শব্দটা এখনো কানে আসছিল। ফুলের মৃদু সুগন্ধও সে পাচ্ছিল। এই মুহূর্তে তার সমস্ত বিচারবোধ প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে যাচ্ছিল। পোন্নন রোমাঞ্চ বোধ করল। রাত্রির রঙিন দৃশ্য তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। ঈষৎ লজ্জিত হয়ে সে অন্য কিছু ভাববার চেষ্টা করল। কিন্তু সুন্দরী রমণীর চিন্তা তাকে ছাড়ল না। তাদের স্পর্শ করার জন্য স্পষ্টই লালায়িত হয়ে উঠল সে। মজুরনী আর ঘাসকুড়ুনি তার চোখে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। মেয়েরা সবই সুন্দর, বিশেষত বয়সটা যদি কম হয়। নোংরা কাপড়েও তাদের কত সুন্দর দেখায়! যদি এদের কাউকেই আমি বিয়ে করি, ভাবল পোন্নন। কিন্তু তা কী করে হবে! ওদের কাজ ফেরি করা; এক বাজার থেকে আর-এক বাজারে ঘুরে বেড়ানো স্ত্রীর সঙ্গে সে কী করে থাকবে! অথচ কত বছর হয়ে গেল, আজও তার তৃষ্ণা মিটল না।

হঠাৎই নিজের বয়সের কথা ভাবল পোন্নন। কিন্তু এ-ব্যাপারটাতেও সে একান্তই অনভিজ্ঞ। তার শুধু এটুকুই মনে আছে যে প্রায় দশ বছর ধরে সে কাউকে স্ত্রী রূপে পাবার স্বপ্ন দেখছে। দশ বছর!

ঝরনার ঝির-ঝির শব্দ এখনো শোনা যাচ্ছে। রাস্তায় হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে ফুলের সুবাস। পোন্নন তার উপযুক্ত পাত্রীর একটি আদল খাড়া করছিল মনে মনে। তাতেও সেই ঘাসকুড়ুনি বা মজুরনীর ছায়া এসে পড়ছে। সে যেই হোক-না-কেন, কুঁড়েঘরে তার সঙ্গে একান্তে দিনযাপন করতে পারে এমন এক যুবতী হলেই হ'ল।

অন্ধকারে ছেয়ে গেল আকাশ। সবুজ গাছগুলিকেও এখন চেনা কঠিন। গাঁয়ের ঘরে ঘরে প্রদীপের আলো জ্বলে উঠল। রাস্তাও বেশ অচেনা লাগছে। ঝরনাটা এতক্ষণে অন্য দিকে হারিয়ে গেল।

বেশ সচেতনভাবে রাস্তা হাঁটছিল পোন্নন। মনে হ'ল কেউ যেন আগে আগে হাঁটছে। তার হাঁটার ধরনে একটা অব্যক্ত ভিন্ন প্রকারের ছন্দ। পোন্নন আরো দ্রুত হাঁটতে লাগল। অগ্রবর্তীজন ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল।

চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পোন্নন তার কাছাকাছি পৌঁছে গেল। অবাক হয়ে দেখল—একটি যুবতী। বুকে পরিষ্কার উত্তেজনা অনুভব করল সে। ঠিক সেই সময় যুবতী তার দিকে পিছন ঘুরে তাকাল। যুবতীর বয়স বছর কুড়ির বেশি হবে না। তার বগলে একটি পুঁটলি। পোন্নন তার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল।

মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল তার। কিন্তু উত্তেজনার জন্যে কথা ফুটছিল না মুখে। কিছুক্ষণ কেটে গেল চুপচাপ। ঠাণ্ডা লাগছে। পোন্ননের শরীর কাঁপছিল, দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছিল।

যুবতীও তাকে দেখছিল ভয়, সন্দেহ আর বিনয়-মিশ্রিত ভাব নিয়ে। খানিক দূর গিয়ে পোন্ননের মনে হ'ল মেয়েটি বোধহয় তাকে বিশ্বাস করতে পারছে। তার শান্ত স্বভাব যে-কোন মেয়েরই বিশ্বাস অর্জনে সক্ষম, এই ভেবে পোন্নন কথা বলবার সাহস পেল। গদ্‌গদ গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

যুবতী ষোলো মাইল দূরের একটি জায়গার নাম বলল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কদ্দুর?'

পোন্নন জবাব দিল না। কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি আবার একই কথা জিজ্ঞেস করল। তখন সে তিন মাইল দূরের বাজারের নাম বলল।

আবার স্তব্ধতা। পোন্নন বার বার তাকিয়ে মেয়েটিকে দেখছিল। সে আসছে পিছনে পিছনে, নিঃশব্দে। পোন্নন জিজ্ঞেস করল, 'অতটা রাস্তা তুমি একা যেতে পারবে?'

'হ্যাঁ, কেন পারব না?' বেশ দৃঢ় গলায় বলল মেয়েটি।

'পৌঁছতে পৌঁছতে তো অর্ধেক রাত কাবার হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ—'

এইটুকু বলে মেয়েটি আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল।

পোন্নন জিজ্ঞেস করল, 'আসছ কোথা থেকে?'

অনেক দূরের একটা শহরের নাম বলল সে।

'সেখানে গিয়েছিলে কেন?'

'সেখানে একটা বাড়িতে কাজ করতাম।'

'তারপর?'

'কাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।'

'কেন?'

মেয়েটি যেন দ্বিধায় পড়ল একটু। অপ্রস্তুত গলায় বলল, 'খুব বড়ো অফিসারের বাড়ি।'

'তাতে কী?'

'কিন্তু লোক ভালো নয়।'

'কেন? মাইনে দিত না?'

'মাইনে দিত, আরো অনেক কিছু দিত।'

পোন্নন কিছু-কিছু বুঝতে পারছিল। বলল, 'তবে?'

'দাসী রাখার যোগ্য ছিল না।' লজ্জিত গলায় বলল মেয়েটি।

পোন্নন সবই বুঝতে পারছিল। অফিসারের ব্যবহারে ঘৃণা বোধ করল সে।

'ওর স্ত্রী ছিল না?'

'স্ত্রী তো আছেই, বড়ো বড়ো মেয়েও আছে। ওদের চোখে ধুলো দিয়ে দাসীর কাছে আসবার চেষ্টা করত।'

ততক্ষণে আরও ঘন হয়ে এল অন্ধকার। খুব কাছ থেকে ছাড়া কিছুই আর চেনা যায় না। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল দু'জনে।

'তোমার নাম কী?'

'মিনু—'

'কে কে আছে বাড়িতে?'

'মা, দু'টি ছোট বোন আর একটি ছোট ভাই।' মেয়েটি বলল, 'তোমার?'

'আমি একা।'

'মা, বাবা কেউই নেই?'

'না···'

'স্ত্রী?'

'না।'

মেয়েটিও নিঃসহায়। গভীর মনে নিজের কথা বলে যেতে লাগল। একজন সহৃদয় পুরুষের সামনে নিজের কথা বলার ইচ্ছা খুবই স্বাভাবিক।

এইভাবেই চলতে লাগল কথাবার্তা। অন্ধকার আরও বেড়েছে বলে পোন্ননের মনে হল।

'এই ঘন অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে তুমি বাড়ি পর্যন্ত যাবার কথা ভেবেছ?'

'আমি একটা মোমবাতি আর দেশলাই সঙ্গে নিয়েছি।'

'সে নিয়ে আর কতদূর যাবে?'

মেয়েটি উত্তর দিল না।

কিছুদূর গিয়ে পোন্নন জিজ্ঞেস করল, 'মোমবাতি জ্বালবে?'

'না।'

'কাল সকালে গেলেই ভালো করতে।'

'সম্ভব নয়।'

পোন্নন ভাবল, মেয়েটি রাজী হয়ে গেলে কোথায় আশ্রয় দিত সে। এইরকম ভাবতে ভাবতে সে এগিয়ে যাচ্ছিল। যুবতীও যেন কিছু ভাবছিল।

মাইল দুয়েক হাঁটার পর মনে হ'ল আটটা বেজে গেছে। অন্ধকার এত বেশি যে একজন অপরজনের মুখ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না। হাঁটতে হাঁটতে কখনো বা দু'জনে গায়ে গায়ে লেগে যাচ্ছিল, তবু পোন্নন মোমবাতিটা জ্বালবার কথা বলল না। মিনু নিজেও জ্বালালো না।

চলতে চলতে একটা মোড়ের কাছে এসে কিছুটা শঙ্কিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। সামনে তাড়ির দোকান, দোকানের আলো এখান থেকেও দেখা যায়। রাস্তার দু'ধারের বড়ো খুঁটিতে টাঙানো কাপড়ে বড়ো বড়ো অক্ষরে 'তাড়ি' কথাটা লেখা, যাতে দূর থেকেই আকৃষ্ট হয় ক্রেতারা। জায়গাটা ভোরের মতো ফর্সা হয়ে আছে। গরুর গাড়ির চালকরা ওখানে বিশ্রাম করছে। সারা রাত ধরে আসর জমাট থাকবে।

'ছাখো, ওখানে আলো আর ভিড় খুব বেশী।' পোন্নন মোড়ের দিকে সঙ্কেত করে সম্ভ্রমপূর্ণ গলায় বলল, 'ওখানে অনেকেই আমাকে চেনে। আমরা বরং রাস্তা থেকে নেমে ক্ষেতের ভিতর দিয়ে ঘুরে যাই—'

'আমি যাব না, আমি এদিক দিয়েই যাব।'

'ছাখো কেউ বোধহয় আসছে। আমাদের দেখতে পাবে। এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। চলো, ওদিক দিয়েই যাই।'

পোন্নন এগিয়ে গেল, মিনু অনুসরণ করল তাকে।

আবার অন্ধকারে হারিয়ে গেল দু'জনে। ফার্লং খানেক যাবার পর পোন্নন টিলার ওপর চড়ল, মিনুকেও টেনে তুলল হাত ধরে। আকন্দমূল আর ধানের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে হাঁটতে লাগল দু'জনে। মিনুর হাতটা ধরে রেখেছিল পোন্নন। ঘন সবুজ বৃক্ষরাজির

মধ্য দিয়ে রাস্তা করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিল। মিনু হাঁফাতে শুরু করল।

উঁচু-নীচু রাস্তা পেরিয়ে অনেকটা এগিয়ে এলো ওরা। টিলা ছেড়ে রাস্তায় নামল। মাইল দেড়েক রাস্তা এগিয়ে এসেছে, এখন আর বিপদ নেই। নির্জন রাস্তা; জনমানুষহীন। পোন্নন এখন কিছুটা সাহস পাচ্ছে। তার শরীরের কয়েক জায়গাই খোঁচা লেগে ছড়ে গেছে, কিছুই ভ্রূক্ষেপ করল না সে।

মিনু জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথায় থাকো?'

'আমার কোন ঠিকানা নেই।'

'তাহলে?'

'যেখানে হোক থেকে গেলেই হ'ল।'

সে আবার এগোতে লাগল। একটা ছোট কুঁড়ের সামনে এসে থেমে দাঁড়াল। বলল, 'এখানে বিশ্রাম নিয়ে আবার সকালে রওনা হওয়াই বোধহয় ভালো।'

'না, আমি এখন যাব।'

পোন্ননের হাত ছাড়িয়ে এগোতে লাগল মিনু। এগিয়ে গিয়ে পোন্নন ওকে দাঁড় করালো।

'একা একা তুমি ওই বাজার পর্যন্ত যেতে পারবে না। কেউ ধরে নিতে পারে। আমার কথা শুনলে ভালোই করবে।'

'বলছ! আমি নিজের দায়িত্ব ঠিকই নিতে পারব। ইচ্ছে হলে তুমি এই কুঁড়েতে থেকে যেতে পারো।'

মিনু এগিয়ে গেল। দূরে হঠাৎ আলো দেখতে পেল পোন্নন।

'কারা আসছে! দেখতে হবে।' অনুনয়ের গলায় পোন্নন বলল, 'তুমি কুঁড়ের ভিতর এসো।'

'না, আমি আসব না, আগেই তো বলেছি!'

'কিছু যদি হয়!'

'তাহলেও—'

আলোটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। ভয়ে বুক কাঁপতে লাগল পোন্ননের। পকেট থেরে আধুলিটা বের করে মিনুর হাতে দিয়ে বলল, 'এইটা রাখো। আমার কাছে আর কিছুই নেই। সকালের গাড়িতে তুমি যেতে পারবে। এখন এখানে থেকে যাওয়াই ভালো। তাড়াতাড়ি ভিতরে এসো।'

মিনু একটু ইতস্তত করল। তারপর আধুলিটা হাতে নিয়ে বলল, 'এখানে কেউ থাকে না তো?'

'না। এটা চায়ের দোকান, এখন খালি আছে। আলোটা এসে পড়ল, তাড়াতাড়ি এসো।'

পোন্নন মিনুর হাত ধরতে ধরতে দেখল আধুলিটা আঁচলে বেঁধে রেখেছে ও।

মিনু বলল, 'গাড়িতে যাব না। পয়সাটা মাকে দিয়ে দেব।'

পোন্ননকে অনুসরণ করল মিনু। কুঁড়ের দরজাটা খুলে ঝুঁকে ভিতরে ঢুকল পোন্নন। মিনুও এলো। ভিতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল পোন্নন।

খানিক দু'জনেই দাঁড়িয়ে থাকল অন্ধকারে। আশঙ্কা কেটে যেতে পোন্নন মোমবাতি জেলে একটা উঁচু জায়গায় রাখল। তারপর শুকনো নারকেল পাতা বিছিয়ে মিনুকে বসতে বলল।

'বাতিটা আনো তো,' পুঁটলি খুলতে খুলতে মিনু বলল। আলোটা সামনে এনে পোন্নন ওর ছড়ে-যাওয়া পায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী হয়েছে?'

'চলতে চলতে হয়েছে।' পুঁটলি থেকে একটা কলা বের করে পোন্ননকে দিল মিন্নু। পোন্ননের মনে পড়ল দোকানের দড়ির আগুনে বিড়ি ধরাবার সময় সে এইরকম কলাই দেখেছিল। লাল্চে পাকা রঙের কলা। বলল, 'তুমিই খাও। আমি চা খেয়েছি।'

'আমি একটা খেয়েছি। এখন ক্ষিদে নেই।' কলাটা খাবার জন্যে আবার সে পোন্ননকে বলল।

পোন্নন কলাটা না নিয়ে পারল না। কিছুটা খেয়ে শেষাংশটুকু খাইয়ে দিল মিন্নুকে। বলল, 'তোমার কাছে বোধহয় কিছু পয়সা আছে, তাই না?'

'বটে আর কী! আনা দুয়েক ছিল। তিন পয়সার কলা কিনেছি, বাকী পয়সায় মোমবাতি আর দেশলাই।'

'তো এক্ষুনি যে বললে একটা কলা খেয়েছ?'

'ক্ষিদে নেই বলেই বলেছিলাম।'

'তাহলে কিনেছিলে কেন?'

'বাড়ি যাচ্ছি। ভেবেছিলাম ছোট ভাইটিকে দেব।'

'এখন কী করবে?'

'কাল আবার কিনব।' হঠাৎ কী মনে হওয়ায় আঁচলে বাঁধা আধুলিটা ছুঁয়ে দেখল মিন্নু।

আলোটা হঠাৎ নিবে গেল। নারকোল পাতার ভিতর থেকে এতক্ষণ একটা পোকা ডাকছিল, এবার চুপ করে গেল। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার শুরু করল ডাকতে। আধ ঘণ্টা সময় কেটে গেল। কখনো থেমে কখনো শব্দ করে ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে। ডাকার ধরনটা অনেকক্ষণ ধরে একইরকম থেকে গেল।

মধ্যরাত অতিক্রম হয়েছে। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো পোন্নন। শরীরময় ঘামের ভাব। বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়া। তারার আলোয় রাতের অন্ধকার এখন কিছুটা সহনীয় মনে হয়। পোন্নন মাটির ওপর বসে পড়ল। পেটে ক্ষুধা ভিন্ন এখন আর কিছুই নেই, ক্ষুধায় জ্বালা ধরেছে অন্ত্রে। দু'হাতে পেট চেপে ধরল সে। ক্ষুধা নিবৃত্ত করার জন্য তার চোখ এখন জল খুঁজছে। কিন্তু এখানে কোথায় জল পাবে! অনন্যোপায় পোন্নন সেখানেই কিছুক্ষণ শুয়ে থাকল। ঠাণ্ডা মাটিতে শুয়ে স্বস্তি হ'ল কিছুটা। আবার সে উঠে দাঁড়াল।

কাল কী হবে ভেবে পোন্ননের মাথা ঘুরতে লাগল। ক্ষুধার তাড়না আর সহ্য হচ্ছিল না। ইচ্ছে হচ্ছিল কাল সকালে চায়ের দোকানে যা আছে সবই সে খেয়ে নেবে একসঙ্গে। কিন্তু সঙ্গে তো একটিও পয়সা নেই! সকালে কী হবে! পোন্ননের মনে হ'ল না খেয়েই মৃত্যু হবে তার।

মিন্নু কি ঘুমোচ্ছে? সেও তো আমার মতনই ক্ষুধার্ত? কাল কী খাবে তা নিয়ে সেও নিশ্চয়ই ভাবছে। শুধু নিজের কথাই নয়, ভাবছে গোটা পরিবারের কথা। পেটে আগুন জ্বলছে— এই অবস্থায় কুঁড়ের দরজা খুলে আবার ভিতরে ঢুকল পোন্নন।

একটা দেশলাই জ্বালল। এলোমেলো হয়ে শুয়ে আছে মিন্নু। হাতের আলোটা পোন্নন ওর মুখের কাছে নিয়ে গেল। মিন্নু এতই অকাতরে ঘুমোচ্ছে যে কিছুই টের পেল না। কী করে ঘুমোচ্ছে এত! পোন্নন আর ওর দিকে তাকাতে পারছিল না।

আলোটা নিবে যাবার পর পোন্নন হঠাৎ একটা উপায় ভেবে ফেলল। ক্ষুধার জ্বালায় সে ক্রমশ জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ছিল। শরীর

আর মনে সাড় ছিল না কোন। মিন্নুর খুব কাছে গিয়ে বসল সে। মিন্নুর গরম নিশ্বাস পেটে এসে লাগল। সে চম্‌কে উঠল।

কালকের সমস্যাটাই তার কাছে এখন সবচেয়ে বড়ো। এখন একমাত্র চিন্তা, কালকের দিনটা কী ক'রে কাটবে।

ঘুম ভাঙার পর মিন্নুও নিশ্চিত একই কথা ভাববে। সেও তো ক্ষুধার্ত। আমি কী করব, পোন্নন ভাবল, পৃথিবীতে নিশ্চয়ই আমার মতো অসংখ্য ক্ষুধার্ত আছে।

মিন্নুর গায়ের কাছে সাবধানে বসে ওর আঁচলটা খুঁজল পোন্নন। সুখে ঘুমোচ্ছে মিন্নু, সম্ভবত স্বর্গরাজ্যের স্বপ্ন দেখছে! ধীরে ধীরে ওর আঁচলের গিঁটটা খুলে ফেলল পোন্নন। আপাতত ইন্দ্র-লোকের রাজার কোলে মাথা রেখে উর্বশীর মতো মিন্নু ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক। আধুলিটা বের করে নিল সে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ঘন অন্ধকারে একবার মিন্নুর দিকে তাকাল। একই সঙ্গে দুঃখ এবং কৃতজ্ঞতায় মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার।

মুখ যিনি দিয়েছেন খাদ্যও তিনিই দেবেন। এই ভেবে বাইরে বেরিয়ে এলো পোন্নন; তারপর রাস্তায় নেমে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল।

জয়মালা

নাগবল্লী আর. এস. কুরূপ

দক্ষিণ ভারতের শহরগুলোর সঙ্গে তার পরিচয়টা বেশ ঘনিষ্ঠ। যেখানেই অনেক লোক জড়ো হয় সেখানেই পৌঁছে যায় সেই সাপুড়ে। .

লম্বা, রোগা, কালো রঙের লোকটি। ঘন গোঁফ আর লাল গোল গোল চোখ তার মুখে এনে দিয়েছে গাম্ভীর্যের ছাপ। কাঁধে ঝোলা আর মাথার ওপর থরে থরে সাজানো গোল মাপের কয়েকটি ঝাঁপি। বউ আর একটা বাচ্চাও তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে ছায়ার মতো।

সাপুড়ে মাথার বোঝা মাটিতে নামানোর সঙ্গে সঙ্গেই ঝোলা থেকে একটা বাজনা বের করে বাজাতে শুরু করে তার বউ। তার মানে খেলা এইবার শুরু হবে। সাপুড়ে তার বীণে ফুঁ দেয়, সেই ধ্বনির আকর্ষণে ঝাঁপির ভিতর ফুঁসতে থাকে সাপগুলো। লোকজন জড়ো হলে সাবধানে ঝাঁপি খোলে সে। বাপ রে! ঝাঁপি থেকে ভয়ংকর একটা সাপ বেরিয়ে আসতেই ঠিকরে ওঠে তার চোখ। স্তম্ভিত হয় দর্শকরাও। মন্ত্র পড়ে সেই সাপকে বশ করে ফেললেও কারুই ভয় যায় না।

বীণের শব্দে ফণা দুলিয়ে নাচতে থাকে সাপ। দর্শকরাও মজে যায় খেলায়।

সাপুড়েকে বলা যায় এক গুণী শিল্পী। পেশা জমানোর সব

গুণই তার আয়ত্তে। লোকে তার বীণ আর বাজনার শব্দে আকৃষ্ট হবেই। ভিড় জমলেই শুরু হয়ে যায় খেলা; সে-খেলা তার বউয়ের সঙ্গে বাক্যালাপের মাধ্যমে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চালিয়ে যায়। তামিল আর মলয়ালম দুই ভাষা মিলিয়ে কথা বলে সে, নিজেই প্রশ্ন করে আর উত্তর দেয় নিজেই— এইভাবেই জমে যায় খেলা।

'এই মেয়ে, বল, এই সাপটা কেমন?' সাপুড়ে জিজ্ঞেস করে বউকে।

'ভালো সাপ।' বউ জবাব দেয়।

'কামড়ালে···?'

'খারাপ সাপ।'

'খারাপ সাপ কামড়ালে কী হবে?'

'পতন।'

'পতন হলে কী করতে হবে?'

'বীণ বাজাতে হবে···'

'বীণ বাজালে কী হবে?'

'সাপ নাচবে।'

'ঠিক, তুই খাঁটি কথা বলিস। বীণ বাজালে সাপ নাচবে। আর কামড়াবে না। তাই তো?'

'হ্যাঁ—'

বীণ বেজে ওঠে। সাপও নাচতে শুরু করে। আর-একটি ঝাপি খুলে সকলকে সাপ দেখায় সে। সমবেত লোকজন নিজেদের ভুলে মগ্ন হয়ে যায় সেই খেলায়।

তখন সাপুড়ে দর্শকদের নিজের কাহিনী শোনায়।

বাচ্চা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলে, 'এই বেটি, এদিকে আয়…'

মেয়েটা সাপুড়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়!

'নিজের নাম বল।'

'সাপুড়ের মেয়ে।'

'ক'দিন খেতে পাসনি?'

'চা'র দিন।'

'চার দিন্…?'

'হ্যাঁ।'

'সাপুড়ের মেয়ে! তুই বেঁচে আছিস কী করে?'

'সাপুড়ের মেয়ে এইভাবেই থাকে।'

'কী ভাবে?'

'না খেয়ে!'

'শুনুন বাবুরা!' ঘুরে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে সাপুড়ে বলে 'আপনাদের ছেলেমেয়ের মতোই বাচ্চা এই মেয়েটা। চারদিন খেতে পায়নি কিছু, কারণ ও সাপুড়ের মেয়ে।'

তারপর দর্শকদের সামনে সে একটা নিষ্ঠুর আর গম্ভীর প্রশ্ন রাখে।

মেয়েকে বলে, 'এই গোপ্পে মেয়ে, শান্ত হ। আজ তুই খেতে পাবি। আমি যা বলব শুনবি?'

'শুনব।'

'শাবাস্! বল, মেয়েদের বিয়ের জন্যে কিসের মালা চাই?'

'ফুলের মালা।'

'সাপুড়ের মেয়ের বিয়ের জন্যে কোন্ মালা চাই?'

'সাপের মালা।'

'ঠিক। সাপের মালা গলায় দিয়ে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে সব বাবুদের সামনে যা। তোর নিশ্চয়ই খাবার মিলবে।'

গলায় সাপের মালা পরা মেয়েটির হাতের পাত্রে সবাই কিছু-না-কিছু দেয়। ক্ষুধার জ্বালায় গলায় সাপের মালা-পরা মেয়েটির জন্য সহানুভূতিতে নয়, ভয়েও নয়, শুধু ওই ভয়ংকর দৃশ্য থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য।

কেউ খবর রাখে না ওরা কোন্ দেশের মানুষ। কী ওদের নাম। তিনজনের পরিবারটি উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ায় শুধু।

মাটির ওপর অথবা ছাদের নীচে সংসার পাতে না তারা। বদ্ধ ঘরের অপবিত্র হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে জীবনধারণও করে না। তারা শ্বাস নেয় মুক্ত পৃথিবীর বিশুদ্ধ হাওয়ায়। টাকা পয়সা বা পৃথিবীর অন্য বস্তুর সঙ্গে তাদের তুলনা করা যায় না। প্রেমে ভরা তাদের জীবন। একটা নিশ্চিত সীমানা-চিহ্নিত আশ্রয়, বর্ষার বৃষ্টিতে মাথা বাঁচানোর ছাদ, আগামীকালের জন্যে 'রুজির ব্যবস্থা করে রাখা — সবকিছু থেকেই দূরত্বময় তাদের জীবন। দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রাম্যমাণ এই পরিবারটি বস্তুত একটি উঁচুদরের শিল্প-সুষমার সজীব প্রকাশ।

এই পরিবারের আড়ালে একটি গভীর প্রণয়কাহিনীও লুকিয়ে থাকতে পারে। বেশ কয়েক বছর আগে ওই স্ত্রী ও পুরুষটি প্রেমে আবদ্ধ হয়ে একত্র জীবনযাপনের কথা ভেবেছিল। বিস্তৃত আকাশের নীচে, চন্দ্র-তারা সাক্ষী রেখে তারা একের প্রতি উৎসর্গ করেছিল অন্যকে। বাধাবন্ধনহীন ইতস্তত ভ্রাম্যমাণ একটি পুরুষ

পেয়েছিল তার জীবনসঙ্গিনীকে আর স্ত্রীটি পেয়েছিল সহায়ের প্রতিমূর্তি এক পুরুষকে। দু' জনের সুন্দর সামঞ্জস্যের ফল— ঐ মেয়েটি।

ওই পরিবারের বন্ধনের মধ্যে আছে মাধুর্য আর দৃঢ়তা। সেটা কেবল বাইরের চেহারাতেই নয়। স্বামীর নিশ্চিত আশ্রয়ে থাকা স্ত্রী বা পৈতৃক সম্পত্তির ওপর বসবাসকারী সন্তান— এসব কিছুই বলা যাবে না তাদের সম্পর্কে। বস্তুত এরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের আশ্রয়। .আদর্শ জীবনের রূপ যদি খুঁজতে হয় এদের মধ্যেই পাওয়া যাবে।

পরিবারটি ঘুরেছে অনেক জায়গায়। দক্ষিণ ভারতের অনেকগুলি শহরে কয়েকবারই ওরা খেলা দেখিয়েছে। রাত কাটিয়েছে মন্দির আর ধর্মশালায়। হাজার হাজার মাইল ভ্রমণ করতে করতে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে ওরা।

একবেলা আহারের নিশ্চয়তাও এদের নেই। গরীবের মরে-বেঁচে কোনক্রমে টিকে থাকার ছবি ওরা— এই পরিবারটি। জীবনের পথ দীর্ঘ, সেই পথের বহু দুঃখ-দুর্দশায় এতটুকু ভীত না হয়ে মন শক্ত করে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা।

আরো চার-পাঁচ বছর কেটে যায়। ইতিমধ্যে নানা রোমাঞ্চকর ঘটনায় পৃথিবী পরিবর্তিত হয়েছে অনেকটা। পরিবর্তনটা এতই বেশি যে কোন কোন শহরকে আর চেনাই যায় না। নিত্য-নতুন আবিষ্কারের ফলে শহরের চেহারা গেছে বদলে। প্রগতির নিয়মে নতুন কর্মধারার সংস্পর্শে এসে অনেকেই ছেড়ে দিয়েছে তার পুরানো কাজ। কিন্তু সাপুড়ের কাজের পরিবর্তন হয় নি কোন।

পুরনো ঝাঁপি মাথায় স্ত্রী আর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এখনো সে খেলা দেখিয়ে বেড়ায়। সময়ের কঠিন হাতও পরাভূত হয়েছে ওই সাপুড়ের কাছে; তবু সময়ের ছাপ পড়েছে তার শরীরে। অন্তহীন ভ্রমণে তার শরীর হয়ে পড়েছে ক্ষীণ। বছরের পর বছর নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ তার পা-দু'টি আর এগোতে চায় না। জীবন-যুদ্ধের আঘাতে ক্লান্ত লাগে শরীর। সাপুড়ের আত্মাই তাকে বলে জীবনের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি আর তার মধ্যে নেই। অক্ষম হয়ে এক জায়গায় পড়ে থাকার দুশ্চিন্তা সত্যিই আজ ভাবিত করে তুলেছে তাকে।

সাপুড়ের একমাত্র মেয়েটিরও কম পরিবর্তন হয় নি এই ক'বছরে। শান্তশিষ্ট মেয়েটি আজ লাবণ্যময়ী তরুণী। দুঃখকষ্টের কঠিন আবহে থাকতে থাকতে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এসেছে সুডৌল সৌন্দর্য।

তার চেহারার আকর্ষণ একেবারে অন্যধরনের। সেখানে শহরের মেয়েদের মতো নিছকই বাইরের ঠাট নেই। সাধারণ পোষাকেও তার সুডৌল শরীরের সৌন্দর্য ফুটে বেরোয়। জন্মাবধি কষ্টে জীবন অতিবাহিত করার জন্য তার শরীরও হয়েছে কঠোর; কামুক পুরুষের তীব্র কটাক্ষ আর প্রলোভন পরাস্ত করার ক্ষমতা তার আছে।

মেয়ের যৌবন বাপকে চিন্তিত করে তুলল। যৌবনবতী এই সলজ্জ মেয়েটি তার চোখের সামনে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে প্রশ্নের মতো। সব বাপ-মা'ই অবশ্য এই প্রশ্নে বিচলিত হয়ে পড়ে। আজকের ব্যবসায়িক পৃথিবীতে বিয়ে সত্যিই এক সমস্যা!

টাকা-পয়সার বিনিময়ে বিবাহেচ্ছু পুরুষদের দৌলতে গরীব মেয়েদের আজকের পৃথিবীতে কুমারীই থেকে যেতে হয়। বিশেষত

সে যদি হয় এক গরীব সাপুড়ের মেয়ে, বিয়েতে পণ দেওয়ার জন্যে যার বাবার কাছে তিনটি বুড়ো সাপ ভিন্ন আর কিছুই নেই। আজকের পৃথিবীতে একজন সাপুড়ের জীবনপ্রণালী স্বীকার করে নেওয়ার মতো কোন যুবকও কি আছে!

হতভাগ্য পিতার কাছে এ-সব প্রশ্নের জবাব নেই কোন। শুধু তার হৃৎকম্পনই বেড়ে চলে।

সেই রাতে মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ার পর সাপুড়ের স্ত্রী ধীর গলায় জিজ্ঞেস করল স্বামীকে, 'মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না?'

'সাপুড়ের মেয়েকে কে বিয়ে করবে?'

'হ্যাঁ, ভগবানই দেখবেন।'

এইভাবে নিজেদের চিন্তার ভার তারা নামিয়ে দেয় ভগবানের পায়ে।

কিছুক্ষণ পরে মা নিজেকেই প্রশ্ন করে নিজে, 'ভগবান কেন এই মেয়েটিকে পাঠালেন আমার কাছে? আর যদি দিলেনই, এত গরীব ক'রে কেন?'

এ-প্রশ্নের কোন্ উত্তর বিধাতা দেবেন?

অন্ধকার রাতের নিস্তব্ধতার ভিতর, দুঃখকষ্টে নিমজ্জিত হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে সেই প্রশ্ন ছড়িয়ে যায় দিকে দিকে। প্রকৃতিও যেন নিশ্বাস বন্ধ করে ঝিমুচ্ছে। হঠাৎ কাছেই গাছে-বসা পেঁচার 'হুঁ'-আওয়াজে সে সত্যের যেন স্বীকৃতি মেলে।

ঘুমন্ত মেয়ের দিকে তাকিয়ে মা বলল, 'হতভাগিনী, ঘুমোচ্ছিস! কেন তুই এই পাপিনীর পেটে জন্ম নিয়েছিলি?'

কুড়ি বছর আগে এই মেয়েকে গর্ভে ধারণ করার সুন্দর আনন্দে

সে-গর্ভযন্ত্রণা ভুলে গিয়েছিল। তখন ভাবে নি ভবিষ্যতে কোনদিন এ-ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। মেয়ের কান্না শুনে আনন্দিত পিতাও ভাবে নি কোনদিন এই মেয়েই একটা বড়ো সমস্যা হয়ে দেখা দেবে!

এমনকি, মেয়ে যখন বড়ো হ'ল আস্তে আস্তে, হাত-পা ছুঁড়তে লাগল, হাঁটতে শিখল, তখনও অনুমান করে নি সে কোনদিন এমন সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে!

টাকার মূল্যে নিরূপিত এই পৃথিবীতে মেয়ের যৌবনে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গরীব বাপ-মা'র বুক চাপড়ানো ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না!

মেয়েও বুঝতে পারে বাপ-মা'র হৃদয়-যন্ত্রণা। সে ঘুমোয় না, জেগে ঘুমিয়েই মা-বাবার কথাবার্তা শুনে দুঃখের স্বরূপ বুঝে নেয়। তারও হৃদয়ে বাজতে থাকে একই যন্ত্রণা। একইভাবে, দুঃখিত হৃদয়ের পাষাণভার সেও সমর্পণ করে ঈশ্বরের পায়ে।

কিছুদিন থেকেই একটি যুবক সাপুড়ে পরিবারটিকে অনুসরণ করছিল। সাপুড়ে তার কারণ বুঝতে পেরেছিল, তবু চাইছিল যুবকটির মুখ থেকেই সব শুনবে। সেইজন্য নিজে থেকে যুবকটিকে সে কিছুই জিজ্ঞেস করল না।

একদিন সন্ধ্যায় যুবকটি সাপুড়ের কাছে এসে মনের কথা খুলে বলল।

আপাদমস্তক যুবকটিকে নিরীক্ষণ করে সাপুড়ে জিজ্ঞেস করল—

'তোর বাপ-মা বেঁচে আছে?'

'না।'

'সাপ খেলাতে পারিস ?'

'পারি। জাতে আমিও সাপুড়ে, আমার বাপও সাপুড়ে ছিল।'

'তাহ'লে সাপুড়ের কাজ করতে রাজি আছিস ?'

'হ্যাঁ।'

'তোর বাড়ির আর পরিবারের অন্য লোকেরা আছে ?'

'না, আমি একা-একাই ঘুরি।'

সাপুড়ে চুপ করে ভাবল, তারই মতো ভবঘুরে একজন যদি জামাই হয়, মন্দ কী!

গরীবের বউও গরীবই হয়।

কিছুক্ষণ ভেবে সাপুড়ে বলল, 'ঠিক আছে, তোর যখন এমনিই ইচ্ছে তাহ'লে যা— শহরের ওদিকের জঙ্গল থেকে একটা বড়ো জাতের সাপ ধরে নিয়ে আয়। আমার মেয়ে ছোটবেলা থেকেই গলায় সাপের মালা পরে। সাপের দাঁত থেকে বিষ বের করে মেয়ের গলায় পরিয়ে দে। তারপর তোদের বিয়ে দেওয়া যাবে।'

ছোটবেলা থেকে সাপের মালা গলায় পরেছে যে মেয়ে, জয়মাল্য রূপেও তার দরকার সাপের মালা। বাপের ইচ্ছেও তাই। কথা শুনে যুবক কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

সাপুড়ে বলল, 'আমার কাজ যাতে আমার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ না হয়ে যায়, সেইজন্যেই কথাগুলো বললাম আমি।' এই তার ইচ্ছে, পরম্পরা রক্ষার ইচ্ছে— যাতে তার সঙ্গে সঙ্গেই সবকিছুর শেষ না হয়। সেই পরম্পরা রক্ষার ক্ষমতা ভাবী জামাইয়ের আছে কিনা সেটাই শুধু জেনে নিতে চায়। শুধুই পরীক্ষা করতে চায়।

যুবক তাকে প্রণাম করে রওনা হ'ল। কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে সাপুড়ে বলল, 'সাবধানে যাবি। ভগবান তোকে দেখবেন।'

দু'জনের কথাবার্তা মেয়েটি শুনেছিল। সাপুড়ে যেন কিছুক্ষণের জন্যে মেয়ের উপস্থিতি ভুলেই গিয়েছিল। সে বুঝতে পারে নি, ইতিমধ্যে তার মেয়েও যুবকটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, তার রঙ ও চেহারা মেয়েরও খুব পছন্দ। আগে থেকে মেয়ের মন জানতে পারলে সাপুড়ে হয়তো যুবকটিকে এত বড়ো পরীক্ষার সম্মুখীন হতে পাঠাত না।

সেই জঙ্গলে যে অসংখ্য সাপ আছে এটা অনেকেরই জানা। পরের দিন সকালে যুবকটি বীণ নিয়ে পৌঁছে গেল এবং নির্দিষ্ট জায়গায় এসে কুলদেবতাকে অভিবাদন করে বীণে সুর তুলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝোপঝাড়ে শুরু হ'ল পাতার কম্পন আর শব্দ। তা শুনে আরো উৎকণ্ঠা নিয়ে বীণ বাজাতে শুরু করল সে।

ঝোপের আড়ালে ভয়ংকর শব্দ হচ্ছে। সে ঘাবড়ে গেল, তবু বীণের সুর থামাল না। এক-একটি মুহূর্ত যেন এক-একটি যুগের সমান। বীণের শব্দে আকৃষ্ট সাপটি বেরিয়ে আসতেই যুবকের চোখ কপালে উঠল। একটা ভয়ংকর কালকেউটে ফণা তুলে [illegible]ছে সামনে। জলন্ত চোখদুটি বীণের ওপর নিবদ্ধ। একবার বীণ বন্ধ করলে বা একটু নড়লেই ছোবল মারবে। বসার জায়গা থেকে একটুও না ন'ড়ে, বীণ একটুও না থামিয়ে সাপের গলা চেপে ধরতে হবে।

সে দৃশ্য দেখে কঠিনতম হৃদয়ও বিচলিত হয়ে পড়ে— এমনই কঠিন তার পরীক্ষা। যুবকের মনে হচ্ছিল জীবন শেষ হয়ে আসছে, মৃত্যুর সঙ্গে তার ব্যবধান আর সামান্যই। মাথা

নাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরও দুলতে লাগল। আরো জোরে জোরে বীণ বাজাতে লাগল সে।

সেদিন সকাল থেকেই সাপুড়ের মেয়ের মন চঞ্চল হয়ে আছে। নিজের ভাবী স্বামীর পরীক্ষার কথা যতই ভাবছে ততই অজানা এক আশঙ্কায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে মন। বেলা যত বাড়তে লাগল ততই আশঙ্কা বাড়তে লাগল তার। দুপুর গড়িয়ে যেতেও যখন যুবকটি ফিরে এলো না, মেয়েটির মনে হ'ল তার হৃদ্‌স্পন্দন এবার থেমে যাবে। তখন, বাপ-মার নজর এড়িয়ে, সে ছুটে গেল জঙ্গলের দিকে।

দু'ঘন্টা ধরে এক নাগাড়ে নেচে যাচ্ছে সাপটা। এতটা সময় হয়ে যাবার পরও যুবক তাকে ধরতে পারে নি। হাত নাড়লেই ফোঁস তুলে ছোবল মারবে। যুবকের মনে হ'ল নিবিষ্টতার মধ্যে সে সাপের নিশ্বাসের শব্দও শুনতে পাচ্ছে। এতক্ষণ ধরে বীণ বাজানোর ফলে তার ফুসফুসে অসম্ভব চাপ পড়ছিল। গা দিয়ে দরদর করে ঝরছে ঘাম। চোখ লাল। মনে হচ্ছিল ক্লান্তিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে। মনে হচ্ছিল সাপ নয়, তার সামনে প্রতিভাসিত তার আরাধনার মূর্তি। তার স্বর্গত পিতা ও মাতা হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে। তার মাথা ঘুরতে লাগল। কানের ভিতর অস্পষ্ট নানা শব্দের ধ্বনি সৃষ্টি হতে লাগল। তবুও সে বীণ বাজানো থামাল না।

ভয়ংকর সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে চীৎকার করে কেঁদে উঠল

মেয়েটি। সেই শব্দে যুবকটি পিছন ফিরে তাকাতেই তীক্ষ্ণ ছোবল মারল সাপটি।

অসহ্য যন্ত্রণা সত্ত্বেও শক্ত হাতে সাপের মাথাটি ধরে ফেলল যুবক। সাপটি ছটফট করছে, তবু মুঠি শিথিল করল না। ক্রন্দনরত যুবতীটিকে সেই সাপ দেখিয়ে বলল, 'ছাখো, আমি জয়মালা পেয়েছি।'

যুবতী কান্না বন্ধ করল। একসঙ্গে অসংখ্য নীরব চিন্তা দাপাদাপি করে বেড়াল তার মাথায়। স্তব্ধ চোখ, যেন এই মুহূর্তে সে কিছু প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছে। হঠাৎ যুবকটির সামনে গিয়ে মাথা নীচু করে সে বলল, 'দাও, পরিয়ে দাও আমার গলায়।'

যুবক চমকে উঠল। ভালোবাসার এই রূপ স্তব্ধ করে রাখল তাকে।

'সময় চলে যাচ্ছে, পরিয়ে দাও গলায়।' যুবতী অনুনয় করল।

যুবকটির সারা শরীর তখন নীল হতে চলেছে বিষে। কাঁপা গলায় বলল, 'আমার স্ত্রী!'

'আমার স্বামী!'

প্রেম-সাহিত্যের মিথ্যাচারণের বাইরে, দূরে, দুই আত্মার প্রেম উচ্চারিত হ'ল মাত্র দুটি কথায়। ওদের যা-কিছু বলার ছিল সামান্য দুটি শব্দের মধ্যেই ওরা তা প্রকাশ করেছে।

মাত্র দুটি শব্দ, 'আমার স্ত্রী।' আর 'আমার স্বামী!' বিশ্বের সমুদয় প্রেম-কাব্যের তাৎপর্য যেন লুকিয়ে আছে ওই দুটি মাত্র শব্দে।

অধীর গলায় মেয়েটি বলল, 'মালা পরাবে না?'

কম্পিত হাতে, যন্ত্রণাকাতর মুখে বেদনা নিসৃত করতে করতে যুবক সেই জয়ের মালা পরিয়ে দিল যুবতীর গলায়।

সাপ তার গলায় জড়িয়ে গিয়ে তীব্র দংশনে উদ্যত হ'ল।

'আমার স্ত্রী!' বলতে বলতে অচৈতন্য যুবক পড়ে গেল মাটিতে। 'আমার স্বামী!' বলতে বলতে মেয়েটিও অচৈতন্য হয়ে যুবকের পাশে আছড়ে পড়ল।

জীবনে নয়, মৃত্যুর মধ্যেই ওদের মিলনের সংঘটক জয়মালা ধীর গতিতে বুকে হেঁটে তার গুহায় ফিরে গেল।

ফ্রিজ

ই. এম. কোবুর

খাবার ঘরের দিকে একটা চৌকির ওপর সাদা রঙের রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজিডিয়ারটি রাখা। বস্তুটির দিকে তাকালেই দুটো উপমা মনে আসে। এক, উত্তর ভারতের কোথাও দেখা মারবেল পাথরের শিবলিঙ্গ, আর দ্বিতীয়টি হ'ল— সাদা ঘোমটায় মাথা-ঢাকা বিশালবপু আর পেটুক গুজরাতি বধূ। দ্বিতীয় উপমাটি একদিন মোলিকুট্টিকে বললাম। মোলি তখন আমাদের ম্যানেজার মেননের ঘরে দেখে আসা টিকোজির মতো একটা টিকোজি বুনতে ব্যস্ত; কথাটা শুনে এমনভাবে তাকাল, যেন হোমটাস্ক না-করা ছাত্রের দিকে প্রধান শিক্ষিকা তাকিয়ে আছেন। বলল, 'জোনিকুট্টি, এসব বদ রসিকতা না ক'রে বুঝি থাকতে পার না?' তার বলার ধরনে ফিরে এলো সেই গুজরাতি মহিলা, 'সব সময় খারাপ কথা বলার ধান্দা খোঁজো!' ব'লে সে আবার বোনায় মন দিল। লাল সুতোয় জ্যাক অ্যাণ্ড জিলের মুখ ফুটিয়ে তুলছিল। ইচ্ছে হ'ল, প্রথম উপমাটাই শুনিয়ে দিই, কিন্তু—

কেন যে এমন হয়। বিষয়টা নিয়ে অনেক ভেবেছি। মেয়েরা গান ভালোবাসে। কবিতা এবং জীবন্ত উপমা বোঝবার বুদ্ধিও আছে তাদের। স্ত্রীজাতির প্রশংসায় এমন কত কথাই তো বলেছেন। কিন্তু, আমার অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে।

মোলিকুট্টি শিক্ষিতা। পুরনো দিনের ইণ্টারমিডিয়েট পাস করা। শুনেছি প্রথম শ্রেণীতেই পাস করেছিল। তারপর দিল্লীর কোন স্কুলে কাটিয়েছিল এক বছর। আমার মনে হয় ওই একটি বছরে তার কর্মক্ষমতা এবং মানসিক কাব্যময়তা একেবারে শূন্যে গিয়ে ঠেকেছে।

বাড়িতে যারাই আসত তারাই ওর সেলাইয়ের কাজ এবং পুষ্পসজ্জার প্রশংসা করত। আসলে এরা কারুর মধ্যে অল্পস্বল্প শিল্প ও সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটতে দেখলেই পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে প্রশংসায়; এই ব্যাপারটা কিছুতেই বোধগম্য হয় না আমার। দিল্লীর ফিনিশিং স্কুলে পড়াশুনোর ফলে ও আর-কিছু না হোক যে-কোন কথাই ত্রুটিহীনভাবে নকল করতে পারত। মোলিকুট্টির কাজই অন্যকে নকল করা— আমি এইটাই বলতে চাচ্ছি। যাই হোক, বড়লোকের ধরনে বেঁচে থাকা এক সাধারণ ঘরের স্বামীর পক্ষে এ-সব ভাবনাই সার, ভাবনাগুলিকে প্রকাশ করার সুযোগ জীবনে কোথায়!

অফিসে রীতিমতো খাটতে হয়। শনিবার দুপুরের পর আর রবিবারের দিনটায় একটু হাত-পা ছড়াবার অবকাশ পাই। তখন খাটের ওপর টান-টান হয়ে শুয়ে, নিজের পছন্দমতো বইয়ের পাতা ওল্টানো আর মাঝে-মাঝে বিড়ালের মতো ঘুমনো— আমার বিশ্রাম বলতে এইটুকু। বিশ্রাম সম্পর্কে আমার প্রিয়তমা স্ত্রীর ধারণা কিন্তু অন্যরকম। আমাকে সঙ্গে নিয়ে 'এ' টাইপের কোন বাড়িতে ঢুকে লোকের সঙ্গে অর্থহীন আলাপ চালানো, আর তাদের দেওয়া মিঠাইয়ে কামড় বসানো— শনিবারের দুপুরের পর থেকে এই হ'ল মোলিকুট্টির রুটিন। ওর সঙ্গে যাবার জন্যে ফি

শনিবার আমাকেও তৈরি থাকতে হবে। স্বামী-স্ত্রী একজোটে গিয়ে অন্যলোকের ঝামেলা বাড়ানো— এটাই হ'ল দিল্লীর ফিনিশিং স্কুলের শিক্ষা। কী আর করি! মনে মনে শাপ দিই, কখনো বা রাগারাগি করি একটু, তবু সঙ্গ ছাড়তে পারি না। না গিয়ে কাজও হয় না।

এখানে কলোনিতে থাকি। এই ধরনের কলোনিতে যেমন হয়, আশেপাশেও আছে কয়েকটি পরিবার। এটি কেন্দ্রীয় সরকারের কলোনি। এই পরিকল্পনায় সরকার পনেরো থেকে আঠারো কোটি টাকা খরচ করেছেন। অফিসার, টেক্‌নিসিয়ান, চাকর— সব মিলিয়ে এখানে হাজার চারেকের ওপর লোকের বাস। অফিসারদের জন্যে তৈরি বাড়ির একটিতে আমি থাকি।

তিন ধরনের বাড়ি আছে এখানে। মনোহর টিলা এলাকায় সবচেয়ে ওপরে 'এ' টাইপের বাড়িগুলো। দুটি শোবার ঘর, একসঙ্গে খাবার আর বসবার ঘর, দুটি বাথরুম, বারান্দা, মোজেইক করা মেঝে, ছোট ঝুলন্ত ছাদ আর সামনে একফালি বাগান। 'বি' টাইপে দুটি শোবার ঘর, একটি খাবার ঘর, বারান্দা, বাথরুম আর সিমেন্টের তৈরি মেঝে। এখানে ছাদ বা বাগান নেই। 'সি' টাইপের বাড়িগুলোয় একটি শোবার ঘর, একটি খাবার ঘর, আর বাথরুম, এখানেও ছাদ বা বারান্দা নেই। কর্কশ সিমেন্টের তৈরি মেঝে। সকলকেই ভাড়া দিতে হয় মাইনের এক-দশমাংশ। যাদের মাইনে 750 টাকা থেকে 1000 টাকার মধ্যে তারা থাকে 'এ' টাইপে। 500 থেকে 750 টাকা মাইনের লোকেরা থাকে 'বি'-এ। বাকীদের জন্যে 'সি' টাইপ। 775 টাকা মাইনের চাকুরে আমি, থাকি 'এ' টাইপে। দেড় বছর হ'ল 'বি' থেকে

উঠে এসেছি 'এ'-তে। পদোন্নতির পর নতুন বাড়িতে এসে মোলিকুট্টির আনন্দ হয়েছিল দেখবার মতো। নতুন বাড়ির আদ্যোপান্ত বর্ণনা ও নতুন ঠিকানা জানিয়ে চিঠি লিখল সমস্ত বন্ধুকে।

আমার কিন্তু পুরনো 'বি' ধরনের বাড়িই পছন্দ ছিল বেশি। বাড়ির সামনে ছিল একটা বড়ো কাঁঠাল গাছ। হাওয়ায় তার মন-ভোলানো পাতার নাচন দেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কেটে যেত। মন চলে যেত বহুদূরে, অজানায়। এই বাড়িটার সামনে তেমনি কোন গাছ নেই। সেইজন্যেই আমার তেমন পছন্দ হয় না বাড়িটা। আমার মনোভাবটা জেনে মোলিকুট্টি পরিষ্কার ভাষায় শুনিয়ে দিল, 'এ' টাইপে প্রমোশন যে কত বড়ো প্রতিষ্ঠা তা বুঝাবার মতো বুদ্ধি আমার নেই।

কপাল খারাপ. সেটা আরো চরমে ওঠে রবিবারের সকালে। আমার প্রিয়তমা স্ত্রী তখন নিজের 'ফ্রিজ'টিকে 'ডিফ্রিজ' করে। সুইচ্ বন্ধ করে শুরু হয় ধোয়ামোছার পালা। কিছুক্ষণ পর্যন্ত ওটা খোলাই থাকে। রবিবার মানেই ফ্রিজের অসুখের দিন। তার দেখাশোনার কাজে সাহায্য করতে হবে আমাকেও। বরফ-রাখবার ট্রের পচা জল বের করে পরিষ্কার করতে হয়। খাবার জিনিসগুলো বের করে আবার সেগুলো ধুয়ে মুছে তুলে রাখাও আমার কাজ। ঠাণ্ডা আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না, ঠাণ্ডায় হাত জমে ট্রে-টা কখনো সখনো ছিটকে পড়ে এদিক ওদিকে।

'এভাবে অসতর্ক হয়ে কেউ ফ্রিজ আর ট্রে ধোয় না। কাঠ বা পাথর তো নয়। এ কি হাতির শুঁড় দিয়ে ধরা নাকি…

এইভাবে, ফ্রিজ পরিষ্কার করার সময়, আমার অসাবধানতা সম্পর্কে চলে তার দীর্ঘ বক্তৃতা!

সাদা সমাধিফলকের মতো এই বস্তুটির নাম 'ফ্রিজিডেয়র।' কেউ কেউ একে 'রেফ্রিজরেটর'ও বলেন। আমার মনে হয় 'ফ্রিজ' বলে ডাকাই ঠিক। তবে মোলিকুট্টি যেভাবে উচ্চারণ করে সেভাবে নয়। শব্দটা আজকাল অসহ্য লাগে কানে। প্রিয়তমা মোলিকুট্টি যখন ঠোঁট বাড়িয়ে, জিব ছুঁচলো করে 'রি'-কে 'রী' বানিয়ে উচ্চারণ করে, তখন ইচ্ছে হয় পালিয়ে যেতে। কিন্তু 775 টাকা মাইনের, 'এ' টাইপে থাকা অফিসারের পক্ষে তা করা কোনমতেই সম্ভব নয়।

এত ঝামেলার মূলে যে আমাদের কাছাকাছি 'বি' টাইপে থাকা প্রতিবেশিনী বেবিকুট্টি, এটা বলতে আমার খুব খারাপ লাগছে। বেবিকুট্টি বাপের একমাত্র মেয়ে। ওর বাবা জাঁদরেল ঠিকাদার। অনেকদিন থেকেই আধকোটি, পৌনে এক কোটি, এককোটি টাকার নীচে কোন কণ্ট্রাক্ট নেয় না। ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গেই ওর খুব খাতির। শত্রুরা বলে সরকারী সিমেন্টের বস্তা, লোহা আর অন্যসব জিনিস ওর হাতে পৌঁছনো মাত্র বদলে যায় তাড়াতাড়া একশো টাকার নোটে। আমার অবশ্য ব্যাপারটা পুরোপুরি বিশ্বাস হয় না। অন্যান্য ঠিকাদারের চেয়ে তাকে খারাপ মনে হয় না; তবে একটা ব্যাপার জানি, আমাদের যোজনার কেমিকেল ইঞ্জিনীয়ার জর্জ টমাসের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে 35,000 টাকা যৌতুক দিয়েছিল। সঙ্গে অনেক সোনার গহনাও।

মোলিকুট্টি আর বেবিকুট্টির ঝগড়ার ইতিহাস জানতে হলে এই কলোনির সমগ্র জীবনের ওপর দৃষ্টিপাত করতে হবে। সেখানকার

তাবৎ বড়লোক থাকে 'এ' টাইপের বাড়িতে। তারা নিজেদের মধ্যে মেলামেশা করে, করে গল্পগুজব। কিছু-কিছু দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারও থাকে। যার বাড়িতে মোটর নেই, তার বাচ্চাকে পৌঁছে দিয়ে আসে ইংরেজী-মাধ্যম স্কুলে, ফিরিয়েও নিয়ে আসে। বাড়ির বউ-ঝি'রা মনে মনে ঈর্ষায় পুড়লেও বাইরে তা প্রকাশ করে না কখনো। ওপর ওপর সকলের সঙ্গেই ভাব আছে সকলের। 'এ' টাইপের বউরা 'বি' ও 'সি, টাইপের বউদের ছু'চক্ষে দেখতে পারে না। চীনাদের দিকে ভারতীয়রা যেভাবে তাকায় ঠিক সেই দৃষ্টিতে ওরা তাকায় 'বি' ও 'সি'-এর দিকে কিংবা খোদ মিশনারীরা যেভাবে দিশীদের দিকে গরু ছাগল জ্ঞানে তাকায়।

অবশ্য একটা কথা বলা যায় 'এ' ক্লাসের পুরুষরা অনেক কম দাম্ভিক। 'বি' ক্লাসের সঙ্গে তাদের কথাবার্তা—এমনকি সিগারেট আদান-প্রদানও চলে, তবে 'বি' ক্লাসের নীচে নামে না। পরিকল্পনার ত্রুটি নিয়ে কথাবার্তা হয়, সুযোগ পেলে একটু গালমন্দও যে হয় না তা নয়। 'বি' ও 'সি'-এর মধ্যে সম্বন্ধটাও অনেকটা এই ধাঁচের। ভারতে জাতিপ্রথার জন্ম বিষয়ে গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ লিখে ডক্টরেট পাবার জন্য আমার এক বন্ধু কিছুদিন কাছাকাছি এসেছিল। তার ইচ্ছে ছিল আমেরিকার কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উপাধিটা পায়। তাকে বললাম কিছুদিন যদি আমাদের কলোনির জীবনযাত্রা লক্ষ্য করে তাহলেই প্রবন্ধের জন্য পর্যাপ্ত মালমশলা পেয়ে যাবে।

বেবিকুট্টি 'বি' ক্লাসের কোয়ার্টারে এসে সংসার পাতলে ওর সঙ্গে দেখা করতে যেতে হ'ল আমাকে। ওর মা এবং আমার বাবা ছিলেন সম্পর্কিত ভাই-বোন। ছোটবেলায় আমি বেবিকে

খুব ভালোবাসতাম। ওর বাপের টাকার জোর ওদের আমাদের গীর্জা আর সমাজে বেশ প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছিল। মাত্র আড়াই একর জমির আয়ে সংসার চালাতেন আমার বাবা; ওদের সৌভাগ্যের তুলনায় সেটা ছিল নিতান্তই নগণ্য।

জর্জ টমাস আর বেবিকুট্টির সঙ্গে দেখা করার জন্য মোলিকুট্টি আর আমার সঙ্গে গেল না।

'তোমার বন্ধু তো, তুমিই যাও। আমি আর-একদিন সঙ্গে যাব। এখন আমার অনেক কাজ। নাইলনের শাড়ি আর নীল বাঙালোরী ব্লাউজটা ইস্ত্রি করতে হবে। ওই বুককেসটা পালিশ করতে করতেই দেরি হয়ে গেল। সুরেশ আর সুরেশের বউকে কাল চা খেতে ডেকেছি। তা ছাড়াও, ওই কাগজগুলো গুছিয়ে রাখতে হবে—'

'এসব তো ওখান থেকে ফিরে এসেই করতে পারো মোলিকুট্টি? এ-সবের জন্যে তো আর সময় পালিয়ে যাচ্ছে না?' আমি একটু রেগেই বললাম।

'পালিয়ে নিশ্চয়ই যাচ্ছে না, তবে যখনকার যে-কাজ সেটা তখনই করা ভালো। কাজকর্মে তো কখনো একটু সাহায্য করো না! কেউ আসার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা করতে যেতে হবে, এটাও যে কেমন ব্যাপার বুঝি না!'

আসলে মোলিকুট্টি আমাকে এটাই বুঝিয়ে দিতে চাইল যে 'বি' টাইপের বাসিন্দাদেরই প্রথমে 'এ' টাইপে আসা উচিত। এই কলোনিতে সেটাই অলিখিত নিয়ম। মোলিকুট্টির উদ্দেশ্য সেটা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। সে-কথায় ভ্রূক্ষেপ না ক'রে আমি একাই বেবিদের বাড়ি চলে গেলাম।

স্বীয় বুদ্ধি বা বাপের টাকাপয়সা নিয়ে বেবিকুট্টির কোন অহংকার ছিল না। চেহারায় সে লম্বা বা মোটা নয়; কিন্তু ছোট্ট পাখিটির মতো স্বাস্থ্যে সুডৌল আর মেজাজে ফুরফুরে।

আমাকে দেখেই বলল, 'একলা এলে, দাদা? বৌদি কোথায়?'

আমি মিথ্যে করে বললাম যে মোলিকুট্টির শরীর ভালো নেই। যে-কারুর পক্ষেই এটা সবচেয়ে সুবিধাজনক অজুহাত। যদিও ধোপে টিকল না।

'একটু আগেই তো দেখলাম বৌদি পাশের বাড়ি থেকে ফিরছেন।'

'অ্যাসপ্রো বা অমৃতাঞ্জন নিতে গিয়েছিল বোধহয়।' আমি আর-একটা মিথ্যা বললাম।

তখন সেই নববধূ বিবাহে প্রাপ্ত তার সমস্ত জিনিসপত্র একে-একে দেখাতে লাগল আমাকে। রিস্টওয়াচ, ঘড়ি, ডিনার সেট, ভ্যানিটি ব্যাগ, নানারকমের ইলেকট্রিকের সরঞ্জাম, হাতির দাঁতে তৈরি জিনিস, শাড়ি, জুতো এবং আর যা-যা ছিল সবই দেখাল। এক •রেডিওগ্রামটির দামই হবে কম করেও হাজার টাকা। জিনিসটা দেখে চমকে উঠলাম আমি। কেননা, কাল না হোক পরশু বা আর কয়েকদিন পরেই মোলিকুট্টিও অবশ্যই দেখতে পাবে জিনিসটি। সঙ্গে বারোটি রেকর্ডও আছে। মোলিকুট্টি নিশ্চয়ই টের পাবে। কিছুদিন থেকেই এই ধরনের একটা জিনিসের জন্যে সেও বায়না ধরেছে। আমি কোনরকমে এড়িয়ে যাচ্ছি। এটা দেখলেই সে কেনার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এখনই সংসার চালানো দায় হয়ে উঠেছে, তার ওপর এই নতুন ঝামেলা এলেই হয়েছে। কিন্তু আমি জানি, শেষ পর্যন্ত সবই মেনে নিতে হবে

আমাকে। হায় ভগবান! এসব ঘটনা ঘটতে আর বেশি দেরি নেই।

বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই জেরবারে অতিষ্ঠ করে তুলল মোলিকুট্টি।

'ওরা কবে এসেছে?'

'পরশু।'

'যৌতুক কত পেয়েছে?'

'পঁয়ত্রিশ হাজার।'

কয়েক বছর আগে দশ হাজার টাকার যৌতুক নিয়ে এসেছিল মোলিকুট্টি; পঁয়ত্রিশ হাজারের কথায় একটু খটকায় পড়ল। ঈষৎ সংকোচের গলায় প্রশ্ন করল, 'গয়না অনেক পেয়েছে বুঝি?'

'সব তো আমি দেখিনি; তবে নিশ্চয়ই সাত-আট হাজার টাকার বেশিই হবে।'

মোলিকুট্টিকে হতাশ দেখাল।

'উপহার পেয়েছে কেমন?'

'প্রচুর।'

'নিশ্চয়ই খুব ফ্যাশনেব্‌ল জিনিসপত্র পেয়েছে?'

'ডিনার সেট, ককটেল সেট, ভ্যানিটি কেস, সাত-আটটা সুটকেস, ঘড়ি আর রিস্টওয়াচ, বিউটি সেট, অনেকগুলো শাড়ি···', মুখস্থ-করা গলায় বলে গেলাম আমি। আমার বর্ণনায় ক্লিষ্ট হয়ে উঠছিল মোলিকুট্টি। এমনও হতে পারে, মনে মনে আমি ওকে আরো বেশি কষ্ট দিতে চাইছিলাম।

'আংটি, বালা, চুড়ি, হীরে, মুক্তা— এসব?'

এ সবকিছুর ফিরিস্তি শুনতে শুনতে মোলিকুট্টির কান বোঝাই

হয়ে গেল। 'স্টোভে দুধ উথলে উঠছে—' বলতে বলতে চলে গেল সে। একটা কথা অবশ্য আমি ওকে বলিনি। রেডিওগ্রামটার কথা।

একদিন বেবিকুট্টি আর ওর স্বামী বেড়াতে এলো আমাদের বাড়ি। বেবিকুট্টির পরনে তিন-চারশো টাকা দামের এক শাড়ি। বেবিকুট্টি আমাদের কলোনির জীবনযাত্রা ও নানা অলিখিত নিয়ম সম্পর্কে একেবারে কিছুই জানে না। বা, জানলেও, সেসব নিয়ে আদৌ চিন্তিত নয়!

আমাদের বাড়ির সমস্ত ঘর আর জিনিসপত্র ঘুরে-ঘুরে দেখল সে। ভুরু তুলে নিজের মতামত ব্যক্ত করল, ' 'এ' টাইপের বাড়িতে শুধু এইটুকুই সুবিধে! এখানে থাকা যাবে কী করে! এখানে কম করেও তিনটি বেডরুম, একটা ড্রইংরুম আর তিনটি বাথরুম থাকা দরকার।'

ওর বাপের বাড়িতে ঘরের সংখ্যা একুশ। সাতটি বেডরুম, দুটো ডাইনিং হল, সাতটি বাথরুম আর ইলেকট্রিকের রসুইঘর···

মৌলিকুট্টির দৃষ্টি দেখেই বুঝলুম মেয়েটিকে সে ইতিমধ্যেই ঘৃণা করতে শুরু করেছে। ঘৃণাপূর্ণ ওর দৃষ্টিটা সাপের চোখের মতো চকচকে।

জর্জ সম্পর্কে অবশ্য ওর কোন মন্তব্য ছিল না। জর্জ একেবারেই চুপচাপ। সম্ভবত খোঁচা না দিলে বোঝা যাবে না ওর মুখে জিব আছে। মোলিকুট্টির সব আপ্যায়নই চালিত হ'ল জর্জের দিকে। জর্জ কলোনির নিয়ম-মানা যুবক। কিন্তু ওর নববধূ সেসব মানতে অভ্যস্ত নয়। মোলিকুট্টি তো বলেই ফেলল, 'ভীষণ অহংকার!'

দু'তিনবার দেখাশোনা হবার পর দু'জনের মধ্যে এমনই বন্ধুতা গড়ে উঠল যে বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে গেল। আমি কী করব! ওর স্বামী লোক ভালো আর বেবিকুট্টির ব্যবহারও আমার কিছু অপছন্দ নয়। কিন্তু মোলিকুট্টি —

দু' তিন হপ্তা কেটে যাবার পর আমি মোলিকুট্টিকে বললাম, 'একদিন বেবিদের বাড়ি যাবে?'

'তোমার যেতে ইচ্ছে হলে যাও, আমি যাব না।'

'কেন, তোমার কি শরীর খারাপ?'

'না, হয় নি কিছুই। আজ 'এ' টাইপের মহিলা ক্লাবের সম্মেলন আছে।'

'ওখানে বেবিকুট্টিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পার না?'

'তাতে কি অন্য মহিলারা সায় দেবেন? অধ্যক্ষা চারী আর উপাধ্যক্ষা শ্রীমতী মেনন তো কিছুতেই ব্যাপারটা মেনে নেবেন না!'

'ওঁদের আপত্তির কী থাকতে পারে? বেশি শিক্ষিতা মেয়ে, অসুবিধেটা কোথায়?'

'শিক্ষিতা হলেই বুঝি সব ঝামেলা মিটে যায়?'

'তা হলে?'

'এখানে কিছু-কিছু ভেদ-বিভেদ মানা হয়। যেমন এ, বি, সি। সেটা আমি কী ক'রে বদলাব?'

আমার অনেক কথাই বলার ছিল, তবু বললাম না কিছুই। কোন প্রতিবাদও করলাম না।

শুধু বুঝতে চাইলাম ওর কথাগুলির অর্থ। মাইনে অনুযায়ী লোকজন এখানে তিনভাগে ভাগ করা। পরস্পরের মধ্যে এদের দুস্তর ব্যবধান।

পরশুদিন অফিস যাবার সময় জানলার কাছে দাঁড়িয়ে জল খেতে খেতে দূরের গাছে পাখির সমাবেশ দেখছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল শাড়ির আঁচল দুলিয়ে একটি মহিলা মোলিকুট্টির কাছে আসছে। কাছে আসতে খেয়াল করলাম ওদিককার বাড়ির ফেক্‌লু মা। শ্রীমতী ভার্গিসকে কলোনির সকলেই 'ফেক্‌লু মা' বলে ডাকে। হে ঈশ্বর! নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে!

'কী মোলিকুট্টি, ওদিকে দেখছ কী হচ্ছে?' শ্রীমতী ভার্গিসের গলা।

'কী?'

'গ্যাখো না জর্জ টমাসের বাড়ির দিকে তাকিয়ে!'

শুনে আমিও তাকালাম সেদিকে।

একটা গাড়ি। তার ওপর কাঠ দিয়ে বাঁধা চার-পাঁচ ফুট উঁচু বুদ্ধ-বিগ্রহের মতো একটা বস্তু। চারটি কুলি সেটিকে সাবধানে ঘরে নামিয়ে আনার চেষ্টা করছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বেবিকুট্টি, সৈন্যদের নির্দেশদানকারী ক্ষুদে নেপোলিয়ানের ভঙ্গিতে নির্দেশ দিচ্ছে কুলিদের।

'ব্যাপারটা কী, ভার্গিস মাসীমা?'

'ফ্রিজিডেয়ার। প্রেস্ট কোল্‌ড্‌ ফ্রিজিডেয়ার, 1963-র মডেল।'

'এলো কোথা থেকে?'

'ওই মেয়েটার বাপ পাঠিয়েছে। গোপী গিন্নী তো তাই বলল। নাকি 2300 টাকা দাম!'

তারপর ওদের মধ্যে আর কি কি কথাবার্তা হ'ল শুনি নি, আমাকে অফিস যেতে হ'ল।

সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে খুবই চিন্তিত দেখলাম মোলিকুট্টিকে। সমস্ত উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে। কারণটা ভাবতে লাগলাম আমি।

অনুরক্ত স্বামীর মতো আমি ওর চিন্তার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে পেলাম এক সিংহীকে।

'আমার দুঃখ আর কে বুঝছে! তোমার নাওয়া, খাওয়া, সিগারেট ফোঁকা ঠিকভাবে চললেই তো হ'ল!'

ঘৃণা-মেশানো কাটা-কাটা কথাগুলো।

'কী বলছ কী?'

'যা বললাম তাই। হৃদয় থাকলে অন্যের সুবিধে-অসুবিধে ঠিকই বুঝতে পারে লোকে। এখানে যা নেই তা ওখানে আছে। ভারি আমার সুখ-দুঃখের খবর নিতে এসেছেন!...'

পরিহাস থেকে অশ্রু, নিজের প্রতি অনুকম্পা থেকে ক্রমশ হিস্টিরিয়ার প্রথমাবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মোলিকুট্টি। আমি সোজা ঘরের বাইরে চলে এলাম।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। সেটাই আসল কথা। ইতিমধ্যে কিস্তিতে একটা রেডিওগ্রাম কিনেছিলাম আমি, তাতে একসঙ্গে চোদ্দটা রেকর্ড বাজানো যেত।

আমরা দু'জনে একসঙ্গে বেবিকুট্টিদের বাড়ি যাবার সপ্তাহখানেকের মধ্যেই বাড়িতে একটা রেডিওগ্রাম থাকার লাভ ও সুবিধে বিষয়ে জেনে গিয়েছিল মোলিকুট্টি।

'বাড়িতে লোকজন এলে তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে রেকর্ড বদলানো ঠিক নয়। আগে থেকেই দশ-পনেরোটা রেকর্ড চড়িয়ে রাখা ভালো। একটার পর একটা নিজেই বেজে যাবে। আমাদের ড্রইংরুমে এর চেয়ে ভালো জিনিস আর কী থাকতে পারে!'

রেডিওগ্রামের ওপরে আমার সাত ভাল্বের রেডিওটাকে স্থান

দেবার বৃথা চেষ্টা করলাম আমি। শেষপর্যন্ত বড়ো পেটির মতো বস্তুটি এসে আমার ঘরে জায়গা জুড়ে বসল।

রেডিওগ্রাম কেনার দিন ও তারপরেও দু'তিনদিন গানের দৌলতে বাড়িতে খুব হৈ-চৈ চলল। শ্রীমতী চারির পছন্দ হিন্দী গান, তার মধ্যেও বেশি পছন্দ সায়গল আর লতা মঙ্গেশকারের গান। সায়গলের গলার সুরেলা জাদু তার হারিয়ে-যাওয়া ছেলেবেলার কথা মনে পড়িয়ে দেয়; আর লতা মঙ্গেশকারের গলা শুনে মনে হয় যেন ষোলো বছর বয়সটাকে ফিরে পেয়েছে। শ্রীমতী গোপীর পছন্দ 'রক্-এন্-রোল' ধরনের তামিল গান। সে-গান শুনে শুরু হয়ে যায় তার জঙ্ঘার দুলুনি। ফেকলু মা'র পছন্দও খানিকটা এই ধরনের। শ্রীমতী বরদাচারির পছন্দ চেম্বৈ বৈদ্যনাথ আয়ার, এম. এস. শুভলক্ষ্মী আর বাল মুরলীকৃষ্ণের গান। দু'তিনদিন ধরে এইভাবে আমার বাড়িতে চলল পি. লাল, বাল মুরলী, শুভলক্ষ্মী আর লতা মঙ্গেশকারের গানের পালা। তারপরেই স্তব্ধ হয়ে গেল একেবারে। তবে একটা ব্যাপার আমি লক্ষ্য করলাম। আশে-পাশের সব বাড়িতেই রেডিওগ্রাম এসে গেছে।

কিস্তিতে রেডিওগ্রাম, ওয়াটার হিটার ইত্যাদি পাওয়া কিছুই অসুবিধাজনক নয়। কিন্তু কিস্তির টাকা ঠিক সময়ে শোধ দিতে প্রায়ই কষ্ট হ'ত আমার। তখন ভাবলাম, মোলিকুট্টিকে বলি কয়েকটা কথা। আগেই হয়তো বলা উচিত ছিল।

'কারুর বাড়িতে কিছু দেখলেই সেটা কেনা বা কেনার কথা ভাবা বাস্তবে খুব অসুবিধাজনক নয় কি, মোলিকুট্টি?'

'তুমি কিসের কথা বলছ?'

'এই যে রেডিওগ্রাম বা ওয়াটার হিটার, এগুলো কি আমাদের

জন্যে খুবই দরকারী ছিল ? কয়েক বছর এগুলো ছাড়াই অনায়াসে চালাতে পারতাম আমরা। একটা কথা জিজ্ঞেস করব, শেষ কবে বাজিয়েছিলে এই রেডিওগ্রামটা ?'

'রোজই কি বাজাতে হবে নাকি ? বাড়িতে ভাত বেশি বলেই সারাক্ষণ ভাত খেয়ে যেতে হবে ? তুমি যা ভাবছ এগুলো সে-রকম সব সময়ে ব্যবহারের জিনিস নয়।'

'তবে ?'

'আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্যে এগুলো দরকার…'

'তার মানে ?'

'এই পরিস্থিতিতে এগুলোই থাকা জরুরী। না হলে লোকে হাসবে।'

'তোমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না, মোলিকুট্টি ?'

''এ' টাইপের বাসিন্দারা কি 'বি' বা 'সি' টাইপের বাসিন্দাদের ধরনে থাকতে পারে ?'

'কেন, ওরা কি মানুষ নয় ?'

'হতে পারে, কিন্তু 'এ' টাইপের মতো নয়।'

' 'বি' টাইপের কেউ কি 'এ' টাইপের চেয়ে ধনী হতে পারে না ?' রেগে গিয়ে বললাম আমি।

'বেশ তো ! 'বি' টাইপের লোকের মতো জীবন কাটানোর চেয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া ভালো।'

আমি হার মানলাম। প্রতিষ্ঠার অর্থ যে বুঝতে পারে না তার পক্ষে হার স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। আর দ্বিতীয় কোন রাস্তা তো নেই !

বেবিকুট্টির বাড়িতে রেফ্রিজরেটর আসার দশ দিন পরে

মোলিকুট্টি আমাকে সংসারের জিনিসপত্র বাঁচিয়ে রাখা সম্পর্কে প্রথম পাঠ দিল।

'জিনিসপত্র অপচয় করা খুব খারাপ, তাই না গো?'

'নিশ্চয়ই। আমি তো রোজই কারখানার শ্রমিকদের এই কথা বলি— অপচয়ের চেয়ে বড় অপরাধ আজকের পৃথিবীতে আর কিছুই নেই।'

'খাবার জিনিস অপচয় করা তার চেয়ে বড় অপরাধ, তাই না?'

'নিশ্চয়ই। ভারতবর্ষে খাদ্যের শতকরা কুড়ি ভাগই অপচয় হয়। কিছু গলেপচে, কিছু ইঁদুরের পেটে গিয়ে।'

'তাহলে খাবার জিনিসপত্র ঠিক-ঠিক বাঁচিয়ে রাখা দরকার?'

'নিশ্চয়ই। রাষ্ট্রের প্রয়োজনেও সেটা দরকার।'

'কিন্তু, দ্যাখো, আমরা প্রতিদিনই কত খাবার নষ্ট করছি!'

'কীভাবে?' কৌতূহলে প্রশ্ন করলাম আমি।

'এই ধরো তরকারি। যেটুকু লাগল লাগল, বাকী সবটাই তো ফেলে দিতে হয়।'

'যতটা দরকার ঠিক ততটুকু বানালেই হয়!'

'এইভাবে ভাত তরকারি রাঁধা যায় নাকি? তাছাড়া শাকসব্জী ফল— এগুলো রাখতে রাখতে নষ্টও হয়ে যায় অনেক সময়।'

'কী করতে হবে?'

'বললে এখুনি ছুটবে।'

ভবী ভুলবার নয়। দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নেই আমার কপালে। বললাম, 'আসল কথাটা বলো এবার।'

'একটা ফ্রিজ থাকলে এই অপচয় বন্ধ করা যেত। এক সপ্তাহের সমস্ত জিনিসপত্র টাটকা থাকত। আরো একটা সুবিধেও আছে।'

'সেটা কী?'

'বরফ, আইসক্রীম, ফ্রুট-সালাড সবই ঘরে তৈরি করা যেত। হঠাৎ কেউ এসে পড়লে এদিক-ওদিক ছুটতে হ'ত না। তারপর ধরো, অরেঞ্জ স্কোয়াশ আর তোমার বীয়ারও ঠাণ্ডা করে রাখা যাবে···'

বীয়ারের কথাটা আমাকে বশ করার জন্যে, মোলিকুট্টি যেন এক টুকরো মাংস ছুঁড়ে দিল আমার দিকে।

'তা এতে খরচা হবে কত?'

'প্রেস্টকোল্ড-এর দাম 2300 টাকা, কেলভিনেটরের দাম 2600 টাকা। আমাদের জন্যে কেলভিনেটরই ভালো।'

'সেটা কি বেবিকুট্টির 'প্রেস্টকোল্ড' আছে বলে?' হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলাম আমি। যা ভেবেছিলাম, কথা শুনে মোলিকুট্টি তেমন চেঁচামেচি করল না। বরং আমার কথাটাই মেনে নিল।

'টাকা আসবে কোথা থেকে?'

'কুড়িটা কিস্তিতে দিয়ে দেওয়া যাবে।'

'তারপর রেডিওগ্রাম আর ওয়াটার হিটারের কিস্তি কে শোধ করবে?'

'সে-সব ঠিক হবে যাবে দেখো। আমরা 'এ' টাইপে থাকি। আমাদের ভালোভাবে বাঁচার চেষ্টা করা উচিত।' মৃদু গলায় বলল মোলিকুট্টি।

আমার হার মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি। শেষ পর্যন্ত হেরেই গেলাম।

এইভাবে, শিবলিঙ্গের স্মারক ফ্রিজটাকে আমি স্থান দিলাম আমার বাড়িতে।

ভাবলাম, এখন কিছুদিন হয়তো নিরুপদ্রবে থাকা যাবে। কিন্তু ভগবানের সে-রকম ইচ্ছে ছিল না। এই ঘটনার মাস দুয়েক পরেই আবার একদিন 'ফেক্‌লু মা' আমাদের বাড়ি এলো।

'মোলিকুট্টি, ওদিকটায় তাকিয়ে দেখছ?'

আমিও তাকিয়ে দেখলাম, একটা নতুন ফীয়ট গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে বেবিকুট্টিদের বাড়ির সামনে।

'ওটা কার?'

'জর্জ টমাসের বউয়ের। ওর বাপ—ওই চোর ঠিকাদার পাঠিয়েছে। আমি তো সেইরকমই শুনলাম।'

আমার মাথা ঘুরতে লাগল। ভাগ্য ভালো, কাছেই জানালাটা।

অজানা কথা

পোত্তিক্করা রাফী

সাতদিন রোগে ভুগে পদ্মনাভ কুরুপের বাড়ির কালো গরুটা মরে গেল। জোঁক হয়েছিল।

মরা গরুর সৎকারের জন্যে পদ্মনাভ কুরুপ তার আশ্রম বাড়ী থেকে চিক্কু আর তোম্মনকে ডেকে পাঠালেন। চিক্কু আর তোম্মনের কোন বাঁধাধরা স্থায়ী কাজ ছিল না। তারা বেড়া বেঁধে, নৌকা চালিয়ে, কাঠ কেটে ও আরো নানারকমের টুকরো-টাকরা কাজ করে দিন গুজরান করত কোনরকমে। কেরলের দেশ-গাঁয়ে এ-রকম কাজ করে দিন-কাটানো লোকের সংখ্যা প্রচুর। এটা এক ধরনের নির্দিষ্ট জীবন-যাপন।

ধূসর চোখ ছিল চিক্কুর আর তোম্মনের মুখ প্রায় সব সময়েই হাঁ হয়ে থাকত। তাকে দেখলেই মনে হত মূর্খ। দুজনে এসে নিজেদের জমিদারের সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়াল। চিক্কু নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে আস্তে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'হুজুর, ডেকেছেন আমাদের?' তোম্মন তখনো হাঁ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে—যেন বোকামি আর আনুগত্যের প্রতিমূর্তি।

পদ্মনাভ বললেন, 'জোঁক হয়ে সাত দিন ভুগে আমার কালো গাইটা মরে গেছে। তোমরা কি গরুর দেখাশোনা কর না!'

চিক্কু জিজ্ঞেস করল, 'গত বছর যে-গাইটা প্রথম বিয়ালো সেটাই তো?'

চোখ কচলাতে কচলাতে পদ্মনাভ কুরুপ বললেন, 'হ্যাঁ, সেইটেই। আবার বাচ্ছা দিত। কী করব, ভগবানের ইচ্ছে সবই। গত বছর চার সের করে দুধ দিয়েছিল। এবার আরো বেশী দেবে আশা করেছিলাম।'

নিজের ভাগ্যকে দুষতে দুষতে পদ্মনাভ কুরুপ ওদের গর্ত খুঁড়ে গরুটাকে কবর দেওয়ার আদেশ দিয়ে, বিশেষভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'জমিটা কোথায় খুঁড়বে ভাবছ?'

উত্তরে তোম্মন বলল, 'গর্ত খোঁড়ার বিষয়ে কী বলছিলেন যেন?'

তার কথা শুনে পদ্মনাভ কুরুপ খুবই অবাক বোধ করলেন।

চোখের ইশারায় চিক্কু তোম্মনকে চুপ করে থাকতে বলল। চিক্কুর ইশারার অর্থ ঠিক-ঠিক বুঝতে পারল না তোম্মন, তবু সে চুপ করে গেল। চিক্কু ওকে তাড়াতাড়ি করার আদেশ দিল।

'অন্য জায়গায় গর্ত খুঁড়ে দরকার কী? ওখানেই খুঁড়ে নাও।' চিক্কু আবার তোম্মনকে ইশারা করল চোখ যেন সে কিছু না বলে; সেই বুঝে তোম্মনও তার মালিকের কথার উত্তর দিল না কোন। এমনভাবে সে দাঁড়িয়ে থাকল যেন ব্যবসায় লোকসান হয়েছে। কিছু একটা বলতে চাইছিল সে, তবু বলল না। চিক্কুর ভয় ছিল তোম্মন কোন বোকামি না করে বসে। সেইজন্যে তাড়াতাড়ি তোম্মনের কাছে সরে গিয়ে ওর কানে-কানে কিছু বলল। চিক্কুর কথা শুনে ঝানু চোরের মতো ভাব দেখাল তোম্মন।

ওদের কথাবার্তায় মন ছিল না পদ্মনাভ কুরুপের, তাই কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি তখন তেঁতুল গাছের নীচের জমিটুকুর দিকে তাকিয়ে আছেন, যেখানে এর আগে বাতে মরা একটা গরুকে

মাটি খুঁড়ে কবর দেওয়া হয়েছিল। ওই গাছটিরই পূব আর পশ্চিম দিকে চিক্কু আর তোম্মন থাকে।

দুজনকে শুনিয়ে বললেন তিনি, 'তেঁতুল গাছটার নীচেই গাইটাকে কবর দেওয়া ঠিক হবে।'

পদ্মনাভের কথা শুনে চিক্কু আর তোম্মন যে যার নিজের ডেরায় চলে গেল। খানিক পরেই মোটা বাঁশ আর দড়ি নিয়ে চলে এলো গরুর কাছে। গরুটার গা থেকে চ্যাটাইটা সরিয়ে ফেলল। কয়লার টুকরোর মত স্তব্ধ পড়ে আছে গরুটা।

কিছুক্ষণ দু'জনেই তাকিয়ে থাকল গরুটার দিকে। তারপর পুলিসের মতো নির্বিচারে লাঠি পিটিয়ে গরুর গায়ে বসে-থাকা মাছিগুলোকে তাড়িয়ে দিল চিক্কু। মাছিগুলো চিক্কু আর তোম্মনের ওপর বিরক্ত হয়ে উড়ে গেল। তারপর, দড়ি দিয়ে পাগুলো বাঁধবার জন্যে যেই গরুটাকে সরাল, ওম্নি পচা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।... পদ্মনাভ কুরুপ ও তাঁর স্ত্রী নাক চাপা দিলেন কাপড়ে।... শুধু বাড়ীর বুড়ী ঠাকুমা কাঁদতে লাগল ঘুনঘুন করে।

গরুর পাগুলি দেহের ওপর দিকে তুলে বাঁশে লট্কে দেওয়া হল। বাঁশের একটা দিক নিজের কাঁধে তুলে নিল চিক্কু, অন্য দিকটা তোম্মনের কাঁধে। গরু নিয়ে হাঁটতে শুরু করলে ভারের চাপে ফুলে উঠল তাদের মাংসপেশী; তবু তাদের খুশী খুশী দেখাচ্ছিল, কারণ, তাদের মনের ইচ্ছে পূর্ণ হতে চলেছে।

বাড়ির সমস্ত মেয়েরা এই দৃশ্য দেখে কান্না জুড়ে দিল এবং গরুর আত্মার শান্তির জন্যে প্রার্থনা জানাতে লাগল ভগবানের কাছে। পরের জীবনে গরু কোন্ গর্ভে জন্মগ্রহণ করবে এবং তারা নিজেরা কে কোন্ গর্ভে, এই নিয়েই চিন্তা করতে লাগল সকলে।

'হাম্বা···হাম্বা!' চীৎকার করতে লাগল গোয়ালের আর-একটি গরু। অন্য গরুগুলিও মৌন থেকে প্রকাশ করল তাদের মনোবেদনা।

'হাম্বা···হাম্বা', চীৎকাররত গরুটির চোখ থেকে ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছে অশ্রু। গরুটি যখন বাঁধন খোলবার জন্যে দড়ি ছিঁড়বার চেষ্টা করছে, তখন একজন এসে গরুটির কী দশা তোম্মন আর চিক্কু করেছিল তা বর্ণনা করল। শুনে সকলেই হতবাক্। পদ্মনাভ কুরুপ দিশেহারা বোধ করলেন।

তিনি চীৎকার করে বললেন, 'পাপী, শয়তানের বাচ্চা! এত বিশ্বাস করা সত্ত্বেও এই কাজ! এরা সর্বনাশ করে ছাড়বে দেখছি!'

বলে, কারুর বারণ না শুনেই মত্ত হাতির মতো ছুটতে লাগলেন তিনি। মাঝে মাঝেই শোনা যাচ্ছিল তাঁর গলা, 'পাপী! শয়তানের বাচ্চা!'

রাগে কাঁপতে কাঁপতে তিনি পৌঁছুলেন চিক্কুর ঘরের সামনে। সেখানে একত্র গোল হয়ে জটলা করছিল চিক্কু, তোম্মন আর চাত্তন, অয়প্পন, পট্টনীরা।

ওদের সামনে পৌঁছে ফেটে পড়লেন পদ্মনাভ কুরুপ, 'পাপীর বাচ্চা ··!'··· গলা শুনে গুড়ের ওপর বসা মাছির মতো ত্রস্ত হয়ে উঠল সকলে।

তোম্মন তখন লম্বা ধারালো ছুরি দিয়ে গরুর মাংস কাটতে ব্যস্ত। চিক্কু আর অয়প্পন সাহায্য করছিল তাকে।

জমিদারকে দেখেই উঠে দাঁড়াল ওরা। কান ধরে একে একে তিনজনেরই গালে কষে চড় লাগালেন কুরুপ। তারপরেই হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল অপবিত্র হয়ে যাচ্ছেন। হাত নামিয়ে সরে

দাঁড়ালেন তিনি। চিক্কু আর সঙ্গীরা তখন নাকে খত্ দিয়ে ক্ষমা চাইতে লাগল তাঁর কাছে।

'পাপীরা, এ কী করছ তোমরা?' মেঘের গর্জনের মতো গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন পদ্মনাভ কুরুপ।

তোম্মন কেঁপে উঠল। ওর হাত থেকে ছুরিটা ছিটকে পড়ল দূরে।··· কিছুক্ষণের জন্যে স্তব্ধ হয়ে উঠল সমগ্র পরিবেশ। ছুরির ফলা ঝল্সে উঠল রৌদ্রে। নারকেল পাতার ওপর আরো একটি ছুরি আর কাঠের ওপর একটা কুড়ুল রাখা ছিল।···

নিঃশব্দ পরিবেশ।

ওরা সকলেই কিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু মুখ থেকে বেরুনো কথাগুলো ঠোঁটে এসেই থেমে গেল। কীভাবেই আর নির্গত হবে! সামনে নিয়তির মতো দাঁড়িয়ে আছেন কুরুপ। ক্রোধে লাল অঙ্গারের মতো জ্বলছে দুটি চোখ। পাপের ভয়ে সকলেই তখন স্তব্ধ।

তারপর কুরুপের নির্দেশে ওরা তেঁতুল গাছের দক্ষিণ দিকে গর্ত খুঁড়তে শুরু করল। গরুর শরীরের কাটা, বিচ্ছিন্ন অংশগুলো কুরুপ তাঁর সামনেই সমাধিস্থ করালেন। তার ওপর মাটি চাপা দেবার পর তিনি চলে গেলেন সেখান থেকে।

পরের দু'তিনটি দিনে ওই গরীব লোকগুলোর ঘরে উনুন জ্বলল না। তবুও একদিন মাঝ রাতে দেখা গেল রাশি রাশি ধোঁয়া উঠছে ঘরগুলি থেকে। কে জানে কোন্ গূঢ়কর্মের পরিণাম সেই ধোঁয়া! কুরুপ কিন্তু সেই রাতে সুখেই নিদ্রা যাচ্ছিলেন—এই ঘটনার কিছুই তাঁর জানা ছিল না।

ছুরিটা হাসছে

কে. টি. মুহম্মদ

নিজের ছুরিটার দিকে তাকিয়ে আলী মোল্লাক্কার মনে হ'ল সেটা যেন রুপালি মাছের মতো হাসি বিচ্ছুরিত করছে। শরীরে লেপ্‌টে ছুরিটা এখনো তারই কাছে আছে আর হাসছে। এখনো সেটা নিঃশব্দে লেগে আছে তার কোমরে। এতদিন পর্যন্ত যথেষ্ট বিনীতভাবেই ছুরিটা তার কথা শুনেছে। কিন্তু আজ হাসছে অকৃতজ্ঞের মতো। অন্য সময় হলে মোল্লাক্কা আমল দিত না ব্যাপারটাকে, কিন্তু আজ···

আজ চারিদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরেছে অসহ্য যন্ত্রণা। বুকের ভিতর জমে-ওঠা হাহাকার বাড়তে বাড়তে এক সময় যেন ফেটে পড়বে, এ-রকম আশঙ্কা হচ্ছিল। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক ভয়ংকর পাহাড়। অব্যক্ত এবং উৎকণ্ঠাময় এক শক্তি যেন জ্বালিয়ে তুলছে তাকে।

ছুরি যখন তার যন্ত্রণা দেখেও হাসে তখন ইচ্ছে হয় সেটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় সমুদ্রের গভীরে কিংবা পাহাড়ের ওদিকে। ছুরি তার সব কাহিনীই জানে— এই ভেবেই নিজেকে নিরস্ত করল সে। ছুরিটাকে সে ভালোবাসে অভিন্নহৃদয় বন্ধুর মতো। মনে পরে এর ধার ও দীপ্তি। মানুষ তার প্রয়োজনীয় সব বস্তুকেই ভালোবাসে। তেমনি, এমন-কি অচেতন অবস্থাতেও, মোল্লাক্কা ছুরিটাকে ধরে রাখে বুকে। কথা বলে ছুরির সঙ্গে।

এই ছুরিটাই আলি মোল্লাক্কার জীবনের অবলম্বন আর সারাক্ষণের সঙ্গী। কিন্তু আজ ঘরে ঢুকেই সে নিজের বুকে ঝড়ের আবির্ভাব টের পেল। এখন বাঁচার জন্যে ছুরিটাকে বের করে নেওয়াই সংগত। ছুরিটা বের করে ঘরের মধ্যে একটি বেঞ্চির কিনার ঘেঁষে রেখে অপলকে তাকিয়ে থাকল সেদিকে। ছাদের ফুটো দিয়ে রোদ্দুর উঁকি দিচ্ছে ঘরে। সে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। তার জীবন বলতে তো ওই ছুরিরই কাহিনী। ছুরিটা ফেলে দিলে কি তার নিজেরও কোনো অস্তিত্ব থাকে !

সত্যিই, কাহিনী এক ছুরি নিয়ে।

ভিতরে উপছে-পড়া সূর্যের আলোয় ঝকমক করছে ক্ষুরধার ছুরিটা।

রুপোর মতো ঝলমলে ছুরি স্পর্শ করল সেই সূর্যালোক। সেই দৃশ্য দেখে চিন্তাভারাক্রান্ত আলী মোল্লাক্কা চমকে উঠল। হঠাৎই মনে হ'ল তার, ছুরিটা হাসছে তার দিকে তাকিয়ে। চিন্তার শেষ পর্যায়ে পৌঁছে তার দৃষ্টি ও মন চিতাগ্নির মতো জ্বলে উঠল।

এটা সম্মোহন হতে পারে, উন্মাদনাও হতে পারে।

আতশবাজির মতো তার চিন্তাও ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছিল।

এখন তার চোখের সামনে নাচছে সেই রক্তস্নাত শিশুটি। সে-ই তাকে ঠেলে দিয়েছে চিন্তার আগুনের দিকে। মনে হচ্ছে অশ্রুসজল দু'টি চোখ মেলে সে ক্রমশ এগিয়ে আসছে তার দিকে। 'কিন্তু বালকটিকে ধরে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নেওয়ার মতো সামর্থ্যও এখন তার নেই।

নিজের বুকের মধ্যে এখন সে স্পষ্টই অনুভব করছে আগুয়ান এক মিছিল। মানুষের নয়— সে-মিছিলে সামিল হয়েছে ছাগল,

গরু, মুর্গী··· অসংখ্য জীবের সে-মিছিলের শেষ দেখা যাচ্ছে না। এমন-কি সেদিক থেকে যে চোখ ফিরিয়ে নেবে, সে-সামর্থ্যও তার নেই। সে দেখতে লাগল, সবকিছুই অত্যন্ত স্পষ্ট ক'রে।

ওদের গলায় কি লাল-লাল ব্যাণ্ডেজ বাঁধা? নিশ্ছিদ্র লালের আভা··· না··· সবই রক্ত। রক্তই জমাট বেঁধে রূপ নিয়েছে কঠিন শিলার। কোন গলাটিই সোজা নেই। যেন ঝুলে পড়েছে আঘাতে। শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন গলা থেকে বহে যাচ্ছে রক্তস্রোত! কে ওদের গলায় ছুরি বস'লো!

ঝকঝকে, ক্ষুরধার সেই ছুরিটা তখনো পড়ে আছে সামনে। কিন্তু, একা ছুরিরই কি যত দোষ! তাহলে অপরাধী কে?

আলী মোল্লাক্কার চিন্তা তার নিজের প্রতিই তর্জনী তুলে ধরে। হৃদয়ে মিছিলের শেষ হয় না। কখনো কি হবে?

শবদেহের সেই ব্যাপক মিছিলের দিকে তাকিয়ে ভয়ার্ত হয়ে পড়ে সে। ক্লেশে ক্রমশ বিস্মৃত হতে থাকে নিজেকেও। নিশ্চিত প্রেতলোকের দিকে ক্রমশ এগিয়ে যায় সে।

মিছিল কি শেষ হ'ল? না, বরঞ্চ এখন সেই জান্তব চেহারা-গুলির ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে একটি মানুষের মাথা। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। কে? চেহারা দেখে সনাক্ত করা যায় না। কিন্তু, নিশ্চিত সে অপরিচিতও নয়। মোল্লাক্কা তাকে চেনে। তবু কে সে? কে? ভয়ে সিঁটিয়ে আসে শরীর। একটি পরিচিত অথচ অপরিচিত মানুষ! আলী মোল্লাক্কা অনুভব করছিল ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে তার, ভয়ে কাঁপছে শরীর। পালিয়ে যাব? একবার ভাবল সে। তবু পালিয়ে যাবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও এক-পাও এগোতে পারল না। সেই মানুষটির হাতে

ঝক্‌ঝক্‌ করছে একটা ধারালো ছুরি। ভূতের মতো মানুষটি এগিয়ে আসছে তার দিকে। থরথর ক'রে কাঁপতে শুরু করল আলী মোল্লাক্কা। সে চীৎকার ক'রে উঠতে চাইল, কিন্তু...

হাসিমাখা সেই ছুরিটা সে দেখতে পাচ্ছিল। বাঁ হাতের মুঠোয় সে শক্ত ক'রে চেপে ধরল ছুরিটা।

'অসংখ্য জীবের...ছাগলের, গরুর, মুর্গীর... গলা চিরে কি বেরিয়ে এসেছে ছুরিটা?' এই প্রশ্ন তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। ছুরিটা এখনো তার হাতে। ওইসব প্রাণীরা যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মরেছে, ভাবল সে। সে-সব মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছে সে নিজে, যদি চোখ থাকে তাহলে ছুরিটাও...

আবার চিন্তিত হয়ে পড়ল মোল্লাক্কা। ধর্মই তাকে চালিত করেছে এই পথে। ধর্ম শিক্ষক। ধর্মাচরণে যারা ইতস্তত করে না, ধর্মের দৃষ্টিতে তারাই পরমাত্মা। এই ধরনের মানুষই পশুদের হত্যা করে। এই ঘৃণ্য কাজের জন্যে মারা বা হত্যা করা গোছের শব্দ প্রযুক্ত হতে পারে না। এ-কাজ সত্যিই পুণ্যের। পুণ্যের নামে আমাদের পুর্বপুরুষেরা মানুষকেও বলি দিত।

যখন সে ওই জায়গার জীবজন্তুকে হত্যা করার কাজ স্বীকারই ক'রে নিয়েছে, তখন আর সেটাকে হাস্যকর বা পাপ বলা যায় না। এই ধরনের বিশ্বাস থেকেই আশ্বাস পেত মোল্লাক্কা। এরকম চিন্তা করেই সে যথার্থতা খুঁজে পেত কাজে। তার অন্তরেরও সমর্থন ছিল তাতে। পৃথিবীর সমস্ত সুখ-সুবিধা শুধু মানুষেরই জন্য— কোরানের এই বাক্য গিজ্‌গিজ্‌ করত তার মাথায়। পয়গম্বর ও তাঁর সঙ্গীরা উট মেরে খেয়েছিলেন। এ-সত্য তো সকলেই মেনে নিয়েছে!

এইভাবে নিজের চারিদিকে রক্ষার প্রাচীর গড়ে তুলত আলী মোল্লাক্কা। হয়তো…হয়তো…হাজার হাজার 'হয়তো' মানুষের অস্থি-পাঁজরার রূপ ধরে ফিরে ফিরে আসছে তার সামনে। নেতিয়ে-পড়া গলা নিয়ে জানোয়ারদের সেই মিছিল বার বার উত্তেজনা সৃষ্টি করছে মাথায়। জীবন-যন্ত্রণায় তারা ছটফট করছে মোল্লাক্কার সামনে। রক্তের সরোবর কী ভীষণ লাল! যেন ক্রমশ তা রূপান্তরিত হচ্ছে নদীতে। ওইসব পশুপাখির রক্তও তো মানুষের রক্তের মতোই লাল! গুঞ্জন তুলছে মৃত্যুর হাহাকার। বিদায় নিচ্ছে দীন-হীন আত্মা। সে নিজের হাতের দিকে তাকাল। হঠাৎ মনে হ'ল ছুরির দোষ নেই কোন। কিন্তু, আমিই বা নিরপরাধ নই কেন? কেন হাসতে পারছি না ওই ছুরিটার মতো? নিজেকে জিজ্ঞেস করল মোল্লাক্কা। তার ইচ্ছে করছিল পাগলের মতো হেসে উঠতে।

জীবহত্যার পাপ ধর্মের নামে সহ্য করা যাবে— এই চিন্তা থেকেই কাজটা স্বীকার ক'রে নিয়েছিল মোল্লাক্কা। না, ভেবেছিল, এই কাজে দোষ নেই কোন!

কিন্তু, আজ হঠাৎই মনে হচ্ছে ধর্মবিশ্বাসও প্রবঞ্চনা করেছে তার সঙ্গে। না হলে, সে ভাবল, আজ হঠাৎ আমার বুক জুড়ে এমন তোলপাড় শুরু হবে কেন!

সেই ছেলেটা ক্রমশ তার আরো কাছে এগিয়ে আসছে।

'মোল্লাক্কা, এই মুর্গীটা কেটে দাও তো। বাড়িতে জামাই এসেছে।'

কিছুক্ষণ আগে মাম্মুট্টির জন্যে একটা গলা সে কেটেছিল। মাম্মুট্টি তখন মুর্গীটা হাতে ক'রে নিয়ে এলো, তখন পিছনে পিছনে ওর ছেলেও এসেছিল কাঁদতে কাঁদতে। মাম্মুট্টিরই ছেলে।

'ও কাঁদছে কেন?' জিজ্ঞেস করল মোল্লাকা।

'ছেড়ে দাও ওর কথা। ও এটাকে কিছুতেই মারতে দেবে না। সেইজন্যেই কাঁদছে।' মাম্মুট্টি জবাব দিল।

'কাকা, ওটাকে মেরে ফেলো না।' ছেলেটা কাঁদতে লাগল। ছেলেটার কথায় কান না দিয়ে মুর্গীটার পা দুটো ও ডানা মুচড়ে ধরে। মাম্মুট্টি বলল, 'মুর্গীটা ওর নিজের চেয়েও বেশি প্রিয়। সারাদিন এটা-ওটা খাওয়ায়। আগে মুর্গীটাকে খাইয়ে তারপর নিজে খায়...এই তো ছেলের কাজ!'

হাতের ছুরিটার ধারালো দিকটায় হাত বোলাতে লাগল মোল্লাক। মুর্গীটার গায়ে-গায়ে লেগে কাঁদতে লাগল ছেলেটা।

'আমি কাটতে দেব না। কাটতে দেব না।' বার বার বলতে লাগল সে।

ছেলেটার কান্নায় আমল না দিয়ে মোল্লাকা আর মাম্মুট্টি কাজ সেরে ফেলার জন্যে তৈরি হ'ল। ছেলেটাকে হটিয়ে দিল মাম্মুট্টি। অসহায়ভাবে কাঁদতে লাগল ছেলেটা। এদিক-ওদিক থেকে আরো কয়েকটি ছেলেও সেখানে এসে জড়ো হয়েছিল। খুশী হ'য়ে তারা মুর্গী জবাই করা দেখছিল।

বাটির জল থেকে কিছুটা নিয়ে মুর্গীর দু'ঠোঁটের মাঝখানে ঢেলে দিল মোল্লাকা। মৃত্যুর আগে তৃষ্ণা নিবারণ সৌভাগ্যসূচক। হত্যাকারী মারার আগে যাকে হত্যা করে তাকে জল দিতে ভোলে না।

মুর্গীর গলা টিপে ধরে হত্যার জন্যে তৈরি হ'ল মোল্লাকা। ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে মুর্গীর গলায় ছুরি চালাতেই ছেলেটা ককিয়ে উঠল। 'তুমি আমাকে মেরে ফেলো,' চীৎকার ক'রে

হঠাৎই সে মুর্গী আর মোল্লাক্কার মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ল, বুক দিয়ে আড়াল করে নিল মুর্গীটাকে। একই সঙ্গে চমকে উঠল মোল্লাক্কা আর মাম্মুট্টি। তাড়াতাড়ি ছুরিটা টেনে নিল মোল্লাক্কা। কে জানে ছুরির আঘাত ছেলেটারও লেগেছে কি না। স্তব্ধ বোধ করল সে।

বুকের ভিতর মুর্গীটাকে আড়াল করে ছেলেটা তখনো কাঁদছিল। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটছিল মুর্গীটার গলা থেকে।

খুব রাগ হ'ল মাম্মুট্টির। ছেলেটার আড়াল থেকে মুর্গীটাকে সরিয়ে নিয়ে ধাক্কা দিল সে।

'কাকা, আমার মতো ওরও কষ্ট হচ্ছে। ওরও তো প্রাণ আছে?'

কাঁদতে কাঁদতে বলল ছেলেটা। অসহ্য যন্ত্রণায় মুর্গীটার ঠোঁট দিয়ে অস্পষ্ট কয়েকটা শব্দ বেরিয়ে এলো। মুর্গীটার যন্ত্রণা ছেলেটি আর সহ্য করতে পারছিল না। বলল, 'তুমি পাপ করছ। আল্লা তোমাকে নরকে পাঠাবেন।'

ছুরিতে লেগে-থাকা রক্ত ধুয়ে ফেলছিল মোল্লাক্কা। ছেলেটির অভিশাপ ওর বুকে এসে লাগল। সে থেমে গেল। রাগে ঠোঁট কাঁপছিল মাম্মুট্টির। কিন্তু ওরা কেউই নিরস্ত করতে পারল না ছেলেটিকে। ওরই মধ্যে হতচকিত মাম্মুট্টি দু'চারটে চড় লাগিয়ে দিল ছেলেটিকে। জামায় রক্ত দেখিয়ে ছেলেটি কিছু বলা সত্ত্বেও কানে তুলল না।

'খুব পীরিত হয়েছে তোর?' ধমকের গলায় পুনরায় বলল মাম্মুট্টি।

ততক্ষণে ছেলেটি জ্ঞান হারিয়ে পড়ো-পড়ো হয়েছে। সেই অবস্থাতেই বলল, 'মারো, যত ইচ্ছে মারো আমাকে।'

মাম্মুট্টি তার কথা কিছুই বুঝল না। হঠাৎ তার চোখে পড়ল ছেলের বাম কাঁধ ভিজে উঠেছে রক্তে। ব্যাপারটা চোখে পড়তেই সে আরো ভালো ক'রে তাকাল ছেলের দিকে। আশঙ্কায় হলুদ হয়ে উঠল চোখ। ছেলেকে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে দেখে চীৎকার ক'রে উঠল সে।

'মোল্লাক্কা!'

মোল্লাক্কা কাঁপতে লাগল। ছুরিটা খসে পড়ল তার হাত থেকে। ছুরির গায়ে লেগে থাকা রক্ত শেষপর্যন্ত মুছতে পারল না সে। এ কার রক্ত? মুর্গীটার, না ছেলেটার? ছুরিতে লেগে-থাকা রক্তাভার দিকে তাকাতে সাহস হচ্ছিল না তার। কান জুড়ে তোলপাড় করতে লাগল বালকের কণ্ঠস্বর।—

'আমার মতো ওরও প্রাণ আছে। আল্লা সবই দেখছেন উপর থেকে। মনে রেখো।'

মুর্গীটা ছটফট করছে এখনো। মোল্লাক্কা জানে, এই সেই মৃত্যু-যন্ত্রণা। শুধুই মানুষকে নয়, এ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় সমস্ত জীবকেই। মানুষ যদি বেঁচে থাকতে চায়, অন্যান্য প্রাণীও কি তা চাইবে না? মোল্লাক্কার চিন্তাধারা বিশৃঙ্খল হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ। মানুষকে যে-মানুষ হত্যা করে, তাকে দণ্ড দেয় মানুষের সরকার। কিন্তু, মূক এইসব জীবের আত্মার কি মূল্য নেই কোন। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্য ভেসে উঠল চোখে। আত্মার মূল্য কি? কে তার মূল্য নির্ণয় করবে? এবম্বিধ প্রশ্নে মাথা ঘুরতে লাগল মোল্লাক্কার।

তার হৃদয় জ্বলতে লাগল, পাকিয়ে উঠল সব চিন্তাস্রোত।

ছেলেটাকে কোন অভিশাপ দিতে পারল না সে। বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে এলো প্রায়।

তবে কি তার এতদিনের বিশ্বাসই তিরস্কার করছে তাকে? আজ পর্যন্ত যে-ধর্ম সে পালন করে এসেছে, সেই ধর্মই কি তাকে ছেড়ে যাচ্ছে অবশেষে? মোল্লাক্কা ত্রস্ত হয়ে উঠল। মনে হ'ল সে একা এবং অসহায়।

ওর হাতে ছুরিটা হেসে যাচ্ছে তখনো। আগের মতোই তপ্ত লাগছে হাতের মুঠি। মোল্লাক্কার মনে হ'ল তার গোটা হাতটাই জ্বলছে।

অন্তরের চলমান মিছিলটা কোন্ ধরনের মনে হচ্ছে? ছেলেটির কণ্ঠস্বরের মতোই আরো একটি কণ্ঠস্বর কানে এলো তার। জীব-গুলির মধ্যে ওই মানুষের আকৃতি ক্রমশ এগিয়ে আসছিল মোল্লাক্কার দিকে। তার হাতে মোল্লাক্কার ছুরির মতোই একটি ছুরি। নিজের ছুরিটা শক্ত ক'রে মুঠোয় চেপে ধরল মোল্লাক্কা। ঝকমক করছে ছুরিটা। না, হাসছে। মনে হল ছুরিটা যেন তার হাত থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইছে। একটি গলার সঙ্গে পরিচিত সেই ছুরি ত্বরিত ছুটে যেতে চাইছে অন্য গলার দিকে। তার চোখ থেকে আগুনের হল্‌কা বেরুতে লাগল। বস্তুত, কিছুই আর ভালো ক'রে দেখতে পারছিল না সে। যেন ভয়ে সে পাগল হয়ে যাবে।

নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠল মোল্লাক্কার। সেই অস্পষ্ট পুরুষ— যাকে অপরিচিত লাগছিল না, কি তার কণ্ঠরোধ করছে? তাহলে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে কেন। সে কি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে? সেই বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাইল মোল্লাক্কা; পারল না। ডান হাতে ছুরি ধরে এগিয়ে আসছে সেই মূর্তি। মোল্লাক্কা ভুল বকতে লাগল। এখন সে সম্পূর্ণই বিভ্রান্ত। চোখের সামনে শুধুই ছুরি আর কাটা-গলার নৃত্য। একটির পর

একটি গলা কাটা হয়ে পড়ে যাচ্ছে আর নির্গত রক্ত ক্রমশ কালো হয়ে যাচ্ছে জমে।

মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করে প্রাণী, আর ছটফট করতে করতে মরে যায়। ছুরিতে কার রক্ত— মুর্গীর, না বালকের?

মানুষেরই রক্ত!

মোল্লাক্কার হাত উঠে গেল ওপরে। তীক্ষ্ণ চোখে সে তাকাল ছুরিটার দিকে। এখনো কি হাসছে ছুরিটা? সে পাগল হয়ে গেল। দাঁতে দাঁত ঘষে হিজিবিজি শব্দ তুলল মুখে।

ছুরি, গলা, রক্ত।

এ-সবই রকেটের মতো তীব্র গতিতে ছুটতে লাগল তার বুকের মধ্যে। গলার ফাঁস কঠিন হতে লাগল ক্রমশ। একটু নিঃশ্বাসের জন্যে ছটফট করে উঠল সে। মনে হচ্ছিল কোথাও আর ভারসাম্য খুঁজে পাচ্ছে না। জাগতিক বিচারবুদ্ধির মধ্যে আর সে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারল না।

আবার সেই ছুরি, আর গলা।

গলা অভিমুখে দ্রুত ছুটে যাচ্ছে ছুরি। ধারণ করছে মৃত্যুর রূপ। খসে পড়ছে গলা। ছুটে যাচ্ছে রক্ত। মৃত্যু, আবার ছুরি, আবার গলা, এবং মৃত্যু।

হাতে ধরে থাকা ছুরিটা দ্রুত ব্যবহার করল সে। অল্প শব্দ হল মাংসের···

একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এলো মোল্লাক্কার গলা দিয়ে। পরনের কাপড় ভিজে গেল রক্তে। ছুরিটা খসে পড়ে গেল হাত থেকে, আর সে নিজেও পড়ল মুখ থুবড়ে।

রক্তে ভিজে গেছে ছুরিটা। সেটা হাসছে!

বলির পাঁঠা

নন্দনার

লাঞ্চের সময় বাড়িতে এসে লেফ্টানেণ্ট কর্নেল সাহুজা দেখলেন অতিথি-কক্ষের সোফার ওপর শুয়ে আছেন শ্রীমতী সাহুজা।

নিঃশব্দে পোষাক বদলে, পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে কর্নেল আবার ফিরে এলেন সেই ঘরে, দেখলেন স্ত্রী তখনো ঘুমুচ্ছেন। খুবই খিদে পেয়েছিল কর্নেলের, তবু, সুখনিদ্রায় শায়িতা স্ত্রীর সৌন্দর্য আস্বাদনের জন্যে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন। অপূর্ব লাবণ্য। পনেরো বছরের দাম্পত্য-জীবনে স্ত্রী তাঁকে দু'টি সন্তান উপহার দিয়েছে, তবু রূপ ও যৌবন টাল খায়নি এতটুকু! স্ত্রীর কাছে বসলেন কর্নেল। তারপর ঝুঁকে খুব মৃদুভাবে কপোল স্পর্শ করলেন তার। সেই স্পর্শে ছিল গোলাপ আর ইয়ার্ডলি পাউডারের মিশ্র সুগন্ধ।

চমকে জেগে উঠলেন শ্রীমতী সাহুজা।

কর্নেল, 'আমি গো, আমি।'

'অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।' বাঁ হাতটা ঠোঁটের ওপর চাপা দিয়ে হাই তুললেন শ্রীমতী সাহুজা।

'আই'ম সরি!' স্ত্রীকে কাছে টেনে চুম্বন করলেন কর্নেল।

'আরে···না···না···এখন নয়।'

তারপর দু'জনে লাঞ্চের জন্যে ডাইনিং হলে এলেন।

বুড়ো বাবুর্চি তখন ডাইনিং টেবিলে খাবার সাজিয়ে রাখছে।

'কাম সেপ্টেম্বর' ছবির একটি গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে আলস্যভারে চেয়ারে বসলেন কর্নেল। তারপর চিকেন স্যুপের বাটিতে চুমুক দিয়ে বললেন, 'আজ সেই লোকটাকে শাস্তি দিলাম।'

'কাকে ?'

'সিপাই ভোলানাথকে।'

'কী শাস্তি দিলে ?' খুশীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন শ্রীমতী সাহুজা।

'28 দিনের আর. আই.।'

শ্রীমতী শাহুজা হাসতে লাগলেন।

'ঠিক করেছ। ওকে কোর্ট মার্শাল করে সিভিল জেলে পাঠালেই ঠিক হত। বেটা বদমাইস কোথাকার!'

একটু বা অন্যমনস্কভাবে কর্নেল বললেন, 'তত বড় অপরাধ ও করেনি। ওর মুখ দেখতে ভালো লাগছিল না, তাই একটা আইনের প্যাঁচে ফেলে শাস্তি দিয়ে দিলাম।'

কর্নেল আর তাঁর স্ত্রী যখন চিকেন স্যুপে চুমুক দিতে দিতে ভোলানাথের বিষয়ে কথাবার্তা বলছিলেন, ঠিক তখনই রেজিমেণ্টের কোয়ার্টার গার্ডের কুঠরীর দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে বসে ছিল ভোলানাথ। ঈশ্বর ছাড়া আর কাকেই বা সে নিজের দুঃখের কথা জানাতে পারে। ঈশ্বর নিশ্চয়ই সবই দেখছেন। বিশ বছরের সিপাই-জীবনে এই প্রথমবার দণ্ডিত হ'ল সে। আর সেটাও কোন দোষ না করেই; সিপাই-জীবনের শেষ প্রান্তে এসে। 'শীট রুলে' লাল দাগ পড়ে গেল। এ-সবই সহ্য করা যায়। কিন্তু আঠাশ দিনের বেতন পাবে না, এটা ভাবলেই শিউরে উঠছে বুক। গাঁয়ের ভাঙা-চোরা বাড়িতে বসে তার মনিঅর্ডারের অপেক্ষা করছে বউ আর

ছেলে। বেতন পেয়েই তার প্রথম কাজ বউকে টাকা পাঠানো। তারপরেই সে ব্যারাকে আসে। ততক্ষণে মন শান্ত হয় কিছুটা। কিন্তু সামনের মাসে কী করবে? এ-সব ভেবে দু'চোখে অন্ধকার দেখল ভোলানাথ, মাথা ঘুরতে লাগল তার।

কুড়ি বছরের পুরনো এক 'ইনফ্যান্ট্রি' সিপাই ভোলানাথ। কিছুদিন থেকেই হাঁপানিতে ভুগছে। নতুন রেজিমেণ্টে আসার পর তিন মাস হয়ে গেল। এখানে এসেছে সিকিম বর্ডার থেকে।

সিকিম বর্ডারের কড়া ঠাণ্ডায় খুবই কষ্টে দিন কাটছিল তার। সেখানে কিছুদিন হাসপাতালেও থাকতে হয়েছিল।

নতুন-আসা সিপাইদের 'স্টাফ-প্যারেড'-এর দিন ভোলানাথ সি. ও. সাহেবকে বলল, 'হুজুর, আমি হাঁপানিতে ভুগছি।'

সে-কথায় আমল না দিয়ে কর্নেল সাহেব বললেন, 'কঠিন কাজ করতে পারবে না বুঝি?'

'না, হুজুর।'

'হাল্‌কা কাজ দিলেই তো হবে?'

তারপর কর্নেল সুবেদার মেজরের দিকে ঘুরে আদেশ দিলেন, 'একে আমি নিজের আর্দালী ক'রে নিচ্ছি। কাল ভোর চারটেয় আমার বাড়িতে চলে এসো। ও. কে.?'

'ঠিক আছে হুজুর।' বলল সুবেদার মেজর।

তাড়াহুড়ো ক'রে অফিসে চলে গেলেন কর্নেল।

ভোলানাথ ঘাবড়ে গেল। আর্দালী! আজ পর্যন্ত কোনদিনও সে আর্দালীর কাজ করেনি। সিপাইদের মধ্যে সামান্য আত্ম-মর্যাদাও যাদের আছে তারা ও-কাজ করতে ইতস্ততঃ করবে। এত কষ্ট স্বীকার সত্ত্বেও আত্মমর্যাদা-হানিকর কোন কাজই সে

এ-পর্যন্ত করেনি। চাকরির শেষ পর্বে এসে কি এ-কাজও করতে হবে।

'হুজুর! আমি এ-কাজ করতে চাই না।' কথাটা এসে গিয়েছিল মুখে; কিন্তু কর্নেল ততক্ষণে পৌঁছে গেছেন অফিসে।

এরপর গিয়ে কথা বলা উচিত হবে না। লোকে বলে কর্নেল হৃদয়হীন, প্রথম দিনই ওর বিষ নজরে পড়ার ইচ্ছে তাই ছিল না। সেইজন্যে তখনকার মতো চুপচাপ থাকল। দরকার হলে 'প্রপার চ্যানেলে'র মাধ্যমে রিপোর্ট করা যাবে।

সেইদিনই সেণ্ট্রাল রোলকল থেকে নিজের রিপোর্ট তৈরি করিয়ে ভোলানাথ সুবেদার মেজরকে দেখাতে গেল।

'হুজুর, আর্দালীর কাজ তো আমি করতে পারব না।'

কথা শুনে রেগে গেল সুবেদার মেজর। চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বলল, 'তাহ'লে কোন্ কাজ করবে শুনি? টিলা-কাপ্তান এখন ছুটিতে গেছে, সেই কাজ দেব নাকি?'

যতটা সম্ভব নম্র হয়ে ভোলানাথ বলল, 'হুজুর! আমি রেশন চেকিংয়ের কাজ করতে পারি।'

'রেশন চেকিংয়ের কাজ তুমি কী ক'রে করবে? বসে বসে মাছি মারবে? বুড়ো হয়ে গেছ, শরীর দুর্বল, আবার হাঁপানিও আছে!'

সুবেদর মেজর ঠিকই বলেছে। সত্যিই বুড়ো হয়ে গেছে সে, শরীরে শক্তি নেই, এদিকে শ্বাসকষ্টও আছে। কিন্তু এ-সব তো তার নিজের দোষে হয়নি।

ভোলানাথ আবার অনুনয় করল, 'হুজুর, আমি তবে অফিসেই আর্দালীর কাজ করি।'

সুবেদার মেজর ধৈর্য হারিয়ে ফেলল, 'মূর্খ। গাধা, যা, চলে যা সামনে থেকে। মনে রাখিস্ কাল সকালে কর্নেল সাহেবের বাড়িতে রিপোর্ট না করলে...'

হতাশ হয়ে ফিরে এলো ভোলানাথ। বড়োই বিপদে পড়ল সে। নিজের দুঃখের কথা কাকে বলবে এ-পৃথিবীতে। এর চেয়ে সিকিমের তীব্র ঠাণ্ডায় শ্বাসকষ্টে ভুগতে ভুগতে মরে যাওয়াও ভালো ছিল!

বিশাল জগৎ এই সিপাইদের। এখানে মানুষ যেমন আছে, তেমনি পশু আর পোকাও আছে। আর ভোলানাথের মতো একজন সামান্য সিপাই তো পোকা মাত্র। আদেশ মেনে চলা ছাড়া আর কী করতে পারে সে? ভালো মন্দ বিচারের অধিকারও তার নেই।

নির্দেশানুসারে পরের দিন সকালে ভোলানাথ গিয়ে পৌঁছলো কর্নেলের বাড়ি। বড়ো, কেতাদুরস্ত বাড়ি। সামনে বাগান। পিছনে সার্ভেন্ট্স্ কোয়ার্টার্স আর গ্যারাজ। কর্নেলের দুই ছেলে, তারা কথা বলে ইংরিজীতে। অপরিচিত লোকজনের গায়ে লাফিয়ে পড়ার জন্যে একটা অ্যালসেসিয়ানও আছে বাড়িতে। সব মিলিয়ে কর্নেলের বাড়িতে ভয় আর নতুনত্ব মেশানো এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হ'ল ভোলানাথ। ভয় ও নবীনতায় মেশানো এই জগতের নায়িকাও বেশ সুন্দরী ও অহংকারী। প্রথম দর্শন থেকেই ভোলানাথ মেমসাহেবকে ঘৃণা করতে শুরু করল।

ভোর ছ'টায় ভিতর-বাড়তে ঢুকত ভোলানাথ, তারপর নিজের ঘরে ফিরতে ফিরতে হয়ে যেত অনেক রাত। বাগানের গাছে জল দেওয়া, বাজার থেকে মাংস আর শাকসব্জী কিনে আনা,

ধোপার বাড়ি যাওয়া, বাড়ির সবার চটি-জুতো পালিশ করা—এইসব এবং এমন ধরনের আরো অনেক কাজই করতে হ'ত তাকে। গোড়ার দিকে এই ধরনের কাজ করতে বড়োই মনোকষ্ট হ'ত তার। কিন্তু, দুঃখ করেই বা লাভ কী! অশিক্ষিত, বুড়ো আর অসুস্থ লোকের মনোকষ্ট বুঝবে কে! নীরবে সবকিছু সহ্য করাই ভালো। তাকে, তার স্ত্রীকে এবং ছেলেদের বেঁচে থাকতে হবে এই পৃথিবীতেই!

ত্রিশ দিন নানা ঝামেলার কাজ করেও বাড়িতে টাকা পাঠাতে পেরেছে ভেবে মনে মনে কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিল ভোলানাথ।

এইভাবে কেটে গেল দু'টি মাস। একদিন বাড়ির পিছনের কলে ভোলানাথ কর্নেল সাহেবের গেঞ্জি কাচছিল, হঠাৎ একটা পেটিকোট উড়ে এসে পড়ল তার সামনে— যেন বা আকাশ থেকে কিছু পড়ল! ওপরে মুখ তুলে ভোলানাথ দেখল মেমসাহেব দাঁড়িয়ে আছে।

'এই পেটিকোটটা কেচে দাও তাড়াতাড়ি। এয়ার-ফোর্স অফিসার্স মেসে যাবার সময় পরব আমি।'

ভোলানাথ একেবারে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। রাগে কাঁপছিল সে। অগ্নিবর্ণ চোখে মেমসাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পেটিকোট আমি কাচতে পারব না।'

'চুপ কর গাধা, এটা কাচলে কি তোর হাত-পা গুঁড়িয়ে যাবে?'

ভোলানাথ দিশেহারা বোধ করল। বলল, 'আর একটা কথা বললে মেয়েমানুষ বলে খাতির করব না।' এই ব'লে, আর এক মুহূর্তও দেরি না ক'রে ইউনিট লাইনে ফিরে এলো সে, এবং সুবেদার মেজরের কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল।

'আপনাদের যা ইচ্ছে করতে পারেন; কিন্তু আজ থেকে আমি কর্নেল সাহেবের আর্দালীর কাজ করতে পারব না।'

'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?'

'হ্যাঁ, আমি পাগলই হয়ে গেছি।'

'মূর্খ, কী হয়েছে বলবে তো?'

'মেমসাহেবের পেটিকোট আমি কাচতে পারব না। আপনারা ফাঁসিতে ঝোলান আমাকে, দেশ থেকে তাড়িয়ে দিন— এ-কাজ আমার দ্বারা হবে না।'

ভোলানাথের মুখচোখ লক্ষ্য ক'রে সুবেদার মেজরও বুঝল ব্যাপারটা গোলমেলে। ওর মর্যাদায় ঘা লেগেছে।

'কিছু রিপোর্ট করার থাকলে 'প্রপার চ্যানেল' দিয়ে যাও। আমার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।'

'প্রপার চ্যানেল' শুনে ভোলানাথ দ্রুত নিজের ঘরে ফিরে এসে লুটিয়ে পড়ল খাটিয়ায়। সে ঠিকই করে ফেলল, পরিণতিটা যা-ই হোক, আর সে কর্নেল সাহেবের বাড়িতে যাবে না।

সেইদিনই দুপুরে লাঞ্চের সময় কর্নেলকে তাঁর স্ত্রী বলল, 'ভোলানাথ লোকটাকে আগে যেমন ভেবেছিলাম তেমন নয়। এক নম্বরের পাজী।'

'কেন, হয়েছে কী?'

'বলেছিলাম পেটিকোটটা কেচে দিতে, শুনল না। এত বদমাইস!'

'কী বলল?'

'বলবে আর কি, গজগজ করতে করতে চলে গেল!'

'এত! ঠিক আছে, আমি ওর ব্যবস্থা করব!'

তারপর সুবেদার মেজরকে ফোন ক'রে কর্নেল বললেন, 'আজ থেকে ভোলানাথকে আমার বাড়িতে পাঠিয়ো না।'

এইভাবে আর্দালীর কাজ শেষ হয়ে গেল ভোলানাথের। শেষ পর্যন্ত কর্নেলের বিষ-নজরেই পড়ল সে।

আর্দালীর কাজ যাবার পর ভোলানাথকে গেট আর. পী.'র কাজ দেওয়া হ'ল। মন্দ নয় কাজটা। ফিটফাট পোষাকে থাকতে হ'ত সব সময়।

পরনে কড়া ইস্ত্রি-করা পোষাক, হাতে আর. পী. লেখা ব্যাজ, ছোট ছড়ি হাতে নিয়ে হাঁপানি রুগী বুড়ো সিপাই ভোলানাথ ইউনিটের গেটে দাঁড়িয়ে থাকে, আর সেলাম ঠোকে যাতায়াতকারী অফিসারদের। খুব মন দিয়ে সে লক্ষ্য করে কর্নেল সাহেব কখন আসেন আর যান। তাঁকে দেখলেই পুরো শক্তি দিয়ে স্যালুট করে। সে খুব ভালো করেই জানে কর্নেল সাহেব তাকে জব্দ করার মতলব খুঁজছেন। সিপাইদের ত্রুটি বের ক'রে শাস্তি বিধানের সময় বড়োই নির্দয় হয়ে পড়েন অফিসাররা।

ভোলানাথ বুঝতে পারে তাকে বেকায়দায় ফেলার জন্যে জাল ফেলেছেন কর্নেল সাহেব। নিজেকে বাঁচানোর জন্যে খুবই ভেবে-চিন্তে, সতর্কভাবে কাজ করে সে। কিন্তু, এত করা সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত কর্নেলের ফাঁদেই পা দিল সে।

একটা বাজে প্রায়। কর্নেলের লাঞ্চে যাবার সময়। বুঝেসুঝেই সতর্ক ছিল ভোলানাথ। কর্নেলের জীপ এখান দিয়ে যাওয়া মাত্র শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে স্যালুট দেবে সে। কর্নেল চলে যাবার পরই সে নিজে খেতে যেতে পারবে। খুবই খিদে পেয়েছিল।

কিন্তু খিদের কারণে তো আর কাজে ঢিলে দেওয়া যায় না। ঠিক সেই সময় একসঙ্গে বন্দুক ছোঁড়ার আওয়াজ ও একটি কুকুরের আর্তনাদের শব্দ কানে এল তার। তার কাছেই হাতে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাবিলদার চরণ সিং; সে এমন টান-টান হয়ে দাঁড়িয়ে রইল যেন কিছুই হয়নি।

ভোলানাথ যখন সেই ভয়ঙ্কর ও করুণ দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আছে— সেই সময় কর্নেলের জীপ বেরিয়ে এলো ফাটকের বাইরে। স্যালুট করতে ভুলে গেল ভোলানাথ।

কর্নেলের জীপ ব্যাক ক'রে ভোলানাথের সামনে আসতেই হুড়বড়িয়ে স্যালুট দিল সে।

'তোমার কাছে জীপ এনে দাঁড় করালেই স্যালুট করবে?' জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল।

কী বলা যায়। মনে হ'ল জিবটা সেঁধিয়ে যাচ্ছে পেটের ভিতর। ভোলানাথ কিছুই বলতে পারল না।

'আমি যখন এখান দিয়ে গেলাম তখন কি মরে গিয়েছিলি?'

'আজ্ঞে না, হুজুর · হুজুর···'

'হুজুরের বাচ্চা! কী করছিলি তখন?'

'হুজুর! কুকুরটা গুলি খেয়ে···'

'কুকুর গুলি খেল না খেল তাতে তোর কী রে গাধা। ফ্রন্টে পাঠালে কী করতিস?'

কর্নেল সাহেবকে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ছুটে এলো সুবেদার মেজর। তাকে দেখে বিরক্ত হয়ে কর্নেল বললেন, 'ডিসিপ্লিন্ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে এখানের! সি. ও.-র এই অদ্ভুত সিপাই স্যালুট পর্যন্ত করে না।'

ভোলানাথ কিছু বলতে চাইছিল, তার আগেই 'চুপ করো' ব'লে মারের ভঙ্গিতে ওর দিকে হাত তুলল সুবেদার মেজর।

কর্নেল বললেন, 'একে কাল আমার সামনে মার্চ করাবে।'

কর্নেলের জীপ স্টার্ট নিল। স্যালুট দিল সুবেদার মেজর। একটা আহত জানোয়ারের মতো শব্দ করতে করতে জীপটা চলে গেল।

জীপটা অদৃশ্য হবার পর সুবেদার মেজরও যা-ইচ্ছে-তাই ব'লে তিরস্কার করল ভোলানাথকে। একটি শব্দও উচ্চারণ করল না ভোলানাথ।

কে বুঝবে কেন আমি স্যালুট দিতে পারিনি! একটা প্রাণী তখন মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করছে অসহায়ভাবে। আমার একাগ্রতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল! কিন্তু কাকে বলব এই কথা, আর কেই বা শুনবে!···

পরের দিন কর্নেলের সামনে মার্চ করানো হ'ল ভোলানাথকে। আঠাশ দিন আর. আই.-এর দণ্ড দিলেন কর্নেল।

ক'দিন উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষার ফল এইভাবে পাওয়ায় খুশীতে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলেন কর্নেল। তারপর জীপে উঠে লাঞ্চ সারতে বাড়ির দিকে রওনা হলেন। এই খুশীর খবরটা স্ত্রীকে দিয়ে শান্তি হ'ল তাঁর।

ভোলানাথকে কী ভাবে জালে ফাঁসানো হ'ল সেই কাহিনী বর্ণনা করতে করতে ও শুনতে শুনতে আনন্দে খাবার খেতে লাগলেন স্বামী-স্ত্রী।

বিহারের একটি গাঁয়ের এক জীর্ণ কুঁড়েঘর। ক্ষুধায় কাতর ভোলানাথের স্ত্রী আর ছেলেদের জন্যে পরের মাসে ডাকপিওন আর মনিঅর্ডার নিয়ে এলো না!

তিরস্কৃত গল্পকার

টি. পদ্মনাভ

বৃষ্টি পড়ছিল জোরে। সেই সঙ্গে ঠাণ্ডাটাও বেড়ে গেছে। সকালে আকাশ পরিষ্কার ছিল। তারপর কোথাকার হাওয়া সঙ্গে নিয়ে এলো বৃষ্টি। ছাগ-সরল আর নিরীহ সাদা মেঘের ধরন-ধারণই যেন পাল্টে গেল। সবেগে তারা ছড়িয়ে পড়ল আকাশ জুড়ে। বাষ্পময় এই কালো-কালো মেঘের দিকে তাকিয়ে আমার যে-অনুভূতি হ'ল তা বলতে সংকোচ লাগছে। তবু বহুকাল আগের পরিচিত এক শ্যামবর্ণা তন্বীর স্মৃতি জেগে উঠছিল আমার মনে। কি সে-শরীর!— সম্পূর্ণ-বিবস্ত্রা…।

সকালেই এ-নিয়ে কথা বলছিলাম এক বাক্পটু শিল্পীর সঙ্গে। শিল্পী আমার বন্ধুও বটে। সে-জন্য রেখে-ঢেকে বলার কোন ব্যাপারই ছিল না; অশিক্ষিত মুর্খের মতো আমার কথা সে শুনছিল। আমার নাড়ী টিপে বলল, 'খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, এখন বেশী কথা বলা ঠিক নয়।'

শুনে রাগ হ'ল। রাগটা চেপে গেলেও কথাবার্তা আর এগলো না। বস্তুত, আমি ক্লান্ত হইনি। তখনো পুরো উৎসাহ ছিল আমার মনে।

ওর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল আমার। কিন্তু বাক্স্ফূরণ হ'ল না। একা শুয়ে-শুয়ে নিঃসহায় ভঙ্গিতে তাকিয়ে ছিলাম বাইরে।

জেগে-জেগেই আমি এক স্বপ্নসৌধ নির্মাণ করলাম। বন্ধু কারও ছবি আঁকছিল। তার সামনে একটি সুন্দর থালা। সেটার ওপর সাজানো রয়েছে কাগজ, পেন্‌সিল আর রঙ। যেখানেই যাক, থালাটা সব সময়েই সঙ্গে থাকে ওর। আমার একটু অবাকই লাগে। একদিন জিজ্ঞেস করলাম, 'মৃত্যুর সময়েও কি থালাটা তোমার সঙ্গে থাকবে?'

'নিশ্চয়ই। এই থালাটা ছাড়া ঈশ্বরের কাছে পৌঁছব কী ক'রে?' সে বলল।

ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস নেই। তবু বিশ্বাস আছে উৎকৃষ্ট চিত্রকলায়। শিল্পীদেরও আমি সম্মান করি। কিন্তু, আমার ধারণা শিল্পী মাত্রেরই উচিত পল গঁগ্যার ধরনে বাঁচা— দক্ষিণ সাগর-অধ্যুষিত তাহিতি দ্বীপে এক ঝড়ের রূপে পল গঁগ্যা।

আমি যদি পল গঁগ্যা হতাম— হয়তো— আমার আর পল গঁগ্যার মধ্যে ব্যবধান এক ফ্রেমে-বাঁধানো ছবির। সে-ছবি ঈশ্বরের। তার কাঁচ ভেঙে গেছে। জানি না কে ভেঙেছে।

কে সে?

তাড়াতাড়ি বলো

না—

ওকে মেরো না

মা'র বেদনার্ত করুণ কণ্ঠস্বর।

না-না, এদিকে আয়।

আমার ভয় করতে লাগল। পালাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না।

যন্ত্রণায় কাতর আমি চীৎকার ক'রে উঠলাম।

তবু দাঁড় করাতে পারলাম না ছবিটা।

সেদিন এক বালকমাত্র ছিলাম।

পরের পর ছবি তো তৈরি করতে—

কী ক'রে হ'ত?

পল গঁগ্যা। তাহিতি দ্বীপের—

বন্ধুর কাছে থালাটা দেখলেই মনে পড়ে যেত সেই ঘটনা

ঠাণ্ডা লাগছে ভীষণ।

শব্দ ক'রে ছুটে যায় ইলেকট্রিক ট্রেন।

কড়···কড়·· কড়···কড়···কড়···কড়

এখনো প্রদীপ জ্বলেনি ঘরে? কে জ্বালাবে? আমি উঠব না। এইভাবেই শুয়ে থাকব। অন্ধকার এসে ঢেকে দিক আমাকে।

জানলাটা খোলা আছে। অন্ধকার চারিদিকে আর আকাশও ভিজে। একটিও তারা দেখা যাচ্ছে না। হাওয়ায় উড়ে আসছে বৃষ্টির কণা। তবু জানলাটা বন্ধ করলাম না আমি। কাল যদি এইভাবেই মরে যাই তাহ'লে বিছানায় আর আমার মুখমণ্ডলে লেগে থাকবে বৃষ্টির রেণু। যারা দেখবে তারাই বলবে—

'আ-হা, লোকটা মরে গেছে!'

'আজকাল ওর শরীর ভালো যাচ্ছিল না। বোধহয় ওর জীবনেও কঠিন কিছু ঘটেছিল।'

'মাঝে-মাঝে গল্প লিখত।'

ঝকমকে মুক্তোর নাকছাবি-পরা সেই যুবতীটির কথা কেউই কিছু বলবে না।

সে এখন কোথায়?

তারায় ভরা নীলাকাশের নীচে গোলাপের গন্ধময় মৃত্যুকে আহ্বান করছি আমি।

কাশ্মীরের বনিহালের একটি রাত। ঠিক এইভাবেই শুয়েছিলাম আমি। কাছে ছিল অনেক-অনেক লোমশ ছাগল আর কুকুর। দূরে বরফে ঢাকা পাহাড়। ঢালু পথে নিয়ত কলস্বিনী ঝর্নার জল সেই হিমাবৃত প্রদেশে নক্ষত্রপুঞ্জের মতো ঝিকমিক করছিল।

সকালে ঘুম ভাঙার পর খেয়াল হ'ল আমি মরিনি। যদি সেই রাতেই মৃত্যু হ'ত আমার! নিজের কাহিনীর বিষয়ে তো এখনো কিছুই বলতে পারিনি। তবে সময় হয়ে গেছে, বলতে হবে।

এই ঘরটা তেমন ভালো নয়, তবু এখানে কেন থাকি? কারণ জায়গাটা ভালো। তারও কারণ আছে। অন্য কোন কাজ না থাকায় খাটে শুয়ে তাকিয়ে থাকতে পারি বাইরে। দূরে, হাওয়ায় ছুলে-ওঠা গাছের বিস্তৃত সবুজের পিছনে চোখে পড়ে আকাশ। উদাসীনভাবে তাকিয়ে থাকি আমি। ডাক্তার রাওয়ের বাগানের গুলমোরের চমৎকার শোভা, সবুজ ঘাসের আস্তরণে ঢাকা রাস্তা, পচা আর ঘোলাটে জলের পুকুরে বিশ্রামরত মোষ, পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে বৈদ্যুতিক ট্রেন আর, তারও ওদিকে— বিশাল ময়দান আর সবুজ বন।

সন্ধে হতে না হতেই ভিড় জমতে শুরু করে রাস্তায়। বেশীর ভাগই মেয়েদের ভিড়। গোটা নয়েক স্টুডিও আছে ওখানে।

এইসব নিয়েই বেঁচে আছি!

একটা গল্প লিখেছিলাম। ওইসব মেয়েদের নিয়েও আমি লিখেছি, কিন্তু ওদের কারো সঙ্গেই কখনো কোথাও যাইনি! বলতে কি, একটিও মেয়ের কাছে আমি যাইনি আজও।

সম্ভবত এ-সবও অনেকদিন আগেকার কথা। তারপর···

যাবার সময় তার আঁকা ছবিটা আমাকে দিয়ে গেল বন্ধু। অনেকক্ষণ ধ'রে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমি। শেষ পর্যন্ত জল এসে গেল চোখে। দু-এক ফোঁটা ঝ'রে পড়ল ছবিটার ওপরেও। আমি কাঁদিনি। কিন্তু অশ্রু বাধা মানল না আমার চোখে।

কিছুও যদি বলতে পারতাম কাউকে ··

ওই ছবিটার নীচে লিখলাম—"একজন তিরস্কৃত গল্পকার"।

এ সেই ধরনের ছবি আত্মা যেখানে নিজের ভিতরেই আত্মগোপন করে। স্পষ্ট ক'রে বোঝা যায় না কিছুই। তবু সে-ছবিকে অসম্পূর্ণ বলা যাবে না। খোলা জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে আকাশ, বৃষ্টি ও হাওয়ার দাপটে দুলতে থাকা গাছের পাতা— সবই রয়েছে তাতে! নিজের কাহিনীর পাণ্ডুলিপির দিকে তাকিয়ে আমার মনে হচ্ছিল আমিই হুবহু সেই ছবি।

আমার কাহিনী!

সেই কাহিনীরই ভিতরের কাহিনী বলতে চাইছি আমি।

দুই মৃত বন্ধুর মতো সেই ছবি আর পাণ্ডুলিপি এখনো পড়ে রয়েছে মেঝেতে।

কেন আমি গল্পটা পড়লাম ওদের সকলের সামনে? আমার নিজের ব্যবহারেই অবাক হচ্ছিলাম।

অথচ, গল্পটা প্রকাশিত করার ইচ্ছেও ছিল। আসলে সেটা সাধারণ কোন কাহিনী ছিল না। অনেকেই বুঝতে পারেনি তার মর্ম। কেউ কেউ তো পড়ে চমকেও উঠেছে। লোকে বলে, নির্ঘাত পাগল লোকটা। সেই থেকে মনে হল এ-কাহিনীর এইখানেই পড়ে থাকা ভালো। লিখতে পেরেছি এই ঢের!

যদি প্রকাশিত না'ও হয় কারো কোন ক্ষতি হবে না। কোন সম্পাদকের ইচ্ছে হলে হয়তো আমার মৃত্যুর পরেও প্রকাশ করতে পারেন এটা। বিজ্ঞপ্তি হিসেবে সেখানে এই কথাগুলি লেখা থাকতে পারে— পরবর্তী সংখ্যায় থাকছে পদ্মনাভের এ-যাবৎ অপ্রকাশিত একটি গল্প।

বন্ধুই অসুবিধে করল, 'না, এই গল্পটি তোমার এতদিনের সাধনার পুরস্কার। তোমার আত্মার উজ্জ্বল প্রকাশ। বিকারময় জীবনের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ!'

হয়তো।

কারণ, এ আমারই রক্ত-মাংসের কাহিনী।

এ-ব্যাপারে সন্দেহের কারণ নেই কোন। আত্মাকে চারিদিক থেকে ঘিরে আছে রক্ত-মাংস।

বহুজনের সমাগম হয়েছিল সেই ছোট্ট ঘরে। তাদের কাউকেই আমি চিনি না। তবু তাদের পরিচয় আমাকে স্তম্ভিত করল— সমালোচক, কবি, নাট্যকার— এদের কেউই কি পড়েছে আমার গল্প?··· পদ্মনাভের লেখা··· না পড়েই কিছু লোকের ধারণা হয়েছিল সে একজন উঁচুদরের গল্পকার।

ব্যাপারটা ভালো লাগেনি আমার।

পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে পড়ার সময় হাত কাঁপতে লাগল। বুঁজে এলো গলা। ভয় পেয়েই যে এমন হয়েছিল তা নয়। কিন্তু, পরে যা ঘটল তা আরো অদ্ভুত। বাণী, বেদনা, বিষাদ আর নৈরাশ্য— মিলেমিশে একাকার সব শব্দ হৃদয়ের গভীর অন্তঃস্থল থেকে উঠে এলো ওপরে। আমার মনে সেই যুবতী ছাড়া তখন আর কেউই নেই। আমি তারই

দিকে তাকিয়ে আছি। শুধু তারই জন্যে···শুধু তারই জন্যে··· বলছিলাম আমি।

চোখে শোকের ছায়া নিয়ে সে ··পড়া শেষ হতে গভীর স্তব্ধতায় ছেয়ে গেল ঘর।

তারপর একে-একে সকলেই আমাকে তিরস্কার করতে শুরু করল।

···মনে হচ্ছে বাক্য-রচনার প্রতি ইনি পুরো মনোযোগ দেননি। এ-ছাড়াও, বিখ্যাত লেখকদের রচনায় যে-ধরনের একাগ্রতা লক্ষ্য করা যায়, এই কাহিনীতে তা অনুপস্থিত···

কিছুই বুঝতে পারছিলাম না আমি। একাগ্রতা? মানে কী?

একাগ্রতা— হিপোপটেমাস··· বর্ণনাভঙ্গিও অশ্লীল। স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে লিখতে বসলেই আজকের অনেক নবীন সাহিত্যিক···

···এই কাহিনীতে শুধুই পরস্পর-সংযোজিত ঘটনার ছবি ··

আমি তাকিয়ে থাকলাম ওদের পায়ের দিকে। আমার গল্প বুঝতে তোমাদের আরো একশো বছর লাগবে। আমি তো শুধু তোমাদের জন্যেই লিখি না। লিখি তোমাদের বংশধরদের জন্যেও। একশো বছর পরেও, নতুন যুগেও বেঁচে থাকব আমি। আমি মরব না। মানুষের··· এই গল্প একটি ফরাসী কাহিনীর অনুকরণে রচিত। এবং সেইসঙ্গে নির্লজ্জ··· পরের কথাগুলো আর কানে এলো না।

শোকে আচ্ছন্ন তার চোখ। আমি তারই কাহিনী লিখেছি। আমার নিজের কাহিনীই। সেটা ভালো বা মন্দ হতে পারে, কিন্তু আমার নিজের কাহিনী কীভাবে কোন ফরাসী গল্পের অনুকরণ হতে পারে?

আমার মাথা গরম হয়ে উঠল। ব্যাপক শূন্যতা ঘিরে ধরল আমাকে। কত সহজে বলা হল যে আমার গল্প একটি ফরাসী কাহিনীর অনুকরণ! ফরাসী কাহিনীর অনুকরণ! ফরাসী কাহিনীর ··

ভিড়ের রাস্তায় হাঁটতে শুরু করলাম। মানুষ আর যাত্রীর অনন্ত পারাপারের মধ্যে আমার অস্তিত্ব এখন এক বিন্দুর মতো। কোথায় যাচ্ছি, কোন্‌দিকে সে খেয়াল পর্যন্ত নেই।

বিচিত্র রূপ ধারণ ক'রে বিভিন্ন ছায়া নাচতে লাগল আমার সামনে। প্রদীপের শিখা দৌড়ে গেল আকাশ পর্যন্ত। চীৎকার করছে কুকুরগুলো। বহুদূর থেকে ভেসে আসছে একটা গম্ভীর আওয়াজ, যেন 'সাইরেন' বাজছে কোথাও— থেকে থেকেই সেই শব্দ ছুটে আসছিল আমার দিকে।

আমাকে চারিদিক থেকে ঘিরে চীৎকার করতে লাগল লোকে— 'ওকে তিরস্কার করো', 'ওকে তিরস্কার করো' ; তা সত্ত্বেও কোনরকমে মারিনা'য় এসে পৌঁছুলাম আমি।

'প্রণয়-মার্গ'-এর একটা পাথরের বেঞ্চিতে বসে সময় দেখলাম— দশটা বাজছে।

চাঁদ ক্রমশ উঠে যাচ্ছে ওপরে। আকাশের নীচে শুধু ফুল আর ফুলের সমারোহ। নির্জন সমুদ্রতীর আর আনন্দিত পুষ্পের গন্ধ নিয়ে বহে যাচ্ছে শান্ত ঢেউ।

"শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনী,
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনী।"

ইন্ দ্য ডেজার্ট মুন···

বাস এলো। ত্রাস-এ নেমে আমি যাব কেল্লার দিকে।

কণ্ডাকটর কি আমার জন্যেই বাসটিকে দাঁড় করালো? হয়তো। উঠে পড়ি। সরোর একটি গল্প আছে— একজন ট্রাম কণ্ডাকটর সরোকে বলে দিচ্ছে কীভাবে লিখতে হবে সে-গল্প। এই কণ্ডাকটরও কি সেইভাবে আমাকে কিছু বলবে? সে হাসছে। হয়তো বুঝতে পেরেছে আমার মনোভাব। ঠিক। তোমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করব না! তোমার সব লেখাই আমি পড়ি। ভাই, লিখে যাও!

কণ্ডাকটর, আমি কৃতজ্ঞ।

বাসে মাত্র দু'জন যাত্রী। একজন যুবতী এবং অন্যজন পুরুষ। পুরুষটি নিশ্চয়ই স্বামী। মেয়েটির গায়ে অর্গাণ্ডির সুন্দর ব্লাউজ। আমি ওর মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবু, অনুমানে বুঝলাম, সে সুন্দরী। গলার স্বরটিও মধুর। মৃদু স্বরে গান গাইছিল সে—

'দ্য হ্যাপি ডে'জ আর হিয়ার আগেন।
স্কাই-ক্লাউড্‌স্‌ আর ক্লিয়ার আগেন।'

হাওয়ায় উড়ন্ত চুল সামলাতে সামলাতে পুরুষটি ওর গা-ঘেঁষে বসল। মেয়েটি হাসল, এবং আবার গান ধরল—

দ্য হ্যাঁপি ডে'জ আর···

তার খুশীতে সমস্ত পৃথিবীই যেন অংশ নিচ্ছে।

লেভেল ক্রসিংয়ে বাস থেকে নেমে পরিপূর্ণ হৃদয়ে আমি কেল্লার দিকে রওনা হলাম।

রাতে যখন ঘরে ফিরলাম তখন সত্যিই অনেক দেরি হয়ে গেছে।

হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির জলকণা ভিতরে উড়ে এলে আমার মনে পড়ে তাকে। বৈদ্যুতিক ট্রেন শব্দ তুলে চলে গেলেও তাকে মনে পড়ে। .আমার শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যখন নারীর শরীর স্পর্শের জন্য লালায়িত হয়ে উঠেছিল, তখনই দেখা হয়েছিল তার

সঙ্গে। সেই সাক্ষাৎকার আমাকে দিয়েছে এক নতুন জীবন। সম্ভবত সব-কিছু বলার পরেও তার সম্পর্কে কিছুই বলিনি আমি। সম্ভবত তার সম্পর্কে কিছু না-বলাই ঠিক হবে।

সবই মনে পড়ছে একে-একে। তাকে প্রথম দেখেছিলাম ট্রেনের কামরায়। সে সুন্দরী ছিল না, কিন্তু, ছিল অন্য যুবতীদের থেকে স্বতন্ত্র। তার গভীর চোখে ছায়া ফেলেছিল বিষাদ।

আমি তার দুঃখের কারণ জানতে চাইনি। শেষ দেখলাম এগমুরে। ওভারব্রীজ থেকে নেমে আসছে সে, আর আমি ট্রেনে। ওপর দিকে তাকাতে ওর সুঠাম পায়ের গোছ চোখে পড়ল। হলুদ, সুন্দর!

ক্রমশ শান্ত হয়ে এলো হৃদয়। আর কখনো দেখিনি তাকে। অথচ দেখার ইচ্ছে ছিল। হয়তো যাবার সময় সেও খুঁজে গেছে আমাকে। পরিচিত স্টেশনে পৌঁছে উৎকণ্ঠ চোখে খুঁজেছিল আমাকে···

আমি অপরাধী। সেই গল্পের পাণ্ডুলিপি বুকে ধরে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে দেখলাম অক্ষরগুলো লাল হয়ে গেছে।

আমার রক্ত!

আমারই কাহিনী!

অন্ধকারের আত্মা

এম. টি. বাসুদেবন নায়ার

ভয়ে ভয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো সে। প্রথম ঘরটায় উঁকি দিল। অচ্যুতন নায়ার এখন গভীর ঘুমে। মুহূর্তের জন্যে শঙ্কিত হয়ে উঠল সে। শ্বাস নেবার সময় ওর গলগণ্ড দেখতে মজা লাগে খুব— যেন ভিতরে আঁটকে-থাকা একটা সুপারি নেমে যাচ্ছে। তার রোমশ হাত আর মোটা মোটা আঙুলগুলো দেখলে ঘৃণা হয়। রাগও হয়।

ওই হাত দিয়ে সন্ধেবেলায়···কাল, না কয়েকদিন আগে ?

ঘাড়টা ফেরাল বেলায়ুধন। সেখানে এখনো ব্যথা আছে।

কেউ বুঝতে পারবে না, একদিন ওই হাতটা আমি কেটে ফেলব। সে-জন্য আগে থেকেই একটা বড়ো দা হাতের নাগালে রাখা দরকার। যখন রোমশ হাতটা মেলে রেখে মাটিতে ঘুমোবে ও, ব্যস, ঠিক সেই সময় এককোপেই।

এটাই করা দরকার ওর সঙ্গে। না হ'লে এইভাবেই মানুষের ওপর অত্যাচার ক'রে যাবে ও।

কাল··· না কয়েকদিন আগে ?

পশ্চিমের বারান্দায় স্নান করানোর জন্যে বসানো হয়েছিল তাকে। কিছুদিন থেকে অচ্যুতন নায়ারই স্নান করাচ্ছে তাকে। এটা বেলায়ুধনের পছন্দ নয়। অন্য কেউ স্নান করিয়ে দেবে, সে কি শিশু ? এখন তা অনেক বড়ো হয়ে গেছে। অনেক— অনেক

বড়ো। গোপী বড়ো হবার পর করুত্তিপরম্ব নদীর ঘাটে স্নান করেছিল। মা'ই স্নান করিয়ে দিত। এখন সেও বড়ো হয়ে গেছে। বুড়ী দিদিমা বলে, 'কুড়ি-একুশ বছরের মদ্দা ছেলে - সুকৃতক্ষয়ম্···সুকৃতক্ষয়ম্।'

বেলায়ুধন বুঝতে পারে দিদিমা তার সম্পর্কেই বলছে। তবুও স্নান করানোর জন্যে অচ্যুতন নায়ারই ডাকে! তিনটি বড়ো বড়ো তামার গামলায় জল ভরে রাখে, সঙ্গে থাকে জল ঢালার জন্যে একটা ফুটো পিতলের ঘটি ··

জলভর্তি গামলার কাছে ওকে এনে বসানোর পর বেলায়ুধনের মাথায় একটা চিন্তার উদয় হল। পশ্চিমদিকের বারান্দার ধার ঘেঁষে একটা নদী বয়ে গেলে কেমন হ'ত? তার ওপর দিয়ে ভেসে যেত চাটাই-ঘেরা বড়ো বড়ো নৌকা আর ছোট ছোট মাছ ধরার নৌকা। তার ঘরের ছোট জানলা দিয়ে সব দেখা যেত। রুপালি মাছেরা লাফাতে চ'লে আসত এদিকে। ইচ্ছে হলে সে ছু-একটাকে ধরেও ফেলতে পারত।

দেয়ালের লাগোয়া কলের নীচে রাখা জলের বাসন তিনটে উল্টে দিল সে। মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেল জল। সেই দৃশ্য দেখছে, লঠাৎ অচ্যুতন নায়ার ডাকল, 'বেলায়ুধন—'

ডাকল না, চীৎকার ক'রে উঠল। ভয়ে ভয়ে ওর দিকে তাকাল বেলায়ুধন।

'বদমাইসি হচ্ছে?'

সে কিছুই বলল না। আগুনের মতো জ্বলছে ওর চোখ। বাসনের আড়ালে মুখ ঢাকবে এই ভেবে যেই গামলাটা উঠিয়েছে, অমনি থাপ্পড় পড়ল।

'মেরো না···আমাকে মেরো না ··' জোরে কেঁদে উঠল সে।

দিদিমা এসে দাঁড়াল দরজার কাছে। তার পিছনে বড়ো মা আর গোপী।

চোখের জল মুছতে মুছতে দিদিমা বলল, 'ভগবান ক্ষমা করবেন না। ওটার মাথা খারাপ, তাই না এমন করছে!'

'ছেলেটার কাণ্ড দেখেছ?' বড়ো কাকী গরগর ক'রে উঠল। মারল, ধাক্কাও দিল। এ-সবই বদমাইসি। চোখের জল মুছে ধরা গলায়. দিদিমা বলল, 'সুকৃতক্ষয়ম্···সুকৃতক্ষয়ম্···।'

ঘাড়ে হাত বোলাল বেলায়ুধন। ব্যথাটা রয়ে গেছে এখনো।

অয়প্পনের কাছে একটা ধারালো ছুরি আছে। সন্ধেবেলায় মজুরি নিতে যখন সে ধানের গুদামে যাবে, ছুরিটা সরিয়ে নেব।

শ্বাসনলী ওঠা-নামা করাতে করাতে অচ্যুতন নায়ার যখন ঘুমোবে, ঠিক সেই সময়ে একবার ··এককোপেই···

সকালে লোকে তামাশা দেখবে।

পাগলামি নয়, সবই বদমাইসি··· বলতে বলতে নায়ার যখন চ্যাঁচাবে আর মারতে উঠবে, তখনই খেয়াল হবে হাতটা নেই!

আর হাতের খোঁজে যখন সারা বাড়ি তোলপাড় করবে, হাসিতে লুটিয়ে পড়ব আমি।

বড়ো ঘরের পাশের ঘরটায় ঢুকল বেলায়ুধন। দেখল জানলার কাছে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে আছে দিদিমা। দিদিমার শরীর জুড়ে আঁকিবুকি। সেইজন্যে খুব ভালো লাগে না তাকে; কিন্তু দিদিমার ওপর তার রাগ নেই— দিদিমা কখনো মারে না, বকেও না। বাকি সবাই ওকে মেরেছে। গোপী আর কুট্টিশংকরণও। সে ছেলে। ছেলেরা বড়োদের গায়ে হাত তোলে না।

ভাগ্য ভালো, বড়ো মা এখন নীচে নেই। তার ঘর ওপরে। বড়ো মা, গোপী আর তার বাবা একবার খেয়েদেয়ে ওপরে উঠে গেলে সহজে নীচে নামে না।

দক্ষিণ দিকের ঘরটা অন্ধকার। দিনের বেলায়ও সেখানে অন্ধকার থাকে। মাঝের উঠোনের কিছু আলো সেখানে গিয়ে পড়ে। ঘরের কোণায় ধান ভর্তি বড়ো বড়ো ঝুড়ি আর জালা। ওর ভয় করছিল, ওই অন্ধকারে কোন শয়তান লুকিয়ে নেই তো! বোধহয় মামাই লুকিয়ে থাকে ওখানে। নারকোলের ঝাঁটাও আছে ওখানে। সেই দিয়ে মামা আমাকে মারে, ওই দিয়ে মারতেই ভালো লাগে মামার। কিন্তু ওখানে শয়তান থাকলে মামা কী ক'রে লুকিয়ে থাকবে?

উঠোনে পৌঁছেই মামাকে মনে পড়ল, কারণ নারকোলের ঝাঁটা দিয়ে মারার জন্যে মামা সব সময়েই তৈরি থাকে। একদিন মামাকেও মারতে হবে।

উঠোনে তাকে দেখতে পেলেই সারা-বাড়ি কাঁপানো গলায় চীৎকার ক'রে উঠবে, 'অচ্যুতন...'

অচ্যুতনের ছুটে আসতে দেরি হবে না। উঠোনে আসা তার পক্ষে নিষেধ। মোটা গোল-গোল আঙুলে ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে যাবে অচ্যুতন। আঙুলগুলো দেখলেই ঘৃণা হয় তার, স্পর্শেই মনে হয় ব্যাঙের গায়ে পা রেখেছে। উঠোনের মধ্যে অবশ্য মার খেতে হয় না। দিদিমার ঘরেও না। উত্তরের ঘর ছাড়িয়ে গেলেই শুরু হয় অচ্যুতনের রাজত্ব।...

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকাল। কেউ কোথাও নেই। মামা আর শঙ্করণ কুট্টি দেখে না ফেলে! দেখলেই চীৎকার ক'রে উঠবে, 'ও বাবা, ছাখো, দাদা কোথায় যাচ্ছে!'

মামী দেখলেও একই ফল হবে। মামী অবশ্য মামাকে ডাকবে না। নিজেই হাঁক দেবে, 'অচ্যুতন নায়ার, ছাখো, ছেলেটা বেরিয়ে এসেছে!' কখনো কখনো আমাকেও জিজ্ঞেস করে, 'কি রে, চললি কোথায়?'

ওর সাদা-সাদা ঠোঁটের দিকে তাকানো যায় না। বমি আসে। পাহাড়ের রাস্তা থেকে একটা বড়ো পাথর নিয়ে আসতে হবে। যেই অচ্যুতন নায়ারকে ডাকতে যাবে অমনি পাথরটা ভরে দিতে হবে মুখে।

কিন্তু, কুট্টি শঙ্করকে নিয়ে কী করা যায়?

ওর নোংরা মাথায় জাঁতা বসিয়ে কান ধরে হাঁটানো দরকার।

ক'দিন হলো উঠোনে আসা হয়নি। কড়া রোদে ঝাঁ ঝাঁ করে চোখ। রোদ কমলে মামা বেড়াতে আসে উঠোনে।

'ওনম' উৎসবের সময় গোবর-লেপা উঠোনে 'তৃক্কাকরপ্পন, দেবতার চারিদিকে চালের গুঁড়ো দিয়ে গণ্ডি কাটা হয়েছিল, এখনো দাগ আছে স্পষ্ট।

'তৃক্কাকরপ্পন' দেবতার পুজো দেখতে উঠোনে এলে তাকে গলা ধাক্কা দিয়েছিল অচ্যুতন নায়ার। মামা সেখানে তাবৎ বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে আলাপ করছিল। মান্যিগন্যি লোকেরা যাতে তাকে দেখতে না পায়, সেইজন্যেই মেরে হটিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেখান থেকে।

উঠোন থেকে রঙিন কাগজের টুকরো বেছে সাজিয়ে রাখা হয়েছে গোলাঘরের দেয়ালের পাশে। জল তোলার বাল্তিটাও সেখানে, ডুবিয়ে দেবে নাকি! আম গাছের ছায়ার নীচে সুখে জাবর কাটছে বড়ো মা'র আদরের বাছুরটি।

ঠাণ্ডা ছায়ায় দাঁড়িয়ে বেলায়ুধনের প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

এখন আর কি ভাবা যায়?

অচ্যুত নায়ার ঘুমোচ্ছে— এখন যেদিকে খুশী চ'লে যাওয়া যায় দিব্যি। মামা এখন ধানের গোলায়। উপযুক্ত সময় বটে!

দক্ষিণের দরজা দিয়ে বাইরে বেরুলে ব্রাহ্মণদের ঘর। সেদিকে যেতে ভয় করে। ব্রাহ্মণদের ঘরের উঁচু জায়গায় 'পুল্লানী' গাছের আড়ালে জুয়ো খেলা হচ্ছে, মাথার চুল চুলকোতে চুলকোতে তাই দেখছে চুড়েল।

ভগবান! প্রার্থনা করি— কেউ যেন চুড়েলের দেখা না পায়। বাচ্চাদের রক্ত চুষে নিয়ে দেহটা কুঁয়োয় ফেলে দেওয়াই চুড়েলের কাজ। বড়োদেরও জ্বালায়। সেও বড়ো হয়ে গেছে এখন। দরজা দিয়ে ঢুকবার সময় মাথা নীচু করতে হয়। গোঁফের রেখাও ফুটে উঠেছে, এত বড়ো। মুখের ওপর হাত বোলাল সে। কর্কশ লাগল একটু।

বড়ো হয়ে গেছে, তবু চুড়েল যদি সামনে এসে পড়ে কী করবে? হাওয়ার চেয়েও দ্রুত দৌড়য় সে। হে ভগবান, আমি ওকে দেখিনি— জপতে লাগল মনে মনে।

আচ্ছা, এই একা থাকতে থাকতেই যদি এসে পড়ে? একটা কলার খোল হাতে নিয়ে বাঁচাব নিজেকে। ঝাড়ের চোটেই পালাবে ও। বুদ্ধিটা যেন কে দিয়েছিল!

মনে পড়েছে, বৌঠান বলেছিল, সেও বেশ কয়েক বছর আগে। কিন্তু এখনো মনে আছে ওর। তখন সে রেশমের জাঙিয়া পরত, মাটি খুঁড়ত নদীর চড়ায়।

দেবকী বৌঠান, না মা? এখন আর কোথায় মা? তাল

গাছের সারির পিছনে আগাছার জঙ্গলে মাটির নীচে শুয়ে আছে —মা, আমার মা। কানকাটা মীণাক্ষিদিদি আর মা 'নটপ্প্রা'য় বসেই বলেছিল বোধহয়?

ঐ যে, বোধহয় অম্মুকুট্টি। ঠিক এই সময়ে একটা কাক উড়ে এসে বসল বাছুরের পিঠে। কাকটা ধূর্ত। তার একটা চোখ অন্ধ। বেলায়ুধন সব জানে। ছোটবেলায় পড়েছিল 'কাক কালো কোকিল কালো', এ-সবও মনে আছে। আরো অনেক অনেক কথা মনে আছে, তবু সে কিছু করলে বা বললেই লোকে বলে—মাথা খারাপ। বলে 'পূর্বজন্মের ফল'। মা মরে গিয়ে ভালোই হয়েছে। এ-সব দুর্গতি দেখতে হ'ল না তাঁকে।

এ-সব লোক পছন্দ করে না তাকে। ঘৃণা করে। বেলায়ুধন জানে সবই। তখন, কাকটা যখন ঠোঁট দিয়ে বাছুরের পিঠ ঠোকরাচ্ছে, খুব দূর থেকে কে যেন ডাকল—

'ও বড়দা—'

প্রথমে তো ঘাবড়ে গিয়েছিল খুব। হয়তো বা চুড়েলই হবে। কিন্তু, চুড়েল কারো নাম ধরে ডাকে না। সেও তেমনি বোকা!

পিছনে তাকিয়ে দেখল খোলা দরজায় অম্মুকুট্টি দাঁড়িয়ে। খিক-খিক করে হাসল বেলায়ুধন।

হাতে মেহেদী লাগিয়েছে অম্মুকুট্টি। কমলা রঙের রেশমী শাড়ির ওপর ঢাল নেমেছে লম্বা চুলের। আবার ডাকল—

'ও বড়দা।'

বেলায়ুধন কোন উত্তর দিতে পারল না। ওর লাল্‌চে গাল থেকে চোখও সরাতে পারছিল না।

'কী দেখছ বড়দা?'

'হুঁ…হুঁ।'

'বড়দা, বাইরে ঘুরো না।'

আস্তে আস্তে ওপরে তাকাল সে। রেশমী কাপড়ের নীচে দেখা যাচ্ছে অম্মুকুট্টির পেট। একটু লজ্জা লাগল ওর। অম্মুকুট্টির সঙ্গে কথা বলবার সময় কিছুক্ষণের জন্যে অচ্যুতন নায়ারের কথা ভুলে গেল সে।

জানলার শিক ধরে ওর হাতের সুডৌল আঙুলগুলো ছুঁতে ইচ্ছে করছিল।

'ঠোঁট কাটল কি ক'রে?'

সে-কথার উত্তর দিল না কোন।

পাকা কলার মতো সুডৌল অম্মুকুট্টির হাতের আঙলগুলি।

'কি, কাল বুঝি মার খেয়েছ?'

সে চুপ ক'রে থাকল।

'ভাবছ কী?'

মন দিয়ে কিছু শোনার মতো ক'রে মাথা নামিয়ে আনল অম্মুকুট্টি।

'মামা আসছে।'

বেলায়ুধন তখনও ভাবছিল, একবার ছোঁবো ওকে?…শুধু একবার… ?

'বড়দা, তোমার অসুখ সেরে যাবে।'

'হুঁ।'

'অচ্যুতন নায়ারের কথা শুনে চো'লো।'

'হুঁ।'

'পরশু রাত্রে কাঁদছিলে কেন?'

'হুঁ…হুঁ…'

জানলায় দাঁড়িয়ে অম্মুকুট্টি। হাতটা বের করতে বিভ্রম লাগছিল। অম্মুকুট্টি পিঠের ওপর কাপড় টানল। তারপর হাত রাখল জানলায়। কিছুটা আশ্বস্ত হ'ল বেলায়ুধন।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'একবার হাতটা ছোঁব?' ·

কথা শুনে হেসে ফেলল অম্মুকুট্টি। তার কথায় গোপী আর শঙ্করণ কুট্টি ঠাট্টার ছলে যেভাবে হাসে, অম্মুকুট্টির হাসি ঠিক তেমনি নয়। ওর হাসি দেখে গ্লানি ছড়িয়ে গেল মনে।

শান্ত হাতে আঙুলগুলো ছুঁল সে। কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে থাকল অম্মুকুট্টি।

'বড়দাদা, এবার যাও; না হ'লে অচ্যুতন নায়ার এসে পড়বে ··,' বলল অম্মুকুট্টি। কিন্তু নিজের জায়গা থেকে নড়ল না।

আবার বলল, 'যাও না তাড়াতাড়ি ··'

বেশ গম্ভীর তার গলার স্বর।

বেলায়ুধন নড়ল না তবু। গোলার সিঁড়ি ধরে চ'লে যাচ্ছে অম্মুকুট্টি, একভাবে তাকিয়ে থাকল সেদিকে।

পশ্চিমের সিঁড়ি ধরে গুনগুন করতে করতে চ'লে যাচ্ছিল অম্মুকুট্টি। হল্‌দে রঙয়ের ব্লাউজের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে দীর্ঘ ঘন চুলের রাশি, পাকা আমের মতো গাল··· আহ্! কত সুন্দর দেখতে অম্মুকুট্টি!

পরনের ঢিলা কাপড়টার জন্যে এখন গ্লানি হ'ল বেলায়ুধনের। কাদায় লেপ্‌টে নোংরা হয়ে গেছে। সারা শরীরে লেগে আছে মাটি। মুখমণ্ডল রোমে ভর্তি। এরপর গোবিন্দ নাপিত এলে ব্যাপারটা বলতে হবে তাকে।

অথচ, কী পরিষ্কার শরীর অম্মুকুট্টির, একটুকু নোংরা লেগে

নেই কোথাও। কালো পাড়ের যে-ধুতিটা পরেছিল সেটাও কত পরিষ্কার ছিল। যখন সে জানলায় দাঁড়িয়েছিল, মনে হচ্ছিল সেখানকার হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে চামেলী আর কেতকী ফুলের গন্ধ। বেলায়ুধন নিজের হাতের ঘ্রাণ নিল। হায়··· হায় ·· হাত জুড়ে যেন মুর্গীর বিষ্ঠার গন্ধ। বমি উঠে আসে।

অম্মুকুট্টির হাত ছোঁবার পর তার আঙুলেও বোধহয় ওর হাতের গন্ধ লেগে গেছে। সম্ভবত সেইজন্যেই বিরক্ত হয়ে চ'লে গেল ও।

মামী যদি জানতে পারে যে আমি স্পর্শ করেছি ওকে, তাহলে জানি না কত লোকের মার খেতে হবে!

যাক, মাথা ফেটে যাক সকলের। মামা, অচ্যুতন নায়ার, মামী, বড়ো মা— সকলের। শঙ্করণ কুট্টিরও! খুব মজা করে তাকে নিয়ে, এমন-কি অন্য কোন ছেলের সঙ্গে দেখা হলেও তাকে ডেকে বলবে, 'ছাখো, বেলায়ুধনের পাগলামি ছাখো!'

তারও মাথা ফাটুক।

অম্মুকুট্টি মজা পাবার জন্যে হাসে না। দুঃখও দেয় না। মা ভগবতী ওর মঙ্গল করুন।

ছোট রাস্তার দু'ধারে বাঁশের ঝাড়। নীচে সাপের বিল। লতাগুলো একটার সঙ্গে অন্যটা এমনভাবে জড়িয়ে আছে, যেন সাপ। দিনের বেলায় ওখানে কোন ভয় নেই, কিন্তু রাতে ওখানে শয়তান নেচে বেড়ায়।

টিলার শেষে নীচে তরাইয়ে গিয়ে রাস্তার শেষ। ওখানে আম গাছের নীচে হরিজন মেয়েরা জল ভরছে।

'ছোট কর্তা, যাচ্ছেন কোথায়?'

সে কোন উত্তর দিল না। জেনে কী হবে ওদের! গিয়ে

হয়তো চুকলি কাটবে মামার কাছে। কিংবা, হয়তো অচ্যুতন নায়ারকেই ডেকে আনবে!

রাস্তার ধারে লাল মাটির গর্তে জোরে পাথর ছুঁড়েছে কেউ। আস্তে আস্তে টিলাটা পার হল সে।

জল ভরতে-আসা হরিজন বধূ তার বাছার মাথায় তেল মাখাতে মাখাতে সখীকে বলল, 'ওকে এভাবে বাইরে ছেড়ে দেওয়া হয় কেন! যারা দেখা-শোনা করে তারা বোধহয় এখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে!'

ওদের কথায় কান দিল না বেলায়ুধন। পিছনে না তাকিয়েই চড়াই ভাঙতে লাগল ও। তরাই জুড়ে নানারকমের শুকনো আগাছা। টিলার মাঝখানে একটা চওড়া পাথর। অনেকগুলো তাল পড়ে আছে ওখানে, তুলে নিলে হয়। আসলে ওগুলো নেবার জন্যেই বেলায়ুধন টিলায় উঠেছিল। পাথরটার ওপর দাঁড়িয়ে বেশ লাগে নীচের দিকে তাকিয়ে থাকতে। চারিদিকে বাড়ি, মন্দিরের মাথার কলস আর, অন্যদিকে সুপারি-বাগান। সবই কেমন মোহময়।

আরো দূর পুবদিকে ছড়িয়ে আছে শুষ্ক ক্ষেত। অন্যদিকে লাল মাটির রাস্তার পিছনে নদী।

বালিতে মেশা মাটির দিকে তাকিয়ে বেলায়ুধনের মনে এক অব্যক্ত স্মৃতির সঞ্চার হ'ল।··· গরুকে স্নান করাতে নিয়ে যাচ্ছে হরিজন ছেলে, সবুজ কাঁকুড়ের ক্ষেত, নারকোলের সাদা পাতায় জল সওয়া, কেউ বা যাচ্ছে মাছ ধরতে···

মা বলেছিল— জলে নামিস না। ওখানে কুমীর আছে।

মা এও বলেছিল যে সে এক ভয়ংকর জন্তু। জলে নামলেই কামড়ে ধরে।

এখন ওই জায়গাটাতেই ইচ্ছে করছে খেলতে। অচ্যুতন নায়ার, মামা বা অন্য কেউই ওকে সেখানে খেলার অনুমতি দেবে না।

দিদিমা অবশ্য কখনো সখনো অনুমতি দিয়ে ফেলে। তার পরেই বলে, 'তোর অসুখটা আগে সেরে যাক বেলায়ুধন···

সব সময়ে ওই একই কথা— রোগটা আগে সারুক।

তোমরাই অসুস্থ! না না, আমার পক্ষে এ-কথা বলা ঠিক নয়।

লাঠি মেরে এদের মেরে ফেলা উচিত। সকলে মরুক একসঙ্গে। না না, সকলে নয়— অম্মুকুট্টি যেন বেঁচে থাকে। সকলে মরে যাবার পর বেঁচে থাকব শুধু আমরা দু'জনে। কিন্তু একা-একা থাকা যাবে কী ক'রে! শয়তান তো সব জায়গাতেই আছে— উঠোনে, ঘরে, গোলায়— কোথায় নেই! দিদিমাও জানে এ-কথা। আমাদের পুরানো মামাও একটা শয়তান।

নিজের বউয়ের হাতে রাঁধা মুর্গীর মাংস খেয়েছিল চাতুমামা একদিন রাতে, তারপর তেষ্টায় ছটফট করতে করতে মরে গেল। বিষ মেশানো হয়েছিল মাংসে। অনেক চেঁচিয়েছিল, কিন্তু কেউই সে-চীৎকার শোনেনি। অন্ধকার রাতে এখনো নাকি শোনা যায় তার তৃষ্ণার জন্যে হাহাকার। সারা রাত বিছানায় শুয়ে সেই চীৎকার শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে থাকে বেলায়ুধন।

সকলে পুড়ে গেলে মোহর ভর্তি ঘড়া পাওয়া যাবে গোলায়। যদি সোনা পাওয়া যায় তাহলে ছোট টিলার ওপর তৈরি কুঁড়ে ঘরটার জায়গায় একটা বিরাট বাড়ি বানানো যাবে। দেখতে হবে প্রাসাদের মতো। ফুলে ফুলে সাজানো থাকবে সেই বাড়ির জানলাগুলো, নানারকম ছবি থাকবে দেয়ালে। বাসন-কোসন সবই হবে সোনার। খুব উঁচু হবে সেই বাড়ি, একেবারে আকাশ-ছোঁয়া

সবই পুড়ে যাবে একদিন। লাল লাল জিব বের করে সকলকে গিলে ফেলবে আগুন। শুধু আমিই তখন সোনার মোহরে ভর্তি ঘড়া নিয়ে পালিয়ে যাব ওই টিলার দিকে। সোনার জরিপাড় কাপড় পরে যাব রাজপুত্রের মতো। অবাক হয়ে যাবে অম্মুকুট্টি।

আজই আগুন লাগিয়ে দেব নাকি? সবচেয়ে আগে লাগাতে হবে গোলায়। পুড়তে হলে সবচেয়ে আগে মামাই পুড়ে যাক। অচ্যুতন নায়ারকে তো মামাই রেখেছে। 'এক পাও যদি বাইরে বেরিয়েছ, পা কেটে নেব তাহলে।'—বলেছিল মামা। শঙ্করকুট্টির পিঠে হাত রাখার জন্যে খুব মেরেছিল মামা। অচ্যুতন নায়ারের হাতে ছিল বড়ো বড়ো নারকোলের কঞ্চি।

তামার ঘড়াটা সারা রাত খুঁজে বেড়াবে মামা। কিন্তু, পাবে না কিছুতেই। তাস মামা কোথায় যে রেখে গেছে ঘড়াটা কেউই জানে না। হয়তো তাস মামা নিজেও জানত না।

অনেক পুরনো কথা। দিদিমাই গল্প করেছিল তার কাছে। দিদিমারও দিদিমার ছোটবেলার গল্প। তাস মামা ব্যবসা করে প্রচুর সম্পত্তি করেছিল। তখন সোনার মোহর চালু ছিল।

ঘড়ায় মোহর ভরে পুঁতে রেখেছিল তাস মামা। ঘড়া যে কোথায়— কারুরই তা মনে নেই। খুঁজতে খুঁজতেই মৃত্যু হয়েছিল তার।

এখনো রাতের বেলায় শোনা যায় মাটি খুঁড়ে ঘড়া খোঁজার আওয়াজ। সেই আওয়াজ শোনার জন্যে কান খাড়া ক'রে রাখে বেলায়ুধন। ভয় লাগে সন্ধেবেলায় গোলার দিকে তাকাতে। ঘড়া খোঁজার জন্যে নিশ্চয় সেখানে আসে তাস মামা।

বেচারা তাস মামা, পাগল হয়ে ভুলে গিয়েছিল সব কথা।

বেলায়ুধনের অবশ্য সব কথাই মনে আছে। মামারও আছে। মনে আছে অম্মুকুট্টির সঙ্গে স্কুলে যাওয়া। পাগ্‌লা কুকুর মেরে ফেলার কথাও মনে আছে। রক্ত ছড়িয়ে পড়েছিল উঠোনে। বেচারা কুকুরটা! পাগল কুকুরকে পিটিয়েই মারতে হয়। ভীমরুলের চাক ভেঙে গোটা মাঠ ছেয়ে গিয়েছিল উড়ন্ত ভীমরুলে। বিষম ভয় পেয়েছিল সে। নিজেকে লুকিয়েছিল পাকা ধানের ক্ষেতে। অম্মুকুট্টিও সঙ্গে ছিল সেদিন। ছিল আর একটি ছোট্ট মেয়েও, কিন্তু সে তেমন সুন্দর ছিল না দেখতে।

যেখানে যা ঘটেছে, সবই মনে আছে তার। সে পাগল হবে কী ক'রে, না সে পাগল নয়।

তবুও গোপী, শঙ্করণ কুট্টি আর প্রতিবেশিনী মালু বলবে, 'ওটা একটা পাগল।'

মারতে হয় ওদের মা-বাবাকে। মিথ্যে কথা বলে লোকেদের উস্‌কানি দেয়। এদের সবাইকেই মারা দরকার। একটা ধারালো ছুরি চাই।

আগাছার জঙ্গল থেকে মাথা তুলে ম্যা ম্যা ক'রে উঠল একটা কালো ছাগল। ছাগলই তো? বেলায়ধুন থম্‌কে দাঁড়াল। ভালোভাবে লক্ষ্য করতেই হারিয়ে গেল ছাগলটা। হয়তো চুড়েলই এসেছিল ছাগলের রূপ ধরে। ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাল ও। রৌদ্রকিরণের মধ্যেও কোথাও কোথাও এক-আধ টুকরো মেঘ জড়ো হচ্ছে। পাশের কালো পাথরটার ছায়া হেলে পড়েছে। রোদ পড়ে যাচ্ছে, এবার আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়বে অন্ধকার। অন্ধকারেই থাকে আগুনখেকো শয়তান। হাত-পা সিঁটিয়ে চোখ বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। আর তখনই অন্ধকারে শুনতে

পেল সেই ডাক—'বেলায়ুধন!' একটা কর্কশ হাত এসে পড়ল ওর কাঁধে।

'মেরো না···আমাকে মেরো না···'

'বেলায়ুধন!'

'আমাকে মেরো না · মেরো না আমাকে···'

অন্ধকারে চোখ বন্ধ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে দৌড় দিল সে।···

'আমাকে মেরো না···আমাকে মেরো না···

2

অন্ধকারটা যখন সরে গেল চোখ থেকে তখন বাইরে কলা গাছের ঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে কিছু আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

ঘরের ভিতরটা অন্ধকার। মাদুর পেতে বসল আরাম ক'রে। মাথাটা ব্যথা-ব্যথা করছিল, ঠেস দিয়ে বসল দেয়ালে। চারিদিক স্তব্ধ। বাইরে যেটুকু আলো আছে তার মধ্যে ক্রমশ দুলে উঠছে মলিন ছায়া, কিন্তু ঘরের ভিতর থাকায় এখন আর ভয় নেই কোন।

ঝোঁপে গাছের ফাঁক দিয়ে অল্প আকাশ চোখে পড়ছিল: তারার মালায় ছেয়ে যাচ্ছে আকাশ। দেখতে দেখতে কালো হয়ে গেল তারাগুলো। তারাও কি কালো হয়ে যায়?

হাঁটুতে মাথা পেতে বসল ও। চোখ বন্ধ করলেই একে-একে ভেসে উঠবে কালো আর লাল অসংখ্য গোলা।···

আলোর অপেক্ষায় এখন সে বসে আছে ঘরে।···

আবার ভোর হলে কলা গাছের ঝাড় থেকে সরে যাবে অন্ধকার।

অচ্যুতন নায়ারকে দেখেই শিউরে উঠল। এখন দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ।

আগে তো হ'ত না এমন!

'দরজা খোলো!' জোরে চেঁচাল সে।

কেউ উত্তর দিল না।

সে আবার চীৎকার ক'রে উঠল, 'দরজাটা খুলে দাও!' এবারও সাড়া দিল না কেউ। অবশেষে জোরে দরজায় লাথি মারল সে।

দরজাটা ভেঙে পড়ে গেল নীচে।

বাইরে অচ্যুতন নায়ার আর মামা দাঁড়িয়ে। দু'জনকে একসঙ্গে দেখে ভয় পেল সে। একজন চেপে ধরল তাকে, আর অন্যজন শুরু করল মারতে। এরা যে কী চায়!

এখন বেলায়ুধনের কাছে একটা দা আছে। এক কোপেই মাথাটা নামানো যায় দু'জনের। আপাতত ওরা মাথা আড়াল ক'রে রেখেছে। মামা আর অচ্যুতন নায়ার যখন ছুরিটা চাইতে আসবে, আমি দেব না।

মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকল ও।

মামা বলল, 'মেরে ফেলব একেবারে।'

বুকের রোম চুলকে অচ্যুতন নায়ার বলল, 'ফের বদমাইসি! হাড় গুঁড়িয়ে দেব একেবারে, মনে থাকে যেন। একবার বাইরে বেরিয়ে ছাখ কী হাল করি তোর...'

'একেবারে চুপচাপ থাকবি।' মামা বলল, 'টুঁ শব্দটি করলেই পুলিসে দিয়ে দেব!'

তখন মনে মনে ভাবল বেলায়ুধন, পুলিসেরও মাথা কেটে ফেলা দরকার।

দা হাতে এলেই সে এ-সব ক'রে দেখিয়ে দেবে। মনে মনেই গজগজ করতে লাগল সে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে মামা

অচ্যুতন নায়ারকে বলল, 'এখন তো রাজ্যের লোককে জ্বালিয়ে মারছে!'

'সব বদমাইসি।' বড়ো বড়ো চোখ ক'রে বেলায়ুধনকে দেখতে দেখতে বলল অচ্যুতন নায়ার।

'আবার বদমাইসি করলে মাথা ভেঙে দেব।' বলল মামা, 'একে বন্ধ ক'রে রাখাই ভালো।'

আবার দরজা বন্ধ ক'রে ফিরে গেল অচ্যুতন নায়ার।

দরজা বন্ধই থাকবে। সকালে আর সন্ধ্যায় কিছুক্ষণের জন্যে বেড়াতে নিয়ে যাবে অচ্যুতন নায়ার। বেলায়ুধনের কাঁধে হাত রেখে হাঁটে সে। ব্যাপারটা আদৌ পছন্দ নয় বেলায়ুধনের।

ঘরে আসে একমাত্র সেই। কখনো কখনো দরজার পাশে দিদিমার গলা শোনা যায়—'সুকৃতক্ষয়ম্··· সুকৃতক্ষয়ম্···'

দিনের বেলায় পশ্চিমের জানলায় ব'সে থাকতে ভালো লাগে বেলায়ুধনের। ওখানে বসলে দিব্যি পেঁপে গাছ, কলার বাগান আর ছাগলের খোঁয়াড় দেখা যায়। পেঁপে গাছের ছায়ায় প্রতিবেশীর ছেলের সঙ্গে খেলা করে গোপীশঙ্কর। কখনো বা তারা জানলা-পর্যন্ত এসে মুখ ভেংচে পালিয়ে যায়।

শঙ্কর কুট্টি একদিন ইঁট ছুঁড়েছিল পিঠে। পরের দিন বেলায়ুধনও প্রতিশোধ নিয়েছিল।

বাইরে কোথাও কাঁসার বাসন গড়িয়ে পড়ল শান-বাঁধানো জমিতে। শব্দটা বেশ লাগল। তারপর এলো শিশুর কান্নার শব্দ। খানিক বাদে দরজা খুলে ঢুকল অচ্যুতন নায়ার। বলল, 'বাচ্চাদের ভয় দেখালে তোর হাড়মাস আলাদা ক'রে ছাড়ব।'

বেলায়ুধন' ভাবল, 'যদি একটা লম্বা ছুরি হাতে পেয়ে যায়···'

'বদমাইসি করবি আর? পুলিসে যাবার ইচ্ছে হয়েছে বুঝি?'

'আমি অচ্যুতন নায়ারের মাথা কেটে ফেলব।'

'আরে!' অবাক হয়ে বলল অচ্যুতন নায়ার, 'কী বললি তুই?'

সে আবার বিড়বিড় করল, 'মাথা কেটে ফেলব।'

মারার জন্যে হাত তুলল অচ্যুতন নায়ার ·· সঙ্গে সঙ্গে কাঁদতে শুরু করল সে, 'মেরো না ·· আমাকে মেরো না···'

'বলেছিলাম না চুপ ক'রে থাকতে!'

'মেরো না··· আমাকে মেরো না···'

বাইরে থেকে দিদিমার গলাও শোনা গেল, 'সুকৃতক্ষয়ম্·· সুকৃতক্ষয়ম্··· ।'

অচ্যুতন নায়ার চ'লে যেতে আবার সে জানলায় গিয়ে বসল।

বাইরে গাছের পাতার আড়ালে মনে হল, কালো কালো ছায়া চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। অন্ধকার হয়ে এলেই বড়ো ভয় করে।

অন্ধকারে যদি জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ে? আগুনখেকো শয়তান বা এলো চুলে চুড়েল··· তাহ'লে···

রাত আর অন্ধকার এতটুকু ভালো লাগে না ওর। সারা রাত দেয়ালে পিঠ দিয়ে বাইরে চোখ মেলে বসে থাকে। কুড়ালটা পড়ে যাবার আওয়াজই কি শোনা গেল? নাকি দরজার ওপাশ থেকে বোধহয় কেউ জল চাইছে।

ধুলো-লাগা নোংরা বুকের ওপর গড়িয়ে পড়ে চোখের জল···। বড়ো যন্ত্রণা। বাইরের জগতের কিছুই দেখতে পায় না আর। রোদ কমে আসছে, ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে অন্ধকার।···

এ-রকম অন্ধকারেই জেগে ওঠে আগুনখেকো শয়তান···

দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকল সে। পিছন ফিরে

তাকালেই ভয় ছেঁকে ধরে। জানলার বাইরে যেন ঘোরাফেরা করছে কেউ।

মাথা ঘুরিয়ে একবার দেখল সে। ভয় পেল। চুল এলোমেলো। মুখে কি, আগুন? ছম-ছম আওয়াজ হচ্ছে, পায়ে কি ঘুঙুর পরা…,

'বড়ো দাদা…' মৃদু একটা গলা শুনতে পেল।

ভয়ে মেঝেয় মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ল সে।

'বড়ো দাদা। আমি গো, আমি!'

ভয় ও যন্ত্রণা থেকে মুখ তুলে সে বলল, 'মেরো না আমাকে… মেরো না…'

তারপর জানলার মুখটা ঢেকে দিল চাটাই দিয়ে।

চাটাইয়ের ফুটো দিয়ে আলো ঢুকে আরো অন্ধকার ক'রে তুলল ঘরটাকে।

বেশ কয়েকদিন যাবার পর ঘরে অন্ধকারের ভয় ঘুচল তার। চার কোণে জমে থাকা আঁধারপুঞ্জ সঙ্গী হয়ে গেল। অন্ধকার তার কানে কানে কথা বলে। তারও কিছু বলার আছে; তাস মামা একুদা যে সোনার ঘড়াটা পুঁতে রেখেছিল, আনতে যেতে হবে সেটা… টিলার ওপর প্রাসাদ বানানোর কাজও আছে। সেই প্রাসাদের সাত মহলায় ব'সে নদী আর নৌকা দেখব!…

নারকোল পাতার ভিতর থেকে উঁকি মারে জোড়া চোখ। বাইরে কেউ যেন ডাকছে। কয়েকটি কণ্ঠস্বরও শোনা যায়।

'সবই বীরান কুট্টির ভাগ্য…'

'এ-সব দুঃখকষ্ট না দেখেই চলে গেছেন মহিলা। ভালোই হয়েছে।'

সারাদিন দেয়াল জুড়ে মোহর-ছাপের মতো আলোর খেলা

দেখে। ওপরে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা বন্ধুদের সঙ্গে অনেক অনেক কথা বলে।

…একবার থালায় ক'রে ভাত নিয়ে এলো অচ্যুতন নায়ার। দরজা খুলতেই সে লাফিয়ে পড়ল নায়ারের সামনে। থালাটা বাইরে রেখে, আবার দরজা বন্ধ ক'রে চ'লে গেল অচ্যুতন নায়ার। আবার ফিরল একটা ছড়ি হাতে নিয়ে।

'আর করবি এ-রকম?' জিজ্ঞেস করল। তখনই ছড়িটা চোখে পড়ল বেলায়ুধনের।

'কতবার বলেছি পায়খানা পেলে আমাকে ডাকবে!'

ছড়ির প্রথম ঘা-টা পড়ল কাঁধের ওপর। অন্যদিন কেঁদে ওঠে, আজ বেলায়ুধন কাঁদল না। রাগে ওর মন আর চোখ জ্বলতে লাগল।

'বাব্বা, তাকাচ্ছে যেন ভস্ম ক'রে দেবে!'

আবার মার পড়তে লাগল।

'আর কখনো করবি? তোর সব পাগলামি ঘুচিয়ে দেব আমি।' মারতে মারতে বলছিল নায়ার।

'কী, করবি আর?'

চীৎকার শুনে ছুটে এলো দিদিমা আর বড়ো মা।

কাঁপা গলায় দিদিমা বলল, 'অচ্যুতন, মেরো না ওকে। ভগবান তোমাকে ক্ষমা করবে না।'

'ওর সব বুজরুকি, কালো মা!'

দিদিমা তার 'সুকৃতক্ষয়ম্' বুলির পুনরাবৃত্তি করল।

'ওর সবচেয়ে বড়ো ওষুধই হ'ল মার…'

ততক্ষণে মামাও এসে পড়েছে। দরজা পর্যন্ত এসেই হাতে

নাক চাপা দিল মামা। স্পষ্ট গলায় অচ্যুতন নায়ার বলল, সকাল সন্ধে দু'বেলায়ই বেলায়ুধনকে বাইরে নিয়ে যায় সে, তবু ঘর নোংরা করবে কেন।…

'ঘরটা বন্ধ ক'রে রাখতে পারোনি?'

'কী বলব?'

'এমন করলে তো ঘরেও রাখা যাবে না। এই নোংরা ঘরে কেউ কিছু খেতে পারে?'

মামা বলল, 'উত্তরের ছোট ঘরটায় রাখলে কেমন হয়?'

'সে-ঘরটায় দরজা নেই, আর, ওখানেও যদি হেগেমুতে রাখে? ঘরটা তো আবার রান্নাঘরের পাশে?'

অচ্যুতন নায়ার বিষ ঢালতে লাগল মামার কানে।

পিচুটি-ভেজা চোখ পিটপিট করতে করতে দিদিমাও শুনল সে-সব কথা। চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'সুকৃতক্ষয়ম্…সুকৃতক্ষয়ম্…', বলল, 'এ-সব দেখার জন্যেই কি এখনো বেঁচে আছি!'

কেউ কান দিল না দিদিমার কথায়। কাঁপতে কাঁপতে, আস্তে আস্তে সেখান থেকে চ'লে গেল দিদিমা।

সেদিন আর ভাত খেল না বেলায়ুধন। মামা আর অচ্যুতন নায়ারের সব কথাই শুনেছিল সে। ওরা নিশ্চিত মারবে তাকে। নিশ্চয় বিষ মিশিয়ে দিয়েছে ভাতে। তাস মামাকেও তো মুর্গীর মাংসে বিষ মিশিয়ে খাওয়ানো হয়েছিল?

যন্ত্রণায় কাঁপছিল গোটা শরীর।

লোহার থালাসুদ্ধ ভাতটা ছুঁড়ে ফেলল মেঝেয়। আরে… দেখল, সারা মেঝে নোংরা হয়ে আছে।… এটা আবার হ'ল কখন? তারই কীর্তি নাকি।

পাতায় আড়াল করা জানলা দিয়ে হাঁকল,··· একটা ছুরি চাই ···জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে নজর রাখছে অচ্যুতন নায়ার। মারধোর করার জন্যে ছল খুঁজছে···

নারকোল পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে দু'টি চোখ।

দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ভয়ার্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল সে, 'আর করব না···আর কক্ষণো এমন করব না···আমাকে মেরো না···।'

'বড়ো দাদা···।' বাইরে থেকে কে যেন ডাকল সরল গলায়!

'কে?'

'আমি, বড়ো দাদা···অম্মুকুট্টি···'

'অম্মুকুট্টি···অ ··অ···অ···', খুব মজা পেল সে।

'বড়ো দাদা···'

কান্নার শব্দ। খানিক সেই শব্দ অনুকরণ ক'রে জোর গলায় চীৎকার ক'রে উঠল সে।

আবার সেই মৃদু কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

জানলা ধ'রে উঠে দাঁড়াল ও। এবং চ্যাঁচাল, 'মাথা কেটে ফেলব।'

না। আর শোনা যাচ্ছে না শব্দটা। নিঃসাড় চারিদিক। মিছিমিছি এসব করে লোকে···আরো অনেকক্ষণ জানলায় দাঁড়িয়ে রইল সে·· পাতার হাওয়া ঠাণ্ডা বয়ে আনল ঘরে। গলা আর কাঁধের যন্ত্রণা জুড়িয়ে আসছে ঠাণ্ডা হাওয়ায়।

কে যেন ডেকেছিল আগে?··· কী যেন শুনেছিল? কিছুই আর এখন স্পষ্ট হচ্ছে না। মনে পড়ছে না··· উদ্দেশ্যহীনভাবে এখন সে অন্ধকার হাতড়াতে থাকল।

আবার তার মনে হ'তে লাগল শব্দটা শুনতে পাচ্ছে।

'বড়ো দাদ…'

হ্যাঁ, ঠিকই…চমকে উঠল সে। আর চোখ ভিজে উঠল।

3

ভাঙা মাটির বাসনের একটা টুকরো দিয়ে ব'সে ব'সে মাটিতে সিঁড়ির ছবি আঁকছিল বেলায়ুধন।

আস্তে আস্তে ঘোর কেটে যাচ্ছে চোখ থেকে। এখন সে কোথায়?

চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। বাড়ির দক্ষিণ দিকের ঘরে শুয়ে আছে। উঠে দাঁড়াতেই মাথাটা ভারী ভারী লাগল কেমন। পায়ে যন্ত্রণা। একটু বেঁকে দাঁড়াতেই শব্দ হল পায়ে। ভালো ক'রে তাকাতেই পায়ের শিকল চোখে পড়ল। মাথা হেঁট ক'রে আস্তে আস্তে ব'সে পড়ল সে, তারপর খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল শিকলটাকে। তার একটা প্রান্ত বড়ো কাঠের তক্তা ফুটো ক'রে আটকানো। কাঠে ঘষা খেয়ে পায়ের কোন কোন জায়গা ছড়ে গেছে, লাল হয়ে উঠেছে সেই জায়গাগুলো। কে শিকল বাঁধল আমার পায়ে?

বেলায়ুধন ভাবতে লাগল— কখন সে এই ঘরে এলো? কে এমন করল? সবাই কি মজা করবে আমার সঙ্গে।

মাটি আর নোংরায় সারা মেঝে ভর্তি। আশেপাশেও নোংরা ছড়ানো।

মনে করার চেষ্টা করল বেলায়ুধন। পরিষ্কার কিছুই মনে এলো না। অতীতের সব-কিছু যেন কুয়াশার মতো। সেই

অস্পষ্টতার ভিতর থেকেই এক-আধটা প্রশ্ন জেগে উঠছে মাঝে মাঝে। মানুষকেও কি শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়? কুকুরের মতো… অসুখ করেছিল, হয়তো সেইজন্যেই রাখা হয়েছে এই ছোট ঘরে। কিন্তু, সত্যিই কি কুকুরের মতো মানুষকেও বেঁধে রাখতে হয় শিকলে…

বেলা পড়ে আসছে বাইরে। উঠোনের কলাগাছ থেকে দুধ শুষে নিচ্ছে কাঠবিড়ালী। গাছের ভাঁজ খুলে ফেলছে দাঁতে; এক ভাঁজ থেকে মুখ নিয়ে যাচ্ছে অন্য ভাঁজে… তারপর আবার অন্য গাছে…

রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছে নানারকম শব্দ। যদি কেউ বাইরে আসে… সম্ভবত অসুখের জন্যে এ-ঘরে এনে রাখা হয়েছে আমাকে। বাইরে থেকে হঠাৎ কেউ যদি এসে পড়ে হয়তো বলবে আমার কোন অসুখই নেই।… এখন সেরে গেছি আমি…খুলে দাও না আমার পায়ের শিকল… মানুষকেও কি শিকলে বেঁধে রাখা হয়?

রান্নাঘরের জানলা খুলে কেউ বুঝি জল তুলছে কুয়া থেকে। জলে বাল্‌তি ডোবার শব্দ হ'ল।

'বড়ো মা…বড়ো মা গো…'

কেউ জবাব দিল না।

কাকে যে ডাকব? কেমন অদ্ভুত মানুষ এরা? এখন আমার কিছু নেই…কিছু নেই…

নিজের নোংরা শরীর এবং মাটি-মাখা কাপড় দেখে ঘৃণা হল তার। খুব ভালো ক'রে নিজের দিকে তাকিয়ে লজ্জাও হল। কোমরের নীচে কাপড় নেই কোন। ছি ছি— কেউ দেখলে কী

ভাববে! ল্যাংটো অবস্থায় কেউ যেন না দেখে ফেলে— এমন কি আর সে ছোট খোকাটি আছে, বড়ো হয়ে গেছে। ঘন দাড়ির দরুন গলা চুলকোয় প্রায়ই। তবু বিনা কাপড়ে…

মাথা নীচু ক'রে ব'সে থাকল বেলায়ুধন। একটা কাপড় চাই। কাকে ডাকব? বড়ো মা-কে?…না। সে গোপীকে ডাকল। জোর গলায় বার বার ডাকতে লাগল।

কাপড় না-পরার আগে কেউ যেন না আসে ভিতরে। দরজা বরাবর এসে কে যেন জিজ্ঞেস করল, 'কী চাই?'

'ভিতরে এসো না… গোপী কোথায়?'

'আমিই গোপী।'

গোপীর পরনে পাড়-বসানো লাল জাঙ্গিয়া আর পাঞ্জাবি। বেশ বুদ্ধি হয়েছে।

'আমাকে ডেকেছ কেন?'

'আমার একটা কাপড় চাই।'

'ছিঁড়বার জন্যে। উ-হুঁ।'

'ছিঁড়ব না, গোপী, তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়… কেউ আসবার আগেই…' গোপী দ্বিধায় পড়ল।

'লক্ষ্মী ছেলে…নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি…'

গোপী একটা ভালো কাপড় নিয়ে এলো। পরিষ্কার কাপড়; খুব খুশী বোধ করল বেলায়ুধন।

'ছিঁড়বে?'

'ছিঁড়ব। কেন?'

'ছিঁড়বার জন্যে দেব না।'

'এদিকে দে, গোপী… কেউ যদি দেখে ফেলে…'

দূর থেকেই কাপড়টা ছুঁড়ে দিল গোপী।

ভীষণ খুশী হ'ল বেলায়ুধন। এখন কেউ এসে পড়লেও ক্ষতি নেই কোন।

'আমার পায়ে শিকল বাঁধল কে?'

গোপী জবাব দিল না।

'এটা খুললে কিছু...'

একটু হাসল গোপী।

'খুলে দে না এটা। আমি কি কুকুর?'

গোপী ফিরে গেল।

'এই শিকলটা কি কেউ খুলে দেবে না!'

দিদিমাকে ডাকল বেলায়ুধন, তারপর বড়ো মাকে। কেউই এলো না। কেউই শুনল না। শুধু দূর থেকে ভেসে এলো খড়মের শব্দ। খানিক পরেই মামা এসে দাঁড়াল ঘরের সামনে।

মামাকে সম্মান দেখানোর জন্য উঠে দাঁড়াল বেলায়ুধন, মামার সামনে ব'সে থাকা ঠিক নয়।

'কি হয়েছে রে?'

সে প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না সে।

'কী, বলবি তো?'

'এটা একটু খুলে দিন···।'

'লোককে জ্বালাবার জন্যে?'

'আমাকে শিকলে বাঁধা হয়েছে কেন?'

'তোর পাগলামি আর বদমাইসির জন্যে। এতে পাগলামি কমে কি না দেখি...'

খটখট শব্দ তুলে চ'লে গেলেন মামা। বেলায়ুধন ভাবল, কী

বদমাইসি করেছে সে? আগে আরাম ছিল না··· এখন··· এখন কিছুই নেই।

চীৎকার করা ছাড়া এখন আর তার কোন উপায় নেই।

'আমার কিছুই হয়নি, আমি পাগল নই···'

শিকলের বাঁধন খুবই ক্লান্ত ক'রে ফেলেছিল তাকে। কেউ কি খুলে দেবে না? চীৎকার ক'রে কাঁদতে লাগল সে। কেউ কি আসবে না? কেউ না?···

তখন, অসহায়ভাবে, বাইরে তাকিয়ে থাকল সে। দূরে তেঁতুল গাছের ফাঁক দিয়ে নীল আকাশ দেখা যাচ্ছিল। এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে লাল আর কালো কয়েক খণ্ড মেঘ। কপালের ঘাম মুছে, পায়ে হাত বোলালো সে। শিকল বেজে উঠল।

কান্নার বেগ কমে আসতে সে আবার মনে করার চেষ্টা করল। কী যে হয়েছে তার?

সকলেই বলত আমি অসুস্থ··· কিন্তু, এখন আমার কিছুই নেই··· কিছুই হয়নি··· আমাকে ছেড়ে দাও···

ভার সামলাতে পুরনো থামের গায়ে এলিয়ে বসল সে। একটু আগেই পরনে কাপড় ছিল না। কে জানে কে দেখে ফেলেছে!

অম্মুকুট্টি—

অম্মুকুট্টির সঙ্গেও যদি দেখা হ'ত একবার···

সম্ভবত ঘৃণা করত ও। মাটি মাখা হয়ে গেছে আমার গোটা শরীর। তবু, একবার যদি দেখতে পেতাম ওকে। দাড়িগুলো অনেক বড়ো হয়ে গেছে।

এতটুকু নোংরা নেই অম্মুকুটির শরীরে। ওর কাছে বসলে ভেসে আসে তেল আর ফুলের সুগন্ধ।

অম্মুকুট্টির কথা ভাবতে ভাবতে একটা অদ্ভুত রহস্যময় স্মৃতির উদ্রেক হ'ল মনে। কেউ জানে না সে-কথা। কাউকে বলবও না। আম গাছের ছায়ায় ব'সে আমরা যখন গাছ থেকে আম পড়ার অপেক্ষা করতাম···

হাল্‌কা হাতে একদিন আমি ওর গালে চড় মেরেছিলাম, আর রেগেমেগে ও আমার গায়ে বসিয়েছিল নখের আঁচড়।

তখন ছোট ছিলাম আমরা। এ-সব অনেকদিন আগেকার কথা। এখন কত বড়ো হয়ে গেছি!

তারপর কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল? মাঝের অনেকটাই অস্পষ্ট। যেন একটা বন্ধ দরজা। কলার পাতায় ঢাকা জানলা। সেই অন্ধকারে কত কী যে ঘটে গেল! কখন পরানো হ'ল আমার পায়ে এই শিকল?

'বড়ো দাদার অসুখ ঠিক সেরে যাবে।' মিষ্টি গলার সেই স্বর কোথায় যেন লুকিয়ে থাকে। লোকে বলেছিল অসুখ হয়েছে তার। প্রায় সবাই বলেছিল একই কথা—ভগবান, এটা কি সত্য? লোকের কথাই কি ঠিক?

দুই হাঁটুর মাঝখানে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল অনেকক্ষণ ধ'রে। শিকল-বাঁধা জায়গাটায় অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছিল।

তবু, অসুখটা সেরে গেছে ভেবে ভালোও লাগছিল।

'আমার কিছু হয় নি। আমার কোন অসুখ নেই—,' জোর গলায় চীৎকার করতে লাগল সে, 'খুলে দাও আমাকে।···শেকলটা খুলে দাও···'

কেউই এলো না। চীৎকার করলেও শুনতে পায় না কেউ। মানুষকে শিকলে বাঁধা হয় না। আমি কি পাগল কুকুর।

'আমাকে ছেড়ে দাও···ছেড়ে দাও আমাকে···।'

অনেক আশা নিয়ে সে তাকিয়ে থাকল বারান্দার দিকে।

বাইরে কেউ উঁকি মারছে যেন। শঙ্করণকুট্টি না? হ্যাঁ, সেই।

'শঙ্করণকুট্টি?'

সামনে এলো সে।

'একটু কাছে এসো-না, শঙ্করণকুট্টি!'

সে ঘাড় কাত করল।

'কাছে এসো-না। একটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

'মারবে?'

'না, শঙ্করণকুট্টি, আমি মারব না।' গলা বুঁজে এলো তার।

শঙ্করণকুট্টির ভয় গেল না তবু।

'আমি কিছু করব না—'

ভয়ে-ভয়ে একটু এগিয়ে এসে শঙ্করণকুট্টি বলল, 'এখানে আমাদের আসা বারণ।'

'কে করেছে বারণ?'

'বাবা—'

'শঙ্করণকুট্টি, পায়ের এই শেকলটা কে বাঁধল?'

ভয়ে-ভয়ে বেলায়ুধনের দিকে তাকাচ্ছিল শঙ্করণকুট্টি।

'বলো না কে?'

'বাবা কামার ডেকেছিল।'

'এটা খুলে দাও না?'

'আমি খুলতে পারব না।'

'শঙ্করণকুট্টি, আমার তো কিছুই হয়নি। খুলে দাও না এটা।'

'উ-হুঁ।'

কান্না চাপতে চাপতে বেলায়ুধন বলল, 'আমি পাগল নই, শঙ্করণকুট্টি! তাহলে কে খুলে দেবে এটা? দিদিমা থাকলে ঠিক খুলে দিত।'

শুধু দিদিমাই বুঝতে পারে তার কথা। আর যদি অম্মুকুট্টি আসে···

'শঙ্করণকুট্টি, আমার দিদিমাকে ডেকে দেবে একটু?'

হাততালি দিয়ে হেসে উঠল শঙ্করণকুট্টি।

'ডাকো না একটু।'

'বেলায়ুধন, তুমি পাগল। দিদিমা তো মরে গেছে।'

শুনে একটু চিড় খেল বেলায়ুধন। দিদিমার মৃত্যু-সংবাদ নতুন ক'রে কষ্ট দিল তাকে। তাকে না জানিয়ে কত কি ঘটে যাচ্ছে এই অন্ধকারে। কতদিন হ'ল? কত মাস আগের ব্যাপার?

আবার ঝন্‌ঝন্ ক'রে উঠল শিকল।

কে খুলে দিতে পারে এটা? কেউ শুনতে পায় না···কেউ শোনে না···বিড়বিড় ক'রে উঠল সে।

'শঙ্করণকুট্টি, চুপি চুপি একবার দিদিকে ডেকে আনবে এখানে?'

অম্মুকুট্টিকে বললে হয়তো সে বুঝতে পারত আমার আর অসুখ নেই।

'দিদি, মামা, সকলেই চ'লে গেছে।'

পরিহাস নয়, শঙ্করণকুট্টির চোখেমুখে সহানুভূতি ফুটে উঠল।

'কবে?'

'এই কিছুদিন। আমিও গিয়েছিলাম। কাল বাবার সঙ্গে ফিরে এসেছি।'

'কবে ফিরবে?'

'আর ফিরবে না।'

'কেন ?'

'সামনের মাসে দিদির বিয়ে না ?'

বেলায়ুধন চুপ ক'রে গেল আবার।

কিছুই জানা যায়নি। অসুখ ছিল। দরজাটা বন্ধ ছিল সারাক্ষণ। নারকোল পাতায় ঢাকা জানলা। একটি রোমশ কর্কশ হাত আর···

'বড়ো দাদার অসুখ সেরে যাবে'···

এখনই দেখা হ'লে ভালো হ'ত। অম্মুকুট্টি, আমি সেরে গেছি এখন।··· এ-সব কিছুই ও জানে না। আর কখনো দেখা হবে না।

লোহার থালায় ভাত তার তরকারি নিয়ে ঘরে ঢুকল একজন স্ত্রীলোক। দূর থেকেই থালাটা ঠেলে দিল সামনে। স্ত্রীলোকটির দাঁত বড়ো বড়ো, বুকের কাপড় নেই কোন। বেলায়ুধন জানত না কে এ, তবু বলল, 'শিকলটা খুলে দাও—।' ভীত চোখে তার দিকে তাকিয়ে স্ত্রীলোকটি বলল, 'তোমার মাথা ঠিক হলে খুলে দেব।'

'আমার···আমার কোন অসুখ হয়নি। আমাকে ছেড়ে দাও।'

বেরিয়ে-আসা দাঁতের ফাঁক দিয়ে থুথু ছিঁটিয়ে চ'লে গেল সে।

ভিতর থেকে সোরগোল শোনা গেল। বড়ো মা-র গলা। গোপীকে বকছে।

'ওই ভালো কাপড়টা কেন দিয়েছিস ওকে ? ছিঁড়ে ফেলবে না ?'

'আর কোন কাপড় খুঁজে পাইনি।'

'কী জ্বালাতন! বেলায়ুধন একাই পাগল নয়, তুইও'···

বড়ো মা, আমি পাগল নই, বলতে চাইল বেলায়ুধন।

খিদে পেয়েছিল। থালা থেকে অল্পস্বল্প নিয়ে মুখে দিল। কলার ঝাড় থেকে ক্রমশ উঠে আসছে অন্ধকার। লাঠি আর খুরপি হাতে কলা বাগান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কেউ। খুরপির মাথাটা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না সে।

দেখতে দেখতেই খুরপি দিয়ে একটা ফুল ছিঁড়ে মধু চুষতে লাগল পাপড়ি থেকে। অম্মুকুট্টি মধু পছন্দ করত না। তার ভালো লাগত কলা-ফুলের ভিতরের শাঁসটুকু। তেক্কেকাট্ট জানকীরও তাই পছন্দ। সে-রকম কলা পেলে ঝগড়া বেধে যেত দু'জনের মধ্যে।

'পাতা খুলে দেখব ?'

'না, আমিই দেখব।'

'থাক্, বড়ো দাদাই দেখুক—'

তখন তুলসীর পাতা ছিঁড়ে জিজ্ঞেস করত সে, 'ওপর না নীচ, কোন্ দিক ?'

পাতা যতক্ষণ মাটিতে না পড়ে ততক্ষণ চুপ ক'রে থাকে অম্মুকুট্টি। যেন ভগবানের ধ্যান করছে!

সেই অম্মুকুট্টি কোথায় চ'লে গেল আজ ? কেনই বা গেল ? ছোটবেলা থেকেই তো ছিল এখানে ?

একবার মামার সঙ্গে গিয়েছিলাম মামীদের বাড়ি। হলুদ ফুলে ছেয়ে আছে রাস্তা, এত হলুদ ফুল চারিদিকে। খালের ধারে বাড়ি। এখনো মনে পড়ে কাচের গোলক আর দেয়ালে টাঙানো হরিণের শিং। কী করছে অম্মুকুট্টি সেখানে ?

স্নান ক'রে দক্ষিণের উঠোনে দাঁড়িয়ে হয়তো বা চুল শুকোচ্ছে। আর আসবে না ? একবারও যদি দেখা হ'ত অম্মুকুট্টির সঙ্গে ··

বিয়ের পর তো আর কোনদিনও আসবে না এখানে। একবারও দেখা হ'ত যদি!…

দেয়ালে পিঠ ঘষতে শুরু করল বেলায়ুধন। শব্দ হ'ল পায়ের শিকলে। যদি কোনরকমেও খুলে যায় শিকলটা তাহ'লে সে বেরুতে পারবে বাইরে। শিকলটা টানার চেষ্টায় আঙুল কেটে গেল। খুলতে পারবে না? কোনরকমেই কি খোলা যাবে না এটা?

ছাগল বাঁধার জন্যে ঘর থেকে বেরুল বড়ো মা। এদিকে তাকালোই না।

ঘরের বারান্দায় ব'সে রাম-নাম জপছে গোপী আর শঙ্করণকুট্টি…

দাঁত-বড়ো মেয়েলোকটি থালা ফেরত নিতে এলো। বার বার শিকলটা খোলার চেষ্টা করছিল বেলায়ুধন।

'একটু খুলে দাও না?'

'লোককে জ্বালাবার জন্যে!'

ভিজে চোখ মুছতে মুছতে আকাশ দেখতে লাগল বেলায়ুধন। উজ্জ্বল অথচ আর্দ্র রক্তিমা ছড়িয়ে পড়েছে সেখানে। যে দিকেই চোখ যায় শুধু আঁধার আর আঁধার। ওরই মধ্যে জ্বলজ্বল করছে নিঃসঙ্গ একটি তারা। সেই আলো ছড়িয়ে পড়েছে ঘরেও।

রাম-নাম শেষ ক'রে রামায়ণ পাঠ করতে শুরু করেছিল ওরা। মামার গলা। উত্তরের ঘর থেকে আলো আসছিল।

ভিতরে প্রদীপ জ্বলছে। রান্নাঘরে বাসনের শব্দ হ'ল। ওদের কেউই আর এখন এদিকে আসবে না··অন্ধকারেই মৃদু কণ্ঠে উচ্চারণ করল সে ··'ছেড়ে দাও আমাকে···ছেড়ে দাও আমাকে···'

প্রতিবেশীদের মধ্যেও কেউই কি নেই? এই শিকলটা একটু কেউ খুলে দিক না?

হঠাৎ জোরে চীৎকার ক'রে উঠল সে, 'মা···মা···'

বারান্দায় আলো চোখে পড়ল। একটা গলা ভেসে এলো—'বেলায়ুধন!'

'আমাকে ছেড়ে দাও···ছেড়ে দাও আমাকে···'

'একেবারে চুপ ক'রে থাক···হাড় গুঁড়িয়ে ফেলব না হ'লে।'

আলোটা হারিয়ে গেল আবার।

থেমে গেছে ঘরের শব্দও। উঠোন জুড়ে মৃত্যুরূপী অন্ধকার। হিংস্র কুকুরকে বেঁধে রাখা হয়েছে শিকলে, কিন্তু মানুষকে··· শিকলটা খুলে দাও না···একটা আংটাও যদি খুলে যেত ভালো হ'ত খুব।

পাপী। ওরা সবাই পাপী। নাহ'লে মিছিমিছি কাউকে এত কষ্ট দেবে কেন!

'আমার কিছু হয়নি···আমি পাগল নই।'

প্রাণপণে শিকলটা ছিঁড়বার চেষ্টা করল সে। হাতে যন্ত্রণা বোধ করলেও টানতে লাগল।

ধড়ফড় করছে বুক। নিঃশ্বাসে টান পড়তে চোখ বুঁজে শুয়ে পড়ল ও। আবার চোখ খুলতেই মনে হ'ল স্বপ্ন দেখছিল। হীরা-মোতি খুঁজে-পাওয়া এক রাজার কাহিনী। ছোটবেলায় কোলে বসিয়ে গল্প বলেছিল দিদিমা। সরোবরের মাঝে এক প্রাসাদে রাজকুমারকে শিকলে বেঁধে রেখেছিল রাক্ষসরা। সে শিকল আগুনে পোড়ে না, ছিঁড়লে ছেঁড়ে না। বিষম মজবুত। এলো কাঠকুড়ুনি মা। দিল একটা মন্ত্রঃপূত ছুরি। সেটার সংস্পর্শে আসতেই খুলে গেল শিকল। সাদা ঘোড়ায় চড়ে রাজকুমার আর রাজকুমারী পৌঁছে গেল সাতমহলা প্রাসাদে···

চোখ খুলে দেখল কোথায় প্রাসাদ, কোথায় হীরা মোতি আর সাদা ঘোড়া! · ঘরে ঢুকে পড়েছে জ্যোৎস্না, উঠোন জুড়ে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করছে ছায়া।

সে ভাবছিল, এখন কোথায়? নড়াচড়া করতেই শিকল বেজে উঠল।

অসম্ভব ক্রোধে দেয়ালে পা রেখে শিকলটা সর্বশক্তি দিয়ে টানতে লাগল সে। একটা কড়াও যদি ভাঙতে পারে— শুধু একটা কড়া— আবার চাপ দিল জোরে···আরে···

পিছনে ছিটকে পড়ল সে। ছিঁড়ে গেছে শিকলটা।

যন্ত্রণায় কাঁপছে সর্বাঙ্গ। খোঁড়াতে খোঁড়াতে পালিয়ে এলো উঠোনে। এক-এক পা এগোয় আর ঝন্ঝন্ ক'রে বেজে ওঠে শিকল।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে, গেট খুলে বেরিয়ে এলো বাইরে।

সামনে ধানজমি, তার মধ্যেকার রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ভাবল— কোথায় যাবে?

এখন সবচেয়ে বড়ো স্বস্তি বন্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। সকালে ওরা খুঁজে পেলে আবার বেড়ী পরাবে···

যেদিকে খুশী চ'লে যাওয়া যায়—

হাওয়ায় দোলা নারকেল পাতার তাল-লয়ের সঙ্গে তাল রেখে বাজছে পায়ের শিকলও। হঠাৎ কানে এলো কুকুরের আর্তনাদ। বেলায়ুধন ভাবল— হয়তো কুকুরটাও বাঁধা রয়েছে শিকলে!

আকাশ কালো থাকলেও চাঁদের আলোয় বেশ রাস্তা দেখা যাচ্ছিল।

নিঃশব্দ রাতে এখন শুধু একটিই শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে, তার পায়ের শিকলের। ক্ষেত শেষ হয়েছে রাস্তায় গিয়ে। কেতকী ঝোপের

পাশ দিয়ে সে রাস্তায় গিয়ে পৌঁছুলো। রাস্তাটা এখান থেকে চ'লে গেছে নদীর ধার বরাবর।

সকালে যখন ওরা টের পাবে, বেলায়ুধন নামের কুকুরটি তখন আর শিকলে বাঁধা থাকবে না। কথাটা ভেবে জোর গলায় হেসে উঠতে ইচ্ছে করল তার। কিন্তু, ওদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সত্যিই দরকার। কবে আর ওদের সুনজরে পড়ব? কেউই বিশ্বাস করবে না আমাকে···কেউই শুনবে না আমার কথা।

নিজেকে শুনিয়েই তখন সে বলল, 'আমি পাগল নই···আমার কোন অসুখও নেই ··।'

অম্মুকুট্টি বলেছিল, 'বড়ো দাদার অসুখ সেরে যাবে···'

···প্রিয় অম্মুকুট্টি আমার! আমার কোন অসুখ নেই। আমার কথায় শুধু সে-ই বিশ্বাস করতে পারে।

রাস্তার মাটি বেশ নরম। শিশির পড়েছে বলেই বোধহয়। অনেক···অনেক দিন আগে হেঁটে গেছি এই রাস্তায়। বন্ধ দোকান, ঘাটের ধারের মসজিদ ইত্যাদি পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল সে। শ্মশান আর বটগাছ— যেখানে শয়তানের বাসা— পেরিয়ে যেতে আজ তার এতটুকু ভয় লাগল না।

মাথার ওপর ঘোলাটে আকাশটা ক্রমশ ফরসা হয়ে আসছে। ছায়ার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে অল্প আলোর আভাস। রাস্তার ধারে একটা বড়ো পাথরে ঠোকর খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বেলায়ুধন। পুর্বদিক লাল হয়ে এলো।

আমি কোথায়? মাঠের মাঝখানের জায়গাটা দেখে চিনতে পারল। ওখানে মাদ্রাসা আছে। মাঠের ওদিকে পুকুর আর

তার ওপারে ছোট মন্দির। ফী মাসে সেখানে আসত মা'র সঙ্গে। মাদ্রাসা ছাড়িয়ে ময়দান, সেখানে একদিন নাটকও হয়েছিল।

কুয়াশায় ঢাকা মাঠ। বেলায়ুধন মাঠে নেমে পড়ল। ঝন্‌ঝন্ শব্দ তুলে এগিয়ে যাচ্ছিল। কাঁধে হাল নিয়ে কালো মতোন একটি লোক তার দিকেই আসছিল। কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটি। 'কে?'

বেলায়ুধন জবাব দিল না। দু' এক মুহূর্ত গেল। আবার সে এগোবার জন্যে পা বাড়াতেই লোকটা হাল ফেলে দৌড় দিল।

ভ্রূক্ষেপ না ক'রে এগিয়ে চলল বেলায়ুধন। সকালের আলো বড়োই ভালো লাগছিল তার। বহুদূর বিস্তৃত মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকাল সে।

মাথায় কলসী নিয়ে আসছিল একদল হরিজন স্ত্রীলোক, বেলায়ুধনকে দেখেই পালাতে লাগল তারা।

'পাগল···পাগল···।'

পিছন থেকে ভেসে এলো চীৎকার চ্যাঁচামেচির শব্দ। দ্রুত হাঁটতে লাগল বেলায়ুধন। লোকজন পিছু নিয়েছে নাকি? চড়াই ভেঙে ওঠবার সময় কেতকীর ডালে চোট লাগল পায়ে। একটা চোরা রাস্তায় নেমে পড়ল বেলায়ুধন।

পিছনে কোলাহল, কিন্তু সামনে এসে কেউই বাধা দিচ্ছে না তাকে। ব্যাপারটা কিছুটা আশ্বস্ত করল তাকে। যারা দেখছে তারাই মুখ ঘুরিয়ে চ'লে যাচ্ছে অন্য দিকে। ভয় নয়, গ্লানিতে ছেয়ে গেল তার মন।

'আমার পাগলামির অসুখ নেই···দোহাই, আমাকে পাগল বোলো না।'

পিছনে ধাবমান লোকেরা চেঁচিয়ে উঠল, 'পাগল ··পাগল !'

রাস্তার প্রান্তে পৌঁছে একটা পাথর হাতে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ক্লান্ত লাগছে ভীষণ। আবার এগোতে যাবে, পিছন থেকে একটা গলা শুনতে পেল, 'এই দাঁড়াও···'

তাকিয়ে দেখল, মোটা, শক্ত-সমর্থ চেহারার একটি লোক ডাকছে। মাথায় পাগড়ি।

হাঁফাতে হাঁফাতে বেলায়ুধন বলল, 'আমি পাগল নই···পাগল নই···'

'তোমার পাগলামি আমি বের ক'রে দেব !'

লোকটি তার লুকানো ছড়ি বের ক'রে মারতে উদ্যত হতেই বুকে আগুন জ্ব'লে উঠল বেলায়ুধনের। মাটি থেকে একটা গোল পাথর তুলে নিয়ে দেখাল এবং সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকল।

লোকটা পিছু হটে গেল।

আবার হাঁটতে শুরু করল বেলায়ুধন।

রাস্তাটা প্রায় টিলার কাছাকাছি পৌঁচেছে। আমাকে ওপর দিকেই যেতে হবে— ভেবে আরো দ্রুত হাঁটতে লাগল বেলায়ুধন। টিলায় ওঠার পর দূরে একটা বিরাট বটগাছ চোখে পড়ল। গাছের পাশে লাল পাথরের তৈরি ছোট্ট মন্দির। জায়গাটা ভালো ক'রেই চেনে বেলায়ুধন। ওই গাছটা পেরিয়ে নীচের দিকে নামলে কাজুর বাগান, এবড়ো খেবড়ো রাস্তা আর খাল···।

খালের পাশে ঘরের রাস্তা ছেয়ে আছে বর্ণময় হলুদ ফুলে।

অম্মুকুট্টি আমার, আমি পাগল নই।

টিলার ওপরটা অসম্ভব নির্জন। একটা কালো বলদই শুধু চরছে ওখানে।

ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটবার সময় শিশিরে মাখামাখি হয়ে গেল পা দুটো।

আশেপাশে কেউ নেই, এখানে একটু জিরিয়ে নেওয়া যায়। গাছটার কাছাকাছি পৌঁছুতে পৌঁছুতে হাঁটু দুটো খ'সে পড়ার অবস্থা হ'ল। গাছের পাশেই উঁচু মতোন পাথুরে ভূমিতে ব'সে পড়ল বেলায়ুধন।

শীতল হাওয়ার স্পর্শে ঘুম পাচ্ছিল ওর। পিঠ জুড়ে যন্ত্রণা। ঘাসের ভিতর মুখ ডুবিয়ে শুয়ে পড়ল ও। হঠাৎ পিঠের ওপর কিছু এসে পড়তেই হুঁস হ'ল। উঠে ব'সে তাকাল চারিদিকে। অল্প দূরে চার-পাঁচজন রাখাল দাঁড়িয়ে। অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছিল লোকগুলি। এই সময় আবার একটা ঢিল এসে পড়ল। একটা গায়ে লাগল, অন্যটা অল্পের জন্য বেরিয়ে গেল মাথা ছুঁয়ে।

ভয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল বেলায়ুধন। ঝনঝনিয়ে উঠল পায়ের শিকল···পাথরের ওপর থেকে শিকল-বাঁধা পা টেনে টেনে দ্রুত নীচের রাস্তায় নামতে নামতে পিছন ঘুরে তাকাল।

'মাগো!' আর্তনাদ ক'রে উঠল বেলায়ুধন। মাথায় হাত দিতেই রক্তে ভ'রে গেল হাত।

'ধরো, আরে···ধরো ওকে···ওই যে যাচ্ছে···পালাও পালাও···'

সমবেত চীৎকার তাড়া করতে লাগল পিছনে। মাঠের ঠিক মাঝখান দিয়ে ছুটতে লাগল বেলায়ুধন। খালের ধার, সেখান থেকে রাস্তায় পৌঁছুলো। দু'দিকেই বড়ো বড়ো গাছের সারি। আরো একটু এগিয়ে দেখল রাস্তা ছেয়ে আছে হলুদ ফুলে।

এই রাস্তায় ব'সে কত খেলাই যে খেলেছি ছোটবেলায়। লাল লাল দেয়াল ঘেরা একটা বাড়ির ওপরে লাফ দেবার ভঙ্গিতে

হনুমানের মূর্তি দাঁড়ানো। দেখেই এলোপাথাড়ি কষ্ট হ'ল বেলায়ুধনের বুকে। 'ওইখানে···ওইখানেই আছে আমার অম্মুকুট্টি। একবার যদি দেখা পেতাম ওর··· অম্মুকুট্টি, আমার অসুখ সেরে গেছে। এখন আমার কোন অসুখ নেই···কিছুই নেই···

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল সে।

উঠোনে ব'সে একটি বালক নারকেল পাতার খেলনা তৈরি করছে। গোবর-নিকানো উঠোন ঝলমল করছে প্রথম সূর্যের আলোয়। চারিদিকে তাকাতে লাগল বেলায়ুধন।

বালকটি তার খেলনা নিয়ে তাড়াতাড়ি ঢুকে গেল ঘরে।

'অম্মুকুট্টি আছে এখানে?··· অম্মুকুট্টি।'

উঠোনের মধ্যে দিয়ে চার-পাঁচ পা হেঁটে গেল সে। বারান্দার দড়িতে একজন মহিলা ভিজে কাপড় শুকোতে দিচ্ছিল।

শিকলের শব্দে মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

এক মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল বেলায়ুধন। একবার দেখল সে, 'অ···অম্মুকুট্টি···'

হাতের কাপড় ফেলে দিয়ে দ্রুত ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল সে এবং চীৎকার করতে লাগল, 'পাগল···পাগল···'

'অম্মুকুট্টি আমি···আমি পাগল নই।' বলতে চাইল বেলায়ুধন, কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরুল না কোন। আরো একবার শুধু ডাকল, 'অম্মুকুট্টি···'

ততক্ষণে সে ভিতরে গিয়ে লুকিয়েছে।

ভিতর থেকে একটা গলা ভেসে এলো, 'পাগল···পাগল···'

'ছড়িটা দে, তুই ভিতরে যা।'

'পাগল···পাগল···'

বেলায়ুধন আর দাঁড়াতে পারছিল না। ঠোঁটে জিব বুলোতেই নোনা স্বাদে ভ'রে গেল মুখ। মাথা থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। পায়ের শিকল টেনে টেনে সেখান থেকে চ'লে যেতে লাগল বেলায়ুধন।

অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে শরীর। এত ক্লান্ত যে মনে হচ্ছে পড়ে যাবে, তবু সে ছুটতে লাগল ঝড়ের বেগে। কোলাহল তার পিছু ধাওয়া করল।

···গেট খুলে উঠোনে ঢুকে দেখল মামা আর দুই ব্যক্তি ব'সে আছে। শিকলের শব্দে দু'জনেই চমকে উঠল।

দেয়াল ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকল বেলায়ুধন। দেখল, লাঠি হাতে মামা ছুটে আসছে তার দিকে।

ক্লান্ত চোখে সে তাকাল নিজের দিকে। হঠাৎ খেয়াল হ'ল সে উলঙ্গ।

দুঃখিতভাবে বারান্দায় আছড়ে পড়ল বেলায়ুধন। মামা আর অন্য দু'জনকে তার দিকে আসতে দেখে শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'আমি পাগল···তোমরা আমাকে শিকল বেঁধে রাখো···'

রাধার চিঠি

মাধবী কুট্টি

প্রিয়তম,

বিচ্ছেদের পূর্ব-দিনে সান্ত্বনা দিয়ে আমায় তুমি সব পুরুষের মধ্যেই তোমার রূপ খুঁজে নিতে বলেছিলে।

সেদিন তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরে দেখলাম স্বামী অপেক্ষা করছেন পালঙ্কে শুয়ে। আমাকে দেখেই বললেন, 'বড্ড দেরি করলে! ভাবছিলাম কিছু হ'ল নাকি!'

ভাবলাম, বলি, 'অন্ধকারে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম।' কিন্তু, কী হলো সেদিন, এ-রকম সহজ একটা মিথ্যে বেরুল না মুখ দিয়ে। ভিজে কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। তাঁর আলিঙ্গনে কোথায় উত্তেজনা বোধ করব, না তার বদলে গোটা শরীর বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে এলো। আমার কৃষ্ণ, তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদের পরই বস্তুত মৃত্যু হয়েছিল আমার, ছিল শুধু আমার জড়ত্ব।

স্বামী জিজ্ঞেস করলেন, 'রাধা! আমি চুমু খেলে কি ঘেন্না হয় তোমার?'

'না তো!' ঠাণ্ডা গলায় বললাম আমি, 'তা কেন!' সত্যিই তো, লাশ ছিঁড়েখুঁড়ে খাওয়া শকুনের ওপর ঘৃণা হবে কেন?

নিজের স্বামীর আলিঙ্গনেই আর একবার ব্যাভিচারিণী হলাম আমি। ভাত-কাপড়ের জন্যে কোন পুরুষের অঙ্কশায়িনী হওয়া

ব্যাভিচারিণীরই কাজ। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসা যার কাছে পেয়েছি সেই তোমার হাতে আমি ছিলাম পরিপূর্ণ নির্মল, ছিলাম চরিত্রবতী। শুধু দৈহিক সুখের জন্যেই তো আর ভালোবাসিনি তোমাকে। মাঝে-মাঝেই মনে হ'ত আমার হাড়-মাংসের এই শরীরের কোথাও লুকিয়ে আছে আমার আমি, যেই অশুদ্ধ চিন্তাকে আজও সম্পূর্ণ ক'রে জানা হয়ে ওঠেনি। তবু আশা ছিল একদিন-না-একদিন পূরণ হবে আমার আশা, সফল হবে আমার জীবন। যখন তোমার শরীরের ভার এলিয়ে দিয়েছিলে আমার শরীরে, তখন আকাশ-নীল শরীরের নীচে আমি ছিলাম সুরক্ষিত। মাটির মতো তীব্র ক্ষুধা সঞ্চারিত হয়েছিল আমার মধ্যে। দুই ধ্রুবের মিলনের অক্ষের মতো অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও আমার নারীত্ব পৃথিবীর পরিক্রমা স্তব্ধ ক'রে রেখেছিল।

তুমি বলেছিলে, 'রাধা, তুমি দাবানল আর আমি বনভূমি। আমি জ্বলে যাব।...'

কিন্তু জ্বলে শেষ হয়ে-যাওয়া আগুনের ছাইয়ের মতো তুমি শুয়েছিলে আমার ওপর। 'ভুতুড়ে আগুন!' বলেছিলাম আমি, 'জ্বলো— আরও জ্বলো!' তোমার নিত্য এবং শাশ্বত শরীর থেকে নির্গত নদীর অনুভূতিময় উষ্ণ প্রবাহ স্পর্শ করেছিল আমাকে।

তোমার অভাব ভবিষ্যৎ বিষয়ে কিছুই ভাবতে দেয়নি আমাকে। প্রেমিকের সান্নিধ্যলাভ এ-পৃথিবীতে সত্যিই দুর্লভ। তোমার থেকে আলাদা হয়ে আমাকে যে আবার শুষ্ক ও নীরস পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে কখনোই ভাবিনি তা, কারণ, আমার কাছে, তোমার শরীরের সীমানার বাইরে আর কোনও জগৎ-সংসার সত্য মনে

হয়নি। আমার শরীরের পরবর্তী দায়িত্ব নিতে পারার মতো সে-এক পৃথিবী!

গোড়ার দিকে আমার কাছে তুমি ছিলে এক প্রশ্ন। তোমার ভালোবাসায় ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে উঠেছিলাম আমি। তোমার কাছে আশ্বাস পেয়ে কয়েকবারই জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি কি ভালোবাসো না আমাকে। উত্তরে তুমি শুধুই মৌন হয়ে থাকতে।

একদিন কাঁদতে-কাঁদতেই জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি, 'অন্তত একবার বলো তুমি আমাকে ভালোবাসো কি না?'

উত্তরে তোমার ঠোঁট রক্তচিহ্ন এঁকে দিল আমার জঙ্ঘায়। সে কি তোমার প্রেমেরই চিহ্ন? কে বলবে! আমার মন তবু শান্ত হয়নি। সূর্যের মতো প্রখর তেজে জ্বলে উঠলেও প্রেম বড়োই ভয় পাইয়ে দেয়! সেই প্রেমের সাম্রাজ্যে সফল অনুপ্রবেশ সত্ত্বেও শান্তি পেলাম না আমি। অস্বস্তিকর আমার আত্মা তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে চোখের মধ্যেও ফুটে উঠল।

'রাধা, যে-আনন্দের স্বপ্ন তুমি দেখছ, সে-প্রেম কি অবিচ্ছিন্ন?' আত্মা জিজ্ঞেস করে আমাকে, 'সম্পর্কটা শাশ্বত তো?'

'তোমার শরীরকে-বশে এনে কয়েকবারই জিতে গেছি আমি। পাহারাদার তার বিজয়দুর্গ সুরক্ষিত রাখার জন্য সারাক্ষণ পাহারা দিয়ে থাকে। আমি এও জানি নীতিহীন কোন লৌকিক সাহস তোমাকে পর-পুরুষের কাছে যেতে বাধ্য করবে। এ-জন্য অসংখ্য বার আমি চুম্বন করেছি তোমার নিদ্রিত চোখে, নিজের বুকে লুকিয়েছি তোমার মুখ। আমার দৃঢ় অভিলাষ ছিল আমি ছাড়া তুমি অন্যাভিমুখী না হও আর তোমার-আমার পৃথিবী অভিন্ন থাকুক।'

তোমাকে চেয়ে আমি রূপবতী হলাম। তোমার সুন্দর হাতের স্পর্শে আমার শরীর মাজা পিতলের বাসনের মতো ঝকমকে হয়ে উঠল। কী অদ্ভুত ভালোবাসায় তোমার হাতের আঙুলগুলি স্পর্শ করত আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ! একদিন শরীরে চন্দন তেল মেখে আমি তোমার কাছে এসেছিলাম, কিন্তু সাক্ষাতের নির্দিষ্ট জায়গায় শেষ পর্যন্ত এলে না তুমি। সেদিন যমুনার ধারে মাথা হেঁট ক'রে ব'সে আমি শুধু এ-কথাই ভেবেছিলাম যে পৃথিবীতে কত বাসনাই চরিতার্থ হয় না! কত চন্দন তেল আর মেয়ে-মানুষের কত সম্মান ব্যর্থ হয়ে যায় এইভাবে!

পরের দিন জিজ্ঞেস করেছিলাম তোমাকে, 'তোমার কি আর কোন প্রেমিকা আছে?'

ঈর্ষা কী বস্তু তখনো আমি জানি না। সেইজন্যেই নির্লিপ্ততায় টালমাটাল পায়ে হাঁটছিলাম কোনরকমে। তুমি কোন উত্তর দিলে না।

কিন্তু হাসতে-হাসতেই জিজ্ঞেস করেছিলে, 'রাধা, আমি চ'লে যাবার পর নিশ্চয়ই অন্য কোন কামুক পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করবে তুমি?'

আমি বলেছিলাম, 'তা কেন? তুমিই পথের শেষ, তার পরে আর কিছু নেই।'

শুয়ে আছি তোমার কোলে মাথা রেখে। তুমি বললে, 'আর কোন শরীরে যদি আমার চরণস্পর্শও লাগে, সে তোমারই জন্যে, কারণ তোমার-আমার এই ভালোবাসা অন্যদেরও আকর্ষণ করবে। পুরুষ যে-রমণীকেই কামনা করুক, সে হবে তোমারই মতো। যতদিন সৃষ্টি থাকবে ততদিনই পুরুষ-শরীর তোমার দেহক্ষুধার আশ্রয় নেবে।'

তোমার কথা আমাকে অন্যনির্ভর করে দিয়েছে। তাই, অপরিণত মনে তোমার আদর্শই গ্রহণ করেছি আমি। 'এই মনকে টেনে নাও নিজের দিকে', মনে মনে বলেছি, 'শরীরকে আনো নিজের বশে।'

সেদিন নখে-দাঁতে ছিঁড়েছিলাম তোমাকে, আর তোমার আহত রূপ অহংকারী ক'রে তুলেছিল আমাকে। তারপরেই চুম্বন করেছি তোমার বিক্ষত শরীর, ধুয়ে দিয়েছি চোখের জলে···

একদিন তোমার হাত নিজের মুঠিতে তুলে নিয়ে প্রেমাবেশে বলেছিলাম, 'কৃষ্ণ! একটা ঘর বাঁধতে হবে আমাদের। দুজনের ঘর। তার চারিদিক ঘেরা থাকবে কাঁটাতারের বেড়ায়। হাওয়ায় দুলবে লাল-পাপড়ির ফুল। সকালে জানলা দিয়ে সূর্যকিরণ ঢুকে তোমার শ্যামল শরীরে আড়াল করবে আমার নগ্ন শরীর। প্রিয়, ঠিক এইরকম একটি ঘর হবে তো আমাদের?'

'হয়তো এইরকম ঘরই হবে। আমার আলিঙ্গনে শুয়ে থাকবে তুমি। কাঁটাতারের বেড়ায় আঁটকে যাবে জ্যোৎস্নার আলো। কে বলে এ-সব হবে না?'

তখন জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি, 'আমি মরে যাবার পরেও কি সেই ঘরের রাধার মৃত্যু হবে না?'

তুমি বলেছিলে, 'ওই ঘরের রাধা আর কৃষ্ণের মৃত্যু হবে না কখনো। যতদিন ওই স্বপ্ন আর পৃথিবী থাকবে ততদিন তারাও বেঁচে থাকবে।'

সেদিন তোমাকে জড়িয়ে সুখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি। ঘুম ভাঙার পর দেখলাম কখন চলে গেছে জ্যোৎস্না। অরণ্যের আঁধারে ছেয়ে আছে চতুর্দিক্। এত অন্ধকার যে হাত দিয়েও ছোঁয়া

যায় না হাত। নদীর ধার, গাছ-গাছালির মধ্যে দিয়ে ঘরে ফেরার রাস্তা— সবই ডুবে গেছে অন্ধকারে। রাস্তা হারিয়ে যাবার জন্যে অনেকক্ষণ কেঁদেছিলাম আমি।

হে সুন্দর কৃষ্ণ! তুমি আমার আনন্দ, তুমিই আমার যন্ত্রণা। আনন্দ আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, তোমার দেওয়া যন্ত্রণার রেশ থেকে গেছে এখনো—এখনো সে পুরুষের সঙ্গসুখের অনুভূতিতে জড়িয়ে আছে আমাকে। যখন একশো মাইল দূরের সুন্দরী রমণীদের সঙ্গে খেলায় মাততাম আমি, তখনো তুমি আমার থেকে দূরে ছিলে না। তোমার ভালোবাসা ওইসব রমণীদেরও টেনে আনত আমার কাছে। আমার অনন্ত আকাঙ্ক্ষাকেও।

সেইসব রমণীরাই আজ সকালে আমাকে দেখে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, 'ওই দ্যাখো, রাধা যাচ্ছে। কৃষ্ণরাজের পুরানো প্রিয়া। ওর চোখের দিকে তাকিয়ো না, ওখানে এখনো ঝলক দিচ্ছে তার আত্মা। ছেঁড়াখোঁড়া মাকড়সার জালের মতো দুঃখ ছেয়ে আছে ওর চোখে।'

তখন নবযৌবন-গৌরবে-গর্বিতা এক যুবতী বলল, 'ও বেঁচে আছে কেন, মরলেই তো পারে!'

সেই ভালো, মৃত্যুই ভালো। আর কখনো গাঁয়ের নদীর ধারে আমাকে খুঁজো না তুমি। আর কোনদিন আমি দেখতে পাব না তোমাকে!

তবুও বেঁচে থাকবে তোমার রাধা। মানব-জীবন কি এত সহজে শেষ হয়।

—তোমার 'রাধা'।

লেখক-পরিচিতি

1. পি. কেশবদেব

পি. কেশবদেবের জন্ম পথুর (কেরল)-এ, 1905 সনে। অল্প বয়সেই স্কুল ত্যাগ করেন। কেরলের শ্রমিক-সাংগঠনিক আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। একদা কম্যুনিস্ট পার্টিরও সদস্য ছিলেন, তবে অল্পদিনেই সভ্যপদে ইস্তফা দেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানের কারণে কারাবরণ করতে হয়েছিল। কিছুদিন আকাশবাণী ত্রিবান্দ্রামের 'নাট্যপ্রযোজক' ছিলেন।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রায় চার দশক ধ'রে লিখছেন তিনি। মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে তিনি মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যা নিরূপণ করেন। রচনাভঙ্গির কুশলতায় সৃষ্ট চরিত্রগুলির প্রতি সহজেই কেশবদেব পাঠকের দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকর্ষণে সফল হয়েছেন।

22টি উপন্যাস, 16টি গল্প সংগ্রহ, 11টি নাটক, 7টি একাঙ্ক সংগ্রহ, 1টি প্রবন্ধ গ্রন্থ ও আত্মজীবনীর লেখক কেশবদেব তাঁর 'পড়োশী' উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অকাদেমী এবং সোভিয়েট ল্যাণ্ড নেহরু পুরস্কার পেয়েছেন। বর্তমানে কেরল সাহিত্য অকাদেমীর সদস্য।

2. তকৃশী শিবশঙ্কর পিল্লে

তকৃশী শিবশঙ্কর পিল্লের জন্ম কেরলের তকৃশী-তে 1914 সনে। 'আইন' পাস করার পর কিছুদিন ওকালতি করেন। বর্তমানে সাহিত্যচর্চা ও কৃষিকর্মে নিযুক্ত। তিনি ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেছেন। তকৃশী আধুনিক মলয়ালম

সাহিত্যের প্রবর্তাদের অন্যতম। অত্যন্ত সহজ ও সুস্পষ্ট ভঙ্গিতে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা ও উদ্‌বেগ তিনি অত্যন্ত কুশলভাবে নিজের রচনায় ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের পুরোধা হিসাবে ও অন্যান্য কারণে তিনি অতি-সম্প্রতিও কারাবরণ করেছেন।

তকৃশী এ-পর্যন্ত 21টি উপন্যাস, 18টি গল্পগ্রন্থ, 1টি নাটক, 1টি ভ্রমণকাহিনী এবং আত্মজীবনী প্রকাশ করেছেন। সাহিত্য-অকাদেমী পুরস্কার-প্রাপ্ত তাঁর 'চেম্‌মীন' ও অন্যান্য কয়েকটি উপন্যাস বিভিন্ন ভারতীয় এবং বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ইউয়েনেস্কোর উদ্যোগে 'চেম্‌মীন'-এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তকৃশী, কেরল সাহিত্য অকাদেমী, প্রবন্ধক সমিতি, সাহিত্য অকাদেমী, ভারত সরকারের পরামর্শ সমিতি (মলয়ালম) এবং ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়ার সদস্য।

3. **বৈক্কম মুহম্মদ বশীর**

মধ্য-কেরলের বৈক্কমে বৈক্কম মুহম্মদ বশীরের জন্ম। স্কুলের শিক্ষা শেষ হবার পর ভারত-ভ্রমণের উদ্দেশ্যে তিনি গৃহত্যাগ করেন। রাজনৈতিক ধর্মঘট এবং প্রগতিশীল সত্যাগ্রহে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেন। অতঃপর কিছুদিন একটি পুস্তক-প্রকাশন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

আধুনিক মলয়ালম গল্প-সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ লেখক বশীর মুসলিম সমাজের প্রচলিত অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে আক্রমণেই নিয়োজিত করেন নিজেকে। মানুষের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা-সমূহকে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তিনি নিজের রচনায় প্রতি-ফলিত করেছেন।

1969 সনে সাহিত্য অকাদেমীর 'ফেলো' নির্বাচিত হন।

এখন পর্যন্ত তাঁর 17টি কাহিনী-গ্রন্থ এবং 8টি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। চলচ্চিত্রের জন্যও তিনি অনেক কাহিনী লিখেছেন।

4. **পোংকুন্নম বর্কী**

কেরলের পোংকুন্নমে 1910 সনে পোংকুন্নম বর্কীর জন্ম। মলয়ালম ভাষায় 'বিদ্বান' পরীক্ষা পাস করার পর কিছুকাল অধ্যাপনা করেন, কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ক্যাথলিক ধর্মযাজক এবং ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের অন্ধতার বিরুদ্ধে নিজের সৃজনশীল প্রতিভার প্রয়োগ ক'রে তিনি মলয়ালম গল্প-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ বিবেচিত হন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল তিনি 'কেরল প্রগতিশীল সাহিত্যকার সমিতি'র সচিব ছিলেন।

এ-পর্যন্ত বর্কীর 18টি গল্প-সংগ্রহ, 15টি নাটক, 2টি গদ্যকাব্য, আত্মকথার প্রথম পর্ব এবং তুলি-চিত্রের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি মলয়ালম চলচ্চিত্রের কাহিনীও তিনি রচনা করেছেন।

সাহিত্য প্রবর্তক সহকরণ সংঘের তিনি প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। কয়েক বছর এই সংঘের অধ্যক্ষও ছিলেন। বর্তমানে কেরল সাহিত্য অকাদেমীর সদস্য।

5. **এস. কে. পোট্টেকাট**

1913 সনে কালিকট (কেরল)-এ এস. কে. পোট্টেকাটের জন্ম। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করার

পর 3 বছর স্কুলে শিক্ষকতা করেন। 1945 পর্যন্ত অনেকগুলি চাকুরি করেন এবং ছাড়েন; অতঃপর সাহিত্য-রচনায় আত্ম-নিয়োগ করেন। ভারতের সর্বত্র, আফ্রিকা, ইউরোপ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া তথা সোভিয়েত দেশ ভ্রমণ করেছেন তিনি এবং এই-সব দেশ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যেও রূপায়িত হয়েছে।

আধুনিক মলয়ালম গল্প-সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা লেখক পোট্টেকাট সামাজিক তত্ত্ব উদ্ঘাটনের চেয়ে শিল্প-সুষমা অর্জনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁর রচনায়। তাঁর কাব্যমণ্ডিত আঙ্গিক অতিবাস্তব ঘটনাকেও রমণীয় ক'রে তোলে। মানুষের হৃদয়ের ভিতরের রহস্য উন্মোচনের উপযোগী মনোবিশ্লেষণ ও পরিবেশ রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত।

সনের জন্যে পোট্টেকাট উত্তর-কেরল কেন্দ্র থেকে স্বতন্ত্র দলের সদস্য হিসাবে লোকসভায় নির্বাচিত হন।

এ-পর্যন্ত তাঁর 2টি কাব্যগ্রন্থ, 2টি প্রবন্ধসংকলন, 21টি গল্প-গ্রন্থ, 13টি ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং 6টি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে।

6. **ললিতাম্বিকা অন্তর্জনম**

কোট্টারকোরার এক নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ পরিবারে 1907 সনে ললিতাম্বিকা অন্তর্জনম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সমুদয় শিক্ষা গৃহেই সম্পন্ন হয়। মলয়ালম ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের পর তিনি কবিতা ও কাহিনী রচনায় মনোনিবেশ করেন। সামাজিক কুপ্রথার দুর্বিষহ গ্লানিতে নিমজ্জিত নাম্বুদ্রি নারীদের (অন্তর্জনম) হৃদয়-বেদনা তাঁর রচনার মুখ্য বিষয়বস্তু। তাঁর শৈলী সহজ, সরস ও কবিত্বময়।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে আছে 13টি গল্প-সংগ্রহ, 7টি কাব্য-সংকলন, 2টি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ এবং 1টি নাটক।

7. **কারুর নীলকণ্ঠ পিল্‌লে**

কারুর নীলকণ্ঠ পিল্‌লের জন্ম 1898 সনে। উচ্চশিক্ষা লাভের পর অধ্যাপনা শুরু করেন তিনি। সাধারণ মানুষের ছোটখাটো সুখ-দুঃখ চিত্রায়নের মাধ্যমে শুভ'র জয় ও অনন্ত আশাবাদের ঘোষণাই তাঁর সাহিত্যের লক্ষ্য। তাঁর রচনাভঙ্গিও সরস ও সরল।

সাহিত্য প্রবর্তক সহকরণ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-সচিব পদে নিযুক্ত ছিলেন। কেরল সাহিত্য অকাদেমী তাঁকে পুরস্কৃত করেছেন।

22টি গল্প-সংগ্রহ, 2টি উপন্যাস, 9টি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ এবং 1টি একাঙ্কিকা সংগ্রহের লেখক।

8. **পি. সি. কুট্টিকৃষ্ণণ 'উরুব'**

উত্তর মালাবারের পোন্‌নানী নামক স্থানে 19195 সনে পি. সি. কুট্টিকৃষ্ণণের জন্ম। বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর কয়েক জায়গাতেই কাজ করেন। 1950 সন থেকে আকাশবাণী, কালিকট কেন্দ্রে কর্মে নিযুক্ত। বর্তমানে 'প্রযোজক'।

ছদ্মনাম 'উরুব'। তাঁর উপন্যাসে গ্রাম-কেরলের জীবনধারা খুবই নিপুণভাবে উপস্থাপিত। তার মধ্যেও বায়নাডের আশেপাশে বসবাসকারী প্রগতিশীল গ্রামীণ মুসলমান জন-সমাজের জীবন মুখ্য স্থান পেয়েছে। তাঁর কাহিনীর সরসতা ও কৌতুককর উপস্থাপনেও বৈশিষ্ট্যের ছাপ রয়েছে।

কেরল সাহিত্য অকাদেমীর এককালীন সদস্য, এ-পর্যন্ত

15টি গল্পগ্রন্থ, 4টি উপন্যাস, 3টি নাটক, 2টি শিশুগ্রন্থ এবং কয়েকটি চিত্রনাট্য প্রকাশ করেছেন। তাঁর রচিত কয়েকটি কাহিনীর চলচ্চিত্ররূপও দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছে। তাঁর 'সুন্দর ও সুন্দরী' গ্রন্থটি সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কারে ভূষিত।

9. **বেট্টুর রামন নায়ার**

মধ্য কেরলের পালে অঞ্চলে 1919 সনে বেট্টুর রামন নায়ারের জন্ম। রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। মধ্যবিত্ত জীবনের টানাপোড়েনই তাঁর অনেক কাহিনীর প্রেরণা— এ-ব্যাপারে তাঁর স্থান প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বীর। প্রকাশনা-পুস্তকালয় আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। সাহিত্য প্রবর্তক সহকরণ সংঘের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। বর্তমানে এই সংঘের বিক্রয়-শাখার প্রবন্ধক। কেরল সাহিত্য অকাদেমীর 'প্রবন্ধক-সমিতি'র সদস্য।

এ-পর্যন্ত 12টি কাহিনী-সংগ্রহ, 1টি উপন্যাস, 1টি কবিতা-সংগ্রহ, 1টি আলোচনা-সংগ্রহ এবং একটি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশ করেছেন।

10. **নাগবল্লী আর. এস. কুরুপ**

নাগবল্লী আর. এস. কুরুপের জন্ম মধ্য কেরলের অন্তর্গত অম্বলপ্পুষায়, 1917 সনে। ত্রিবাঙ্কোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. বি. টি. উপাধি প্রাপ্তির পর প্রায় এক দশক অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। বর্তমানে আকাশবাণীর 'প্রযোজক'।

নাগবল্লীর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে আছে 13টি কাহিনী-সংগ্রহ, 5টি উপন্যাস, 7টি নাটক, 2টি নিবন্ধ সংগ্রহ এবং 1টি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ।

স্বকীয় ভাবব্যঞ্জনা ও রোমান্টিকতার জন্যই তাঁর রচিত কাহিনীর প্রসিদ্ধি। বিশেষ ক'রে কুট্টনাদের পরিশ্রমী কৃষকদের জীবন বিরল সরসতায় উপস্থাপিত করেন তিনি।

11. **ই. এম. কবুর**

1906 সনে কেরলের তিরুবল্লায় ই. এম. কবুরের জন্ম। ত্রিবান্দ্রমের 'আর্টস' এবং 'ল'— উভয় কলেজেরই স্নাতক।

ওকালতি দিয়ে কর্মজীবন শুরু ক'রে 'ডিস্ট্রিক্ট' এবং 'সেসন' জজ রূপে অবসর গ্রহণ করেছেন। নিজস্ব প্রসাদগুণের জন্যে লেখক কবুরের প্রসিদ্ধি।

এ-যাবৎ 4টি উপন্যাস, 15টি কাহিনী-সংগ্রহ, 3টি নাটক ও 5টি হাস্যকৌতুকের বই প্রকাশ করেছেন তিনি।

12. **পুঞ্জিক্করা রাফী**

এর্নাকুলামের নিকটস্থ পুঞ্জিক্করায় 1924 সনে পুঞ্জিক্করা রাফীর জন্ম। কোচিন বন্দরের এক শ্রমিক রূপে কর্মজীবন শুরু করেন। নিজের চেষ্টায় ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কাহিনী ও উপন্যাসে শ্রমিক-শ্রেণী ও নীচুতলার মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার চিত্র অসাধারণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। রাফী ন্যাশনাল বুক স্টল ও সাহিত্য প্রবর্তক সহকরণ সংঘ (কোট্টায়ম)-এর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

13. **কে. টি. মুহম্মদ**

কেরলের মঞ্চেরী-তে 1927 সনে কে. টি. মুহম্মদের জন্ম। প্রাথমিক বর্গের পর আর তাঁর নিয়মিত শিক্ষালাভের সুযোগ হয় নি। কর্মজীবন শুরু করেছিলেন কালিকট ডাকঘরের পেশকার রূপে।

ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলির দ্বারা আয়োজিত সর্বভারতীয় গল্প প্রতিযোগিতায় তাঁর 'আঁখে' নামক গল্পটি প্রথম পুরস্কার পাবার পর রাতারাতি প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর অধিকাংশ কাহিনীই গভীর নাটকীয়তায় সমৃদ্ধ।

এ-পর্যন্ত 12টি নাটক, 2টি একাঙ্কিকা সংগ্রহ, 1টি গল্পগ্রন্থ ও 1টি উপন্যাস প্রকাশ করেছেন।

তিনি সংগীত-নাটক অকাদেমীর সদস্যও ছিলেন।

14. **নন্দনার**

নন্দনার (পি. সি. গোপালন)-এর জন্ম 1926 সনে। নন্দনার তাঁর ছদ্মনাম। হাইস্কুলের পরীক্ষা পাস করার পর 16 বছর বয়সে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। 22 বছর চাকরির পর অবসর গ্রহণ করেন এবং বর্তমানে 'ফ্যাক্ট' (আলুবা)-এর প্রচার বিভাগে কর্মরত।

সফল সৈনিক নন্দনার-এর কাহিনীতে তাঁর সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতাই প্রতিফলিত হয়। সরস ও সজীব শৈলীর জন্য সুবিখ্যাত নন্দনার তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের প্রতি সহজেই পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছেন।

4টি গল্পগ্রন্থ, 7টি উপন্যাস এবং 1টি একাঙ্কিকা সংগ্রহের লেখক।

15. **টি. পদ্মনাভ**

41 বছর বয়স্ক টি. পদ্মনাভ 'ফ্যাক্ট'-এর কোচিন প্রকল্পের এস্টেট ম্যানেজার। কলা ও আইনের স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর কিছুদিন ওকালতিও করেন।

নূতন রীতির মাধ্যমে কাহিনীর চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিস্ফুটনে পারদর্শী এই সাহিত্যিক প্রায়ই চমকিত করেন পাঠকদের।

এ-পর্যন্ত 5টি কাহিনী-সংগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

16. **এম. টি. বাসুদেবন নায়ার**

কেরলের অন্তর্গত পোন্নানী-তে 1933 সনে এম. টি. বাসুদেবন নায়ার জন্মগ্রহণ করেন। পালঘাটের ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর কিছুদিন টিউটোরিয়াল কলেজে পড়ান। 1956 থেকে 'মাতৃভূমি' সাপ্তাহিক পত্রিকার সহ-সম্পাদক।

তরুণ লেখকদের মধ্যে অন্যতম প্রধান বাসুদেবন নায়ার শিল্প-সুষমা ও ভাষার গীতিধর্মিতার জন্য বিশেষ সম্মানিত ও পরিচিত। মানবমনের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন অভিব্যক্তির প্রকাশে অসামান্য শক্তিশালী। উপন্যাস এবং গল্প— দুই মাধ্যমেই সমান ক্ষমতার অধিকারী। ইতিমধ্যেই তাঁর রচিত 13টি গল্পগ্রন্থ, 6টি উপন্যাস, 2টি আলোচনাগ্রন্থ, 1টি ভ্রমণ-কাহিনী এবং অনেকগুলি 'স্ক্রীন-প্লে' প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গল্প ও উপন্যাস চলচ্চিত্রেও রূপান্তরিত হয়েছে।

17. **মাধবীকুট্টি**

সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কারে সম্মানিত কবি শ্রীমতী বালা-মণিয়াম্মার কন্যা কমলা (ছদ্মনাম: মাধবীকুট্টি)-র জন্ম 1932 সনে। মলয়ালম ভাষায় তাঁর 4টি গল্পগ্রন্থ এবং ইংরেজী ভাষায় 2টি কাব্যসংকলন প্রকাশিত হয়েছে।

আধুনিক সভ্যতার বিভিন্ন বিরোধী বিষয় কঠোর বাস্তবতার সঙ্গে তাঁর রচনায় চিত্রিত হয়। মনোবিজ্ঞানের পটভূমিতে নর-নারীর সম্পর্কের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণও তাঁর প্রিয় বিষয়।